চল মন বৃন্দাবন

নিগূঢ়ানন্দ

নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা—৭৩

□ দ্বিতীয় নবপত্র প্রকাশ : ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৫

□ প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

□ কম্পোজ : রঘুনাথ প্রেস
৮৩ বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা ৬

□ মুদ্রক : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০১এ, বিধান সরণী,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

যাঁরা এখন স্বর্গে আছেন

সেই হারিয়ে যাওয়া মা---৺স্নেহলতা সরকার

ও পিতা ৺অমৃতলাল সরকারের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

এই লেখকের অন্যান্য বই

মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে (তৃতীয় সংস্করণ)

খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী

একান্ন পীঠের সাধক—১ম, ২য়, ৩য়

সাধুসন্তের দেশে

আত্মার রহস্য সন্ধান

সহস্রারের পথে

প্রাণমন আত্মা

পরমাত্মার চোখ

আত্মা ও পরমাত্মা

মৃত্যু ও পরলোক (তৃতীয় সংস্করণ)

জন্মান্তর (২য় সংস্করণ)

দেবদেবীর উৎস সন্ধানে

আত্মা মৃত্যু স্বর্গ নরক (২য় মুদ্রণ)

ঈশ্বর সন্ধানে ভারত

জাতিস্মর

সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড

লেখকের বক্তব্য

কাহিনীটি একেবারেই আমার তরুণ বয়েসের লেখা। কিন্তু এর মধ্যে একটা অলৌকিকতার ব্যাপার আছে। ইচ্ছে ছিল গৌড়ে প্লেগের পটভূমিতে একটি দুশ্চরিত্রা মহিলার চিত্র আঁকবো। কিন্তু কাহিনী আমার নিয়ন্ত্রণে না থেকে আপন ইচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে এমন জায়গায় পড়ল যাকে অধ্যাত্মভাষায়, ভক্তিসূত্রে বলে আত্মসমর্পণ। প্রথম মুদ্রণ দ্রুত শেষ হয়ে যাবার পর গ্রন্থটি প্রায় ২৯ বছর আর বের হয়নি। একজন বিখ্যাত শিবসাধক আমায় বলেছিলেন, বাবা, আমি ততদিন বাঁচব না, কিন্তু বলে যাচ্ছি তোমার এ গ্রন্থ আবার বের হবে। সেদিন মানুষ এমন গ্রন্থেরই প্রয়োজনীয়তা বোধ করবে।

মানুষ কি করবে আমি জানি না। তবে আমার কথা বলতে পারি যে, এতদিন পরে আমি নিজে তর্কবিতর্ক বাদ দিয়ে ঈশ্বরে আত্মসমপর্ণ করেছি। আমার এ প্রত্যয়ে কোন দ্বিধা নেই যে, একটি জাগ্রত সার্বিক মানস আমাদের সব কিছুই দেখেন। সেই জন্যই গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণে আপত্তি নেই।

আমি কাহিনীতে যাকে দক্ষল দরওয়াজা বলেছি ইতিহাসে তার নাম 'দাখিল দরজা' অর্থাৎ প্রধান তোড়ন। আঞ্চলিক মানুষ দক্ষল দরওয়াজা বলে বলে আমিও সেই নাম উচ্চারণ করলুম। পুরনো দিনের বানানই রেখে দেওয়া হল।

পরিশেষে, কাহিনীটি মধ্যযুগের হলেও এর পশ্চাৎপট কোন সময়সীমার মধ্যে ধৃত নেই। এ গৌড় চিরন্তন গৌড়। এ প্রেম চিরন্তন প্রেম যা ঈশ্বর সান্নিধ্যে শেষ হয়। ইতিহাস চেতনায় কোন ত্রুটি থাকলে সেইজন্য তা ধর্তব্য নয়।

গ্রন্থটির নাম 'চল মন বৃন্দাবন' রাখা হল এই কারণে যে, বর্তমান কাহিনীর প্রধান চরিত্র ভূষণ খাঁ এখানে তাঁর একটি পদে লিখেছেন—

'চল মন বৃন্দাবন
রহু রহু আখে হুলকি যমুনা ডাকে
চমকি চমকি উঠে মন।'

উপরোক্ত সুরই বর্তমান কাহিনীর প্রাণ-প্রবাহ।

এক

"আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি।"

দক্ষল দরওয়াজার কাছে এসে সাধারণ লোকেরা অনেকেই বসে। গভীর পরিখাতে স্থির জলের উপর অজস্র জলপদ্ম ফুটে আছে দেখে। দূরে পূবে কালো মেঘের মত অজস্র আম-বাগানের পত্রচ্ছায়া সজল রেখা টেনে দিয়ে দূর দূরান্তে চলে গিয়েছে। তার ওপাশে মহানন্দা। সুলতান এ প্রবেশপথে যাতায়াত করেন না। তাঁর জন্য নহবৎখানার দরওয়াজা। দক্ষিণে গঙ্গার দিকে মুখ করে সেই প্রবেশপথ দাঁড়িয়ে আছে। সেখানেই বিলাস, সেখানেই ঐশ্বর্য্য, সেখানেই শিল্প। অষ্টপ্রহর সেই প্রবেশপথে বাদকেরা রয়েছে, আর তাদের সানাইয়ে মধুর সুর ঝরছে। দক্ষল দরওয়াজার পথ যদি সুলতানী পথ হোত তবে সাধারণ লোকেরা এখানে জমায়েৎ হয়ে দুর্গের বাইরে মুক্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারত না। এ পথ সুলতানের নয় বলেই গৌড়জনেরা দক্ষল দরওয়াজার গুরুগম্ভীর চত্বরে বসে বাংলার শ্যামল তটের শোভা উপভোগ করতে পারে।

খান রিহানুদ্দিন একজন আমীরের পুত্রই ছিল। কিন্তু সুলতানী অনুগ্রহের জন্যই শুধুমাত্র দরবারি বিলাসে না থেকে, সে নিজের ভাগ্যকে অন্য পথে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তাই মুসলমান হয়েও এবং অভিজাত আমীরপুত্র হয়েও সে ব্যবসায়ে নেমে পড়েছিল। সেই সূত্রে বহু মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে শ্রেণীর অহংকার তার অনেকটা চলে গেছে। পৃথিবীতে আমীর এবং সুলতানদের বাইরে আরো একটি জগৎ আছে এবং সেখানে আর এক প্রকারের মানুষ বাস করে একথা সে জানতে পেরেছে। এবং মানুষ নামক জীবের পশুত্বের ঊর্ধ্বে বিবেক বলে যে একটি জিনিস আছে, তার আধিক্য এই অদরবারি মানুষের মধ্যেই একটু বেশী সেটা সে বুঝতে পেরেছে। তাই মানুষদের সঙ্গে মিশতে তার তত আপত্তি নেই। অবশ্য সেই মানুষগুলো স্তর নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ নয়। একেবারেই সাধারণ্যে সে মিশতে পারেনি। যে দরবারে নিশীথে হীরকখণ্ডগুলি নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করে এবং দিবসে পান্না চুনি মুক্তা ঝলসায়, সেই দরবারের মানুষ না হলেও খান সাহেবের সঙ্গীরা এমন একটি শ্রেণীতে পড়ে যাদের গৃহগুলিকে প্রাসাদই বলা চলে, যাদের প্রাঙ্গণে কৃত্রিম অরণ্য সুসজ্জিত হয়ে থাকে। এবং যাদের পরিচর্যা করতে পেলে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তাতার ভৃত্যেরা গর্ববোধ করে, এবং দেশী প্রজা নামক ব্যক্তিগণ নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে। এই শ্রেণীতে হিন্দু-মুসলমান দুইই আছে। এমনি কয়েক ব্যক্তির মধ্যে শেঠ চন্দনলাল একজন। গৌড়ের বিশিষ্ট একজন শ্রেষ্ঠী তিনি—যার গলার মুক্তার মালা, প্রয়োজনে একদিন সুলতানের দরবারি বিলাসের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে পারে।

"এই সুরেরই যৌবন-[illegible] মধ্যাহ্ন আকাশে।

এই [illegible] ওপারে যেমন [illegible] রেখা [illegible] না, মনটিও [illegible]

থাকে এবং এ মনে ঋজু প্রবহমান নদীর মত সাগর স্পর্শ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয় না। খান রিহানুদ্দিন এবং চমনলালের মধ্যে এই কারণেই ভাব সম্ভব হয়েছিল। গুজরাটে বাণিজ্য করতে গিয়ে দুয়ের সঙ্গে 'প্রথম দেখা। পরিচয়ে যখন জানা যায় যে দুয়েরই প্রত্যাবর্তনের আকর্ষণ পাখীর নীড়ের মত গৌড় তখন বাসভূমির একত্ব জাতির দ্বিত্বকে সহজেই অতিক্রম করতে সাহায্য করে। সেই থেকেই—মানুষ দুইটি বটে তবে হৃদয় এক বললেই হয়।

সেই চমনলাল আর খান রিহানুদ্দিন আজ দক্ষল দরওয়াজার চত্বরে এসে বসল। খানসাহেবের সুসজ্জিত এক্কা গাড়ীই যে তাদের বহন করে নিয়ে এসেছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সূর্য তখন গৌড়ের পশ্চিম দরওয়াজায় তার কমলা রংয়ের রশ্মি ফেলে ধীরে ধীরে লুকোবার চেষ্টা করছে। ফলে গৌড়ের পূর্বাঙ্গনে আলো থাকলেও স্নিগ্ধতা ফুটে উঠেছে, আর গভীর পরিখার আবদ্ধ জল মন্দ হাওয়ায় অজস্র ক্ষুদ্র দোলন সৃষ্টি করে রক্তপদ্মগুলিকে নৃত্যপরায়ণ করে তুলেছে। দুর্গের বাইরে আম্র কাননের পত্রাচ্ছাদনের নীচে স্বদেশী বিদেশী সমস্ত রকমের পখীবা আগত রাত্রির জন্য আশ্রয় অন্বেষণ করছে। সবুজ পত্রাবলী অগ্রসরমান অন্ধকারে তাদের রং হারাবার ভয়ে ম্লান হচ্ছে। বোধ হয় দক্ষিণে লোটন বিবির মসজিদের প্রাঙ্গণের নতুন সরোবর থেকে আঁচল ভরে ভরে জল নিয়ে বাতাস আসছে। সেই মধুর স্পর্শ একটু গায় লাগলে দেহ জুড়িয়ে যায়।

ভীষণদর্শন তুর্কী প্রহরীরা ভীমদর্শন শূল হস্তে নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত দরওয়াজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর মাটির কেল্লার উপর দিয়ে অনবরত তুর্কী অশ্বারোহী সেনারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু গৌড়ের লোকের চোখে এটা নতুন কিছু নয়; ভীতি বা শ্রদ্ধা কোনটাই যেন আর উৎপাদন করে না। সুতরাং সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে খান রিহানুদ্দিন ও শেঠ চমনলাল গিয়ে দক্ষল দরওয়াজার চত্বরে বসল।

ওদের ভাব দেখে মনে হল যেন বহুদিন গ্রীষ্মের খররৌদ্রে ওরা উত্তপ্ত হয়ে ছিল। গৌড়ের ছায়াতে বসে শরীর জুড়াচ্ছে। ক্লান্তির শেষে যেমন শ্রান্ত পথিক বৃক্ষছায়াতে বসে বুক ভরে শ্বাস নেয় তেমনি ওরা শ্বাস নিল। বুক ভরে বার বার করে স্নিগ্ধ বাতাস গ্রহণ করতে লাগল। বাংলার প্রান্তর-শ্যামলিমা আর আম্রকাননের ঘন ছায়া ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে পূবে বহু দূর দূরান্ত অবধি বিস্তৃত হয়ে আছে।

রিহানুদ্দিন চমনলালের দিকে তাকাল। একটা বন্ধুপ্রীতির স্নিগ্ধরস মুখের মধ্যে টেনে এনে চমনলালও তাকাল খান সাহেবের দিকে। রিহান বললঃ সত্যি দোস্ত, এমন দেশটি আর নেই। বহুদিন পরে ঘরে ফিরে আবার যেন মনে হচ্ছে বেঁচে আছি। নিজেকে যেন আবার ফিরে পাচ্ছি।

চমনলাল বললঃ তা ঠিক। আজ যেন খুবই ভাল লাগছে। গৌড়ের দক্ষল দরওজায় বসে এই ক্ষুদ্র পরিখার জলের দিকে তাকিয়ে হৃদয় যেমন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে, গুজরাটের সমুদ্র তীরেও তেমন হয় না। অথচ দিগন্ত বিস্তৃত অসীম জলরাশি সেখানে।

গাম্ভীর্য্যে এই পরিখা তার কাছে কী! কিন্তু তবু এই নিস্তরঙ্গ জলের মধ্যে যত আবেগ আছে, সমুদ্রের অগণিত তরঙ্গের মধ্যেও যেন এ আবেগ কোন দিন লক্ষ্য করিনি।

রিহান বলল: ব্যাপারটা কি জান দোস্ত, প্রাণের সঙ্গে সংযোগ থাক চাই। প্রাণে প্রাণে প্রীতির সম্পর্ক না থাকলে, যে যত বড়ই হোক না কেন, মনকে টানতে পারে না। আশ্চর্য্য লাগে, ভয় লাগে, কিন্তু তবু যেন কেমন মনের মত হয় না। গুজরাটের সমুদ্র কী এক অপূর্ব পুলকের সঞ্চর করবে, আগে আমি তাই ভেবেছিলুম। কিন্তু দুদিন তাকে চোখের উপর দেখবার পর, কেমন যেন প্রথম দর্শনে যতটা শ্রদ্ধা জন্মেছিল তা আর থাকল না। অথচ মামুদ শাহ ঐ গুজরাটের সমুদ্র দেখে এতই নাকি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি গজনি ছেড়ে গুজরাটেই তার রাজধানী স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

চমনলাল বলল: সত্যি, তাই ভাবি। ঐ দূরে মহানন্দা একটা সূক্ষ্ম রেখার মত বয়ে যাচ্ছে। অথচ অস্তগামী সূর্যের রশ্মিরেখা বুকে টেনে ওর মধ্যে যে এক অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার হয়েছে, এমন কি বন্ধু, পাঁচ বছর আগে পুরী গিয়ে সেই উদ্বেলিত সমুদ্রের মধ্যেও এমনটি লক্ষ্য করিনি।

রিহান বলল: আমার কি মনে হয় জান? যে প্রকৃতিকে আমরা অচেতন বলে ভাবি, তা মোটেই অচেতন নয়। তার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য একটা প্রাণের স্রোত—আমাদেরই মত বয়ে গিয়েছে। শুধু ওরা কথা বলতে জানে না তাই, নইলে হয়তো এতক্ষণ আমাদের দেখে বলে উঠত: 'এই যে বন্ধু ভাল আছ? অনেক দিন পরে দেখা।' ওরা কথা বলতে পারে না বটে কিন্তু ভাবের মধ্যে সেই অন্তরকে প্রকাশ করে। তাকিয়ে দেখে, মনে হবে যেন নিস্পলক দৃষ্টিত ওরা আমদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

চমনলাল আর একবার নীচে পরিখার দিকে, পরিখা অতিক্রম করে শ্যামল প্রান্তর আর ঘন সন্নিবেশিত আম্রকাননের দিকে তাকাল। এবার যেন সত্যি তার মনে হল, ওরা সবাই দক্ষল দরওয়াজার চত্বরের উপর তাদেরই দিকে তাকিয়ে আছে। চমনলাল অস্ফুট কণ্ঠে অবৃত্তি করল: জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী।

রিহনুদ্দিনও আবার নিবিড় নেত্রে আগত সন্ধ্যার ম্লান স্নিগ্ধ ছায়ার নিচে বহুদিন পর গৌড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল।

দক্ষল দরওয়াজার পাশে পূবের এই স্থানটিই বেশী পরিচিত। কারণ তাদের দুজনেরই প্রাসাদানুপম অট্টালিকা গৌড় নগরীর পূর্ব প্রান্তে। উত্তরে আম্র কাননের নিবিড় বন, এখনো বাঘ থাকে। পশ্চিমের শোভাও নিতান্ত কম নয়, কিন্তু দূর বলে ওখানে প্রত্যহ যাওয়া হয়ে উঠে না। দক্ষিণে মাঝে মাঝেই যেতে হয়। সেখানে সৌন্দর্য্যের আর এক দিক। হিন্দুস্থানের প্রাণপ্রবাহ গঙ্গা বয়ে গিয়েছে তার স্রোত, বিস্তৃতি আর গাম্ভীর্য্য নিয়ে। সেখানে ঘাটে ঘাটে দেশ বিদেশের বণিকদের ভীড়। চমনলাল আর রিহানুদ্দিনের নৌকো থাকে সেখানেই। এই গৌড়ে প্রকৃতির বিশাল প্রসারের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব নেই কোথাও। গৌড়ে যারা জন্ম নিয়েছে, গৌড়ের বাতাস যারা শ্বাসের মধ্যে গ্রহণ করেছে এ সৌন্দর্য্যের দ্যোতনা তাদের কাছে বাক্যের অতীত।

রিহান বলল: আজ মনে হয়, যেন সুলতানের ঘোষণা সত্ত্বেও, লোভ দেখানো সত্ত্বেও,

স্বর্ণ মুদ্রার মোহ পরিত্যাগ করেও ভিক্ষুকেরা আজো গৌড়ে আছে, গৌড় ত্যাগ করে যায়নি। গৌড়ের দুমোয়ো মাটি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়েও মূল্যবান। আমাকে বিশ্বের সম্পদ দিলেও গৌড় ত্যাগ করে যেতে পারব না।

চমনলাল বলল: তা আমি গুজরাটের বন্দরেই বুঝতে পেরেছিলুম। নইলে বণিক মিলাদ্দিনের সুন্দরী কন্যা ফারুকউন্নিসার মোহ ত্যাগ করে আদম পর্যন্ত ফিরে যেতে পারতেন না।

একটু হাসল বিহান। চমনলালের মুখের দিকে তাকাতে কেমন একটা উজ্জ্বল দুষ্টুমির ভাব ফুটে উঠল তার মধ্যে। সে বলল: আর তুমি ?

একটু হাসল শুধু চমনলাল।

বিহান বলল: তুমিও কি দুলারীবাঈকে ছেড়ে আসতে ? কিন্তু দোস্ত এখন মনে হচ্ছে তাকে ছেড়ে না এলেই ভালো করতে। দুলারীকে একটি উজ্জ্বল রত্নের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। গৌড়ে সে মানতো ভাল। সে রূপ-পশারিণী। আনতে কোন বাধা ছিল না।

চমনলাল বলল : সত্যি বন্ধু, সে কথাটা এখন মনে পড়ছে। কিন্তু গুজরাটে থাকতে ঠিক এমন করে তার কথা মনে পড়ে নি। ঠিক কী যেন আর একটি...।

বিহান বলল: জানি বন্ধু। আর একটা কি যেন আছে। সেই 'কি' টুকুর মর্ম ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। নইলে—আনারুন্নিসার চেয়ে ফারুক নিশ্চয়ই বেশী সুন্দরী ছিল—আর পদ্মাবতী নিশ্চয়ই দুলারীবাঈয়ের কাছে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতার কথা ভাবতে পারবে না। কিন্তু 'তবু'—। ঐ 'তবু'টাই আশ্চর্য। ওটা যে কি, বুঝে ওঠা যায় না...ওটা, ওটা,....।

একটা মনের মত কথা খুঁজতে লাগল বিহান।

চমনলাল কথাটা পূর্ণ করল: ওটা, ভালবাসা।

শুনে একটু থ বনে চমনলালের মুখের দিকে তাকাল বিহান—তারপর কি ভেবে উচ্চশব্দে হাঃ হাঃ হাঃ...করে হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দ সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আবহাওয়াকে একটু তরঙ্গায়িত করে তুলল যেন। মৃত্তিকার প্রাচীরের উপর দিকে যে তুর্কী প্রহরীরা ঘোরাফেরা করছিল তারা সে শব্দ শুনে একটু চমকে উঠল বোধহয়। দরওয়াজার মুখে দাঁড়ানো প্রহরী দুজনের হাতের বর্শা দুটোও একটু কেঁপে উঠল। তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে এল। দুর্গের এই চত্বরে একটু মুক্ত আঙ্গিনায় নির্মল বায়ু সেবনের জন্য অনেক নাগরিকই বেরিয়েছে। অনেকেই পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। তারা কেউ দরওয়াজার উপর থেকে ভেসে আসা হাসির উচ্চকিত শব্দে চমকিত হয়ে সে দিকে ফিরে তাকাল কিনা বলা যায় না। কারণ গৌড়ের দুর্গের প্রতিটি দরওয়াজাতে প্রতিদিন বহু মানুষের ভিড় হয়। ঘনবসতিপূর্ণ ব্যস্ত নগরীর বাইরে বহু লোকই মুক্ত আবহাওয়া উপভোগ করতে আসে। গৌড় মৃত্তিকার আকাশ। সেখানে মণিমুক্তাখচিত বহু নক্ষত্র। চোখের উপর এই ঐশ্বর্যের উগ্র বিলাস অনেক সময় ক্লান্তিকর মনে হয়, তাই প্রকৃতির একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে নেবার জন্য মানুষেরা মৃত্তিকা-প্রাকারের বাইরে আসে। আনন্দের উদ্বেল প্রকাশ

অনেক সময়ই সেখানে কলহাস্যে ফেটে পড়ে। অভ্যস্ত মানুষেরা তাতে তেমন কিছু মনে করে না। এখানেও বহু লোকের মধ্যে অনেকেই কিছু শুনল না হয় তো, কিন্তু সে হাসির শব্দ একজনের কানে গেল। সে থমকে দাঁড়াল। কি যেন ভাবল, তারপর দুর্গের চত্বরে যেখানে বিহানুদ্দিন আর চমনলাল বসে ছিল সেখানে এগিয়ে এল। যে এগিয়ে এল তার নাম শেখ বুরহান, সে এ কণ্ঠস্বর চেনে। বহুদিন এ কণ্ঠস্বর সে শোনে নি। শুনা মাত্র তার যেন কি মনে হল। সে এগিয়ে এল। এবং একটু এগিয়ে হাসির শব্দ লক্ষ্য করে তাকাতেই সেদিকে দুজন লোককে বসে থাকতে দেখতে পেল। কী একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গেল তার মধ্যে।

মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে দরওয়াজায় বসে ছিল বিহান আর চমনলাল। কাছে এসে ঊর্ধ্বে না তাকালে তাদের দেখা যায় না। বুরহান দরওয়াজার কাছে এসে ঊর্ধ্বে মুখ তুলে ডাক দিল—রিহান্, দোস্ত্।

সে শব্দ পাশাপাশি দুজন বন্ধুর কানে গেল। রিহান তাকাল চমনলালের দিকেঃ কে?

চমনলাল নীচে তাকাতেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে উঠল: এই যে দোস্ত্, কি গো, খবর কি?

ততক্ষণ বুরহান আর নীচে দাড়িয়ে নেই, দৌড়ে সে উপরে উঠে এসেছে এবং বিহান আর চমনলাল দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠেছে।

উত্তেজনা থামতে না থামতেই সে হাঁফাতে হাফাতে বলল: কবে এলে তোমরা দোস্ত্? সালাম, ভাল তো?

দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলঃ আলিকুম আস্সালাম, এই গতরোজ এসেছি। ভাল তো দোস্ত্?

বুরহান বলল: তা খুদার মেহেরবাণীতে একরকম। কিন্তু যাক ভালই হোল, আমি তোমাদের কথাই ভাবছিলুম। হঠাৎ তোমাদের হাসির শব্দ শুনেই চিনতে পারলুমল। ভাগ্যিস তুমি হেসেছিলে! বিহান আর চমনলাল দুজনেই তাকাল বুরহানের দিকে।

—কি ব্যাপার? বিহান জিজ্ঞেস করল।

বুরহান বলল: জালাল খা সিপাহশালারের সঙ্গে ত্রিহুত যাচ্ছে। আমরা তাকে আজ রাতে অভিনন্দন জানাব। তাই এই বান্দার গরীবখানায় সামান্য ব্যবস্থা করেছি। তোমরা থাকবে না মনে করে একটু অভাব বোধ করছিলুম। যাক আমার সে আফ্সোস আর থাকল না, আল্লা মেহেরবান।

তৎক্ষণাৎ জালাল খাঁর সুন্দর মুখখানা বিহান আর চমনলালের চোখের সামনে ভেসে উঠল। খাঁ সাহেব প্রকৃতপক্ষে একজন শিল্পী। অতবড় দিলওয়ালা মানুষ কম চোখে পড়ে। ছোটবেলা আরবি শেখবার সময় একই মাদ্রাসাতে ওরা লেখাপড়া করেছে। চমনলাল হিন্দুর ছেলে হলেও আরবি ভাষা শেখবার জন্য মাদ্রাসাতে ভর্তি হয়েছিল। জালাল খাঁ, বুরহানুদ্দিন বিহান আর চমনলাল এই চারটি ছেলে শতজনের মধ্যেও কেমন করে যেন পরস্পর পরস্পরের অত্যন্ত নিকট হয়ে গিয়েছিল। চারটি ভিন্ন দেহ একটি আত্মার বৃত্তে ঘরপাক খেয়েছে ছোটবেলা। লোকেরা তাদের পয়গম্বরের চার শিষ্য বলত। চমনলাল

যদিও হিন্দুর ছেলে ছিল তবু ওদের থেকে তার ভিন্ন সত্তা খুঁজে বের করা যেত না। প্রকৃতপক্ষে ওদের এই মিলনের মূলে একমাত্র মানবধর্মের সহজ সরল আবেদন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ধর্ম বলতে ওরা হৃদয়ের ধর্মকেই বড় বলে মেনে নিয়েছিল। বড় হয়ে অবধি ওদের ছাড়াছাড়ি হয়নি কোনদিন। গৌড়ে যখনই ওরা চারজন থেকেছে, ওরা সব সময় একত্রেই থেকেছে। শুধুমাত্র কর্মের আহ্বানেই মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হয়েছে নইলে নয়। বহুদিন পর গৌড়ে ফিরে এসেছে চমনলাল আর রিহান। আবার চারজন মিলিত হবে এই স্বপ্নই তাদের ছিল। কিন্তু নিকটতম বন্ধু দূরে চলে যাচ্ছে শুনে ওরা যেন একটু বেদনাহত হল। তৎক্ষণাৎ জালাল খাঁকে দেখবার জন্য একটা ব্যাকুল ভাবের সৃষ্টি হল মনের মধ্যে।

রিহান বললঃ জালাল সুলতানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছে শুনে বড সন্তুষ্ট হলুম। কিন্তু বহুদিন অদর্শনের পর ওর সঙ্গে মিলনটা যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না তা ভেবে ব্যথা পাচ্ছি। চল আমরাও তাকে অভিনন্দন জানাব।

বুরহান বললঃ হ্যাঁ, তোমাদের যাওয়া চাই। তোমরা যে এসেছ, জালাল একথা এখনো জানতে পারেনি। আজ রাতে তাকে তাক্ লাগিয়ে দেব।

চমনলাল বললঃ আয়োজনটা কি করবে শুনি?

একটা দুষ্টুমিভরা হাসি হাসল বুরহান, বললঃ জালাল শিল্পী। সেই মতই যৎসামান্য ববস্থা করেছি। তবে দোস্ত্ সে কথা এখন বলবার ইচ্ছে নেই। সবকিছু যথাসময়ে তোমাদেব মোকাবিলা করব।

বুরহানের মুখের দিকে তাকিয়ে ওরাও একটু হাসল। হযতো ওরা কিছু আঁচ করতে পেরেছে।

বুরান বললঃ আমি একটু লোটন বিবির মসজিদের দিকে যাচ্ছি...কাজ আছে। ঠিক সময় মত তোমরা যেও কিন্তু—প্রথম প্রহরেই আমাদের কাজ আরম্ভ হবে।

ওদের দিকে হাত নেড়ে বুবহান দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করল। এক্কা দাঁড়িয়ে ছিল। সে গাড়ীতে উঠতেই গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষ্‌ল। বাঁধানো পথের উপর দিয়ে শব্দ করে গাড়ী চলল।

সেদিকে তাকিয়ে রিহান বললঃ বুরহান আজো তেমনি আছে। ওর বোধ হয় আর কোনদিন পরিবর্তন হবে না। বয়সের ভার কোনদিন ওর রাশ টেনে ধরতে পারবে না।

চমনলাল বললঃ ভগবান করুন ও যেন চিরকাল এমন করেই চলে যেতে পারে।

তখন সূর্য বোধহয় শুধুমাত্র গৌড়ের পশ্চিম দেয়ালের আড়ালে নয়, পৃথিবীর এ প্রান্তের আড়ালেই চলে গিয়েছে। কারণ হাওয়া আর একটু স্নিগ্ধ হয়েছে এবং আলোর শ্বেত দীপ্তি কমে গিয়ে ধূসরতা পৃথিবীকে আবৃত করেছে। ঠিক সেই সময় গৌড়ের অজস্র মসজিদ থেকে সমবেত ভাবে আজানের ধ্বনি উঠল। রিহান সেই আজান শুনবা মাত্র সসব্যস্ত হয়ে চত্বরের উপরেই পশ্চিমমুখী হয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হল।

চমনলাল একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রিহানের প্রার্থনা শেষ হল। সে এগিয়ে গেল চমনলালের কাছে। তার পিঠে হাত রেখে বলল: চল দোস্ত্।

ওরা আবার দক্ষল দরওয়াজার সিংহদ্বারের মধ্য দিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করল। এক্কা দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনেই এক্কায় চাপল। গৌড়ের রাজপথের দুধারে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। পথের দুধারে মিনা করা গৃহগুলি সেই আলোর দীপ্তিতে মাঝে মাঝে চিক্ চিক্ করছে। কিছুটা অন্ধকারে, কিছুটা আলোর মধ্যে, আলো-ছায়ায় এক রহস্যময় ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। সেই অপরূপ পরিবেশের মধ্য দিয়ে রিহানের এক্কা এগিয়ে চলল।

দুই

"আমাব চোখেব বিজুলি-উজ্জ্বল আলোকে
হৃদযে তোমাব ঝঞ্ঝাব মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য!"

— ববীন্দ্রনাথ

রাত্রি প্রথম প্রহরে সবাই এসে বুরহানের 'গরিবখানায়' উপস্থিত হল। তবে তার গবীবখানাটি একটু বিচিত্র। দুই বিঘে জমির উপর তার বসতবাটী। যে কালে গৌড়ে একমুঠো ধুলো সোনার দামে বিকোয়, সেইকালে দুবিঘে জমির মালিক হয়েও গৌড় নগরীতে বুরহানুদ্দিন গরীব বান্দা। গৃহের চতুর্দিকে উঁচু দেওয়াল। প্রবেশপথ বাগদাদী ধরনের তোরণ দিয়ে নক্সা করা। দ্বার পেরুলেই শ্যামল ঘাসের আস্তরণ টানা মৃত্তিকা। শ্যামল ঘাসের উদ্যান চৌকোভাবে দুই দিকে বিভক্ত। আর সেই চতুষ্কোণাকৃতি মৃত্তিকাখণ্ড দুটির মধ্যভাগে বৃত্ত আঁকা। সেই বৃত্ত ঋতুফুলের রঙিন রেখা দিয়ে গণ্ডিবদ্ধ। মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি পাহাড়ী ঝাউ। চতুষ্কোণ মৃত্তিকাখণ্ড দুটির মধ্য দিয়ে একটি সরলরেখার পথ মহলের দিকে এগিয়ে গেছে। সেই পথের দুই পাশে সমান্তরাল ভাবে পারশ্যের রঙিন গোলাপের চারা লাগানো। রাত্রিবেলা সেই পথের দুই ধারে বিশেষ ধরনের মশালের ব্যবস্থা। মশালের শিখাতে আগুনের রক্ত আভার মোটেই স্থান নেই। মশালগুলোর শিখা থেকে বেরিয়ে আসছে একটা শ্বেতশুভ্র আলোর জ্যোতি। সেই আলোর মধ্যে পুর্ণিমার নির্মেঘ আকাশে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা।

প্রবেশপথ অতিক্রম করলে প্রথমেই বহিরঙ্গন। একে গৌড়ের ইষ্টক-শিল্পের কারুকার্যের একটি উৎকৃষ্ট নির্দশন বলা যেতে পারে। ফুলপাতা আঁকা দেয়ালগুলি মিনা করা। যেন মনে হয় পাথরের ঘর। ইচ্ছা হলেই গৌড়ের অধিবাসিরা পাথর দিয়ে ঘর তৈরী করতে পারে। শ্বেতপাথরের স্নিগ্ধ আবাস তৈরি করা তাদের পক্ষে মোটেই আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু তাদের আভিজাত্যে প্রস্তরের কোন মূল্য নেই। ইটকে পাথরের চেয়ে মূল্যবান

করে ভোলাতেই তাদের গৌরব। গৌড়ের অধিবাসীরা তাই ইটের উপর বিচিত্র কারুকার্য করে, মিনা করে সেই কারুকার্যকে সজীব করে তোলে। বুরহানুদ্দিনের বহিরঙ্গনের বৈঠকখানা সেই গৌড়ীয় আভিজাত্যই রক্ষা করেছে। বৈঠকখানার পর নর্তকীখানা। বিরাট একটি প্রাঙ্গণ। উপরে খিলানকরা ছাত্। বৈঠকখানার অনুরূপ বিচিত্র কারুকার্যে শোভিত। দেয়ালে প্রদীপের অজস্র কুঠরী। সেখানে সারি সারি মোম জ্বলছে। সেই আলোর ছটাতে রাতকেও দিন বলে মনে হয়। সেই নর্তকীখানায় দলবল নিয়ে বুরহান অপেক্ষা করছিল। সবার শেষে চমনলাল আর রিহান গিয়ে উপস্থিত হল। ওদের দেখেই সমবেত সবাই যেন উল্লাসে ফেটে পড়ল। উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে উঠলঃ 'এস, এস।' জালাল ছুটে গিয়ে ওদের দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরল। তারপর তিনজন প্রায় জড়াজড়ি করে গিয়ে একটি কৌচের উপর বসে পড়ল। অতিথিদের মধ্যে অনেকেই সাগ্রহে সেইদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

বুরহান অতিথিদের বসাবার আয়োজনের ত্রুটি করেনি। মুক্তাখোচিত আরাম-আসন চারপাশে বসানো ছিল। প্রত্যেকটিতে আরামদায়ক গদি, তার উপর বহু মূল্যবান মখমলের আচ্ছাদন।

অতিথিরা সবাই সে মূল্যবান আসন গ্রহণ করে আছেন। মেঝের উপর বহু মূল্যবান কার্পেট ছড়ানো। সে কার্পেটগুলি বাংলাদেশ থেকে কেনা নয়। কাশ্মীর থেকে আনা হয়েছে। রিহান ও চমনলাল জালালকে নিয়ে সেই মূল্যবান কার্পেট অতিক্রম করে গিয়ে ওধারে আসন গ্রহণ করল। রিহান এবং চমনলালকে দেখে সবাই অপ্রত্যাশিত ভাবে আনন্দ পেল। এ সভাতে হিন্দু-মুসলমান কোন প্রশ্ন নেই। বাংলার জলবায়ু মুসলমানদের উগ্রতা কমিয়ে দিয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বড় পাশাপাশি এসেছে। তাই এ সভাতে চমনলালের প্রবেশে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আরো অনেক হিন্দু অতিথিও সেখানে ছিল। এদের মধ্যে কেউ শ্রেষ্ঠী, কেউবা উচ্চ রাজকর্মচারীদের পুত্র। তরুণ একজন হিন্দু কবিও ছিল—তার নাম ভূষণ খাঁ। 'খাঁ' উপাধি পেয়েছিলেন। জালাল গৌড়ের পূর্বপ্রান্তে বিশেষ প্রিয়ব্যক্তি। এমন লোক নেই যে তাকে ভালবাসে না। তাই তার অভিনন্দন সভায় অতিথিদের সংখ্যা কম হয়নি। চমনলাল আর রিহানের অনুপস্থিতিতে যতটুকু অভাব থাকবার কথা ছিল তাও অপ্রত্যাশিত রূপে পূরণ হয়ে গেছে। সুতরাং প্রত্যেকেই আনন্দিত, প্রত্যেকেই খুসী। এই খুসীর আবহাওয়ার মধ্যে প্রত্যেকে আসন গ্রহণ করলে গৃহকর্তা বুরহান উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করলঃ বান্দার গরীবখানায় আপনারা সবাই এসেছেন—আপনাদের বিশেষ দয়া। অতিথি আপ্যায়নের তেমন কোন ব্যবস্থা করাই আমার সম্ভব হয়নি। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন জালাল আমাদের প্রিয় বন্ধু, সে সুলতানের অধীনে উচ্চ-রাজকার্যে বাইরে যাচ্ছে। তার এই ভাগ্যোন্নতিতে আমরা সবাই আনন্দিত। আমরা তাই তাকে আজ অভিনন্দন জানাতে এখানে জড় হয়েছি। আল্লা তার নসিবে আরো উন্নতি দিন এই কামনা।

সমবেত বন্ধুমণ্ডলী গৃহস্বামীর এই প্রস্তাবে করতালি দিয়ে উঠল।

বুরহান বললঃ আজ আমাদের সবারই আনন্দের দিন। তাই জালালের এই বিশেষ

সম্মান উপলক্ষে গরীব বান্দা যৎসামান্য কিছু ভোজনের ব্যবস্থা করেছে, আপনাদের হুকুম হলে....

সমবেত ধ্বনি উঠলঃ সাধু সাধু!

বুরহান সেই মুহূর্তে পর্দার আড়ালে অপেক্ষমান ভৃত্যদের ইঙ্গিত দ্বারা ভেতরে আসতে বলল। প্রতিটি অতিথির জন্য এক একটি ভৃত্য বিশেষ ধরনের রৌপ্যপাত্রে খাবার নিয়ে এল। কার্পেটের উপর সেই মুহূর্তে শুভ্র চাদর বিছিয়ে দেওয়া হল। অতিথিরা সেখানে বসে পড়ল। হিন্দু অতিথিদের জন্য ব্রাহ্মণ পাচকের ব্যবস্থা ছিল। তাদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ পাচকেরা তাদের জন্য ভোজ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে লাগল।

জাতিভেদটাকে স্বীকার করে নিয়েও যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনের ভেদ নেই, দেখে আশ্চর্য হবার মত। দেখে মনে হয়—(মন মনকে স্পর্শ করলে, বাইরের আড়াল অস্তিত্ব বাজায় রাখলেও তা অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। তার কোন বিশেষ মূল্য থাকে না।)

মসলা যুক্ত মাংস, মাছ, বাংলা দেশের নানান ধরনের মিষ্টান্নদ্রব্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রিহান খেতে খেতে বললঃ বুরহানের গরীবখানায় এমন গরীব খানা মাঝে মাঝে যদি মেলে, তবে সুলতানের দরবারেও আমি যেতে চাই না।

কথা শুনেই সকলে সাধু সাধু করে উঠল।

শুনে বুরহান একটু সঙ্কোচিত হল। প্রশংসাতে একটা মিষ্টি সংকোচ কে না বোধ করে!

আহার সমাপ্ত হলে ফরাস উঠিয়ে নেওয়া হল। আবার অতিথিরা এসে আরাম আসনে উপবেশন করলেন। বুরহানের আদেশক্রমে এমন সময় বান্দারা সিরাজ থেকে সরবরাহ করা বিশেষ ধরনের সুরা নিয়ে এল।

যে যুবকদল এখানে মিলিত হয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই গৌড়ের এই পরিবেশে মানুষ হয়ে বেশ একটু বিলাসী। সুরা পানটা একটা সহজ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। পানটাকে মোটেই দোষের বলে তারা মনে করে না। পানপাত্র হাতে পেলে উল্লসিত হয়ে ওঠে। অতিথিরা সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। একবাক্যে বলে উঠল, তোফা, তোফা!

পানপাত্র হাতে পেয়ে সবারই যৌবনের উত্তেজনা একটা প্রগলভ রূপ ধারণ করল যেন। তখন কলহাস্যে পরস্পরের কত্তাবার্তা চলতে থাকল। এবং সে কথাবার্তা ক্রমশঃ দ্রুততর হতে লাগল। এমন কি বিদায়ী বন্ধু জালাল পর্যন্ত আসন্ন বন্ধুবিয়োগ ব্যথা বিস্মৃত হয়ে সেই আনন্দ উৎসবে যোগদান করল। এইভাবে কয়েক মুহূর্ত কাটল এবং হাতের পানপাত্র সবারই নিঃশেষিত হল। ঠিক সেই মুহূর্তে গৃহস্বামী বুরহান উঠে দাঁড়াল এবং জালালের কাছে এগিয়ে গেল। জালালের কাঁধ ধরে সে সমবেত অতিথিবৃন্দের দিকে তাকাল। তারপর বলতে লাগলঃ বন্ধুগণ আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু এই জালাল। আমরা সুলতানের-অধীনে তার এই বিশেষ পদগৌরব লাভের জন্য সবাই আনন্দিত। জালাল.

দূরে যাচ্ছে। কিন্তু একথা বিশ্বাস করি যে দূরে যাবার জন্য এবং সম্মানজনক পদপ্রাপ্তির জন্য সে আমাদের কোনদিন ভুলে যাবে না। যাতে ভুলতে না পারে, ভুলতে না দেয়, সেইজন্য আমি তাকে এই গরীব বান্দার একটি যৎসামান্য উপহার দিচ্ছি। যৎসামান্য হলেও দিতে সাহস করছি এইজন্য যে উপহারের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বেও একটা মূল্য আছে, সেটা তার নিজস্ব। সেই মূল্য অন্তরের স্পর্শে মূল্যাতীত। সুতরাং....এই বলে বুরাহন তার অঙ্গরাখার আড়াল থেকে ক্ষুদ্র একটি পেটিকা বের করল। সকলে দেখল সেই পেটিকার বহিরঙ্গ বহু মূল্যবান হীরকখচিত। সেই পেটিকা উন্মোচন করে তার ভেতর থেকে একটি হস্তলিখিত ক্ষুদ্র কোরাণ বের করে পেটিকাসহ সেই কোরাণটি সে জালালের হাতে অর্পণ করল।

সমবেত অতিথিরা এক সঙ্গে সকলে সাধুবাদ দিয়ে উঠল।

জালাল সেই ধর্মগ্রন্থকে বহু শ্রদ্ধাভরে নিজের বুকে চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে যথাসাধ্য তাদের উপহার বের করে জালালের সামনে পাত্রটির উপর রাখল। স্বর্ণখচিত ছুরিকাবরণ থেকে সুলতানি মোহর পর্যন্ত বহুপ্রকার উপহারের স্তূপ জমে উঠল।

রিহান আর চমনলাল ওরা দুজনেও প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। চমনলাল তার উপহার রাখল—একটি হস্তীদন্তনির্মিত অপ্সরা মূর্তি। তার গাত্রাভরণ স্বর্ণালঙ্কারভূষিত। সেই স্বর্ণলঙ্কারের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল্যবান প্রস্তর বসানে। অপ্সরার হাতে একটি দর্পণ। দর্পণের মুখে বোধহয় স্ফটিক বসানো, কারণ তা এত স্বচ্ছ যে তার উপর অপ্সরার মুখচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সকলে একবাক্যে তার তারিফ না করে পারল না। জালাল নিজেও অভিভূত হল।

এবার এগিয়ে এল রিহান। সকলের কৌতূহল বাড়ল, কারণ রিহানও বাণিজ্যে গিয়েছিল। হস্তীদন্তনির্মিত অপ্সরা মূর্তিটি চমনলাল গুজরাটের বন্দর থেকে কিনে এনেছিল। রিহান দিল দক্ষিণভারত থেকে আমদানী করা নারকেল মালার উপর মুল্যবান পাথরের কাজ করা একটি ফুলদানী। নারকেলের মালাও মূল্যাতীত মূল্যের হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সকলে একদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। দর্শকেরা একবার সেই ফুলদানী একবার সেই অপ্সরা মূর্তির দিকে তাকাতে লাগল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখবার পর তাদের বিস্ময়ের ঘোর অনেকটা কেটে গেলে ভূষণ খাঁ উঠে দাঁড়াল। সকলে কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকাল। সঙ্কোচভরা পায়ে ভূষণ ধীরে ধীরে জালালের কাছে এগিয়ে গেল, তারপর সমবেত অতিথিদের দিকে তাকিয়ে বললঃ আমি অত্যন্ত অভাজন। ঐশ্বর্য্য বলতে আমার কিছু নেই। কিন্তু হৃদয়কে যদি ঐশ্বর্য্য বলা যায়, তবে আমি সেই হৃদয়ের সামান্যতম অর্ঘ্য এনেছি আমাদের বিদায়ী বন্ধুর জন্য। এই বলে সে ছোট্ট একখণ্ড কাগজ বের করল। সকলে চোখে গাঢ় কৌতূহল টেনে ভূষণ খাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল। ভূষণ তার সেই কাগজখানি চোখের সামনে ধরে পাঠ করতে লাগলঃ

'দোস্তের মহিমা বন্ধু কহিতে পায় সুখ—
জালালের মহিমা অপার সবে পঞ্চমুখ।
শুন কহি বন্ধুবৃন্দ জালালের প্রেম,
নিগূঢ় নির্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম।

তেঁই সে নির্মল প্রেমে ভুলিবেক কেবা
বড় দঃখ পাই বন্ধু যাবে রাজসেবা।
সুলতান গৌড়েশ্বর অতি ভাগ্যবান
জালালের হেন শুদ্ধ কর্মচারি পান।
অভাগা আমরা এই পূর্ব গৌড়বাসী
বঞ্চিত জালালসুখ মধুপ পিয়াসী।
সর্বজনে দিলা অর্ঘ্য বহুমূল্য দান
অভাগা ভুষণ নহে দানের সমান।
মণিমূল্য হইতে বড় মনতুল্য মণি
জালাল হৃদয় যেন মুক্তাময় গণি।
তেঁই কিবা দিব ভাবি অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
শুধু দুটি বাক্য দিলা এ ভূষণ খান।

কবিতা পাঠ শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে সমবেত যুবকমণ্ডলীর করতালি উঠল। জালাল প্রায় ছুটে এসে ভূষণ খাঁকে জড়িয়ে ধরল। বললঃ দোস্ত্ সবার দানই মূল্য দিয়ে মাপ করা যাবে, কিন্তু তোমার দানের পরিমাপ নেই—কারণ তুমি যা দিয়েছ তা একমাত্র তোমারই। তামাম দুনিয়া খুঁজলেও অন্যত্র আর এ জিনিস মিলবে না, কারণ এ যে তোমার মনের খনি থেকে আহরিত। আর সেই মনের অধীশ্বর তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

শুধু জালাল নয় সমবেত সবাই খুব সন্তুষ্ট হল। এই কবি ভূষণ খাঁ তাদের সবার কাছেই প্রিয়।

ভূষণ এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু পেশা একমাত্র বিদ্যার্জন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সারা দিন পুঁথিপত্র ঘাটে আর লেখে। লেখে কবিতা। তার কবিতার মূল্য অর্থ দ্বারা যাঁচাই হয় না—এবং তা দিয়ে সে নিজের সৃষ্টির মূল্য নিরূপণ করতেও রাজী নয় বোধ হয়। অন্তরের সৃষ্টির মূল্য অন্তরের অর্থই দিতে পারে। সেই অন্তরের অর্থ হল সমবেদনা দিয়ে গ্রহণ। স্রষ্টা অপরের হৃদয়ে গৃহীত হলেই খুশী। মণিমুক্তায় লোভ নেই—হৃদয়ই তার লক্ষ্য।

এই তরুণ মৃদুদর্শন কবিটিকে তার বন্ধুরা হৃদয়ের দরদ দিয়ে গ্রহণ করতে কখনো কার্পণ্য করেনি—তাই ভূষণ দরিদ্র ঘরের ছেলে হলেও অপাংক্তেয় নয়। ঐশ্বর্য্যের বরপুত্রদের সান্নিধ্য সে লাভ করেছে। আর গভীর বাস্তবপ্রসাদপুষ্ট তনয়েরা অবাস্তব ঐশ্বর্য্যকে বাস্তবের উর্ধ্বেই মূল্য দিয়েছে।

ভূষণের কবিতার প্রত্যুত্তরে জালালের ব্যবহার এবং সমবেত বন্ধুদের সাধুবাদই তার প্রমাণ।

ভূষণের প্রশস্তিকমূলক কবিতা দিয়েই উপহার পর্ব শেষ হল। এবার গৃহস্বামী বুরহান আবার উঠে দাঁড়াল। নাটকের শেষ অঙ্ক এখনো বাকী। শেষ কিংবা চূড়ান্ত অংশ কে জানে! আবার হয়তো আরম্ভও হতে পারে। কারণ মানুষের ভাবনা চিন্তার বাইরে আর

একটি ইচ্ছা কাজ করে। তার কাছে কখনো আরম্ভই শেষ অবার শেষই আরম্ভ হয়। সেই অদৃশ্যশক্তি নিয়তি মনে মনে কি ভেবে রেখেছিল সেই জানে, কিন্তু বুরহানের মতে এটা ছিল শেষ অঙ্ক। বুরহান বলল: বন্ধুগণ জলাল দূরদেশে যচ্ছে বলে যদিও এ আমাদের বিদায় সংবর্ধনা, তবুও এর মধ্যে বিদায়ের বেদন রাগিনী বাজছে না বলেই আমার ধারণা। সাময়িক তার অদর্শনে আমরা একটু ব্যথিত হব নিশ্চয়ই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আমাদের আনন্দেরই ব্যাপার। আমরা গর্বিত যে সে প্রবল প্রতাপান্বিত গৌড়েশ্বরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছে। অমরা আনন্দিত যে সে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছে। সুতরাং জালালের উদ্দেশ্যে আয়োজিত আমাদের এই সংবর্ধনা আনন্দ উৎসবেরই সমতুল্য। আজকের এ আযোজন আনন্দের মধ্য দিয়েই শেষ হওয়া উচিত। যদিও বন্ধুজন সমাবেশই জীবনে পরম আনন্দের কারণ তথাপি তার বাইরেও একটু আনন্দের আযোজন করেছি। সানন্দে আমাদের প্রিযতম দোস্ত্ জালালও এ আযোজনকে উপভোগ করবে। এই কথা বলে বুরহান দূরে দাঁড়ানো বান্দাকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশে হিরণ্ময়দ্যুতি ঝুলন্ত ঝালর দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। দেখা গেল একদল যন্ত্রী সাবেঙ, তবলা, বেহালা, বাঁশী প্রভৃতি যন্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সবাই এসে কক্ষের মধ্যভাগে বিস্তৃত বহুমূল্যবান কার্পেটের উপর এসে দাঁড়ালো এবং সমবেত অতিথিদের প্রত্যেককে সালাম জানিযে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়ল। কারো বুঝতে বাকী থাকল না যে বুরহান নৃত্যের আয়োজন করেছে। তারা সবাই এ ব্যবস্থাকে নিশ্চয়ই মনে মনে নিতান্ত তারিফ করল। অতিথিদের সবাই তরুণ। উদ্দাম যৌবন আর দুরন্ত কল্পনা এবং নিবিড় স্বপ্নে জড়িত সবাই। সকলের চোখে মুখে তখন একটা বিশেষ আগ্রহে ভাব ফুটে উঠল। একটা ঔৎসুক্য নৃত্যনাট্যের নায়িকাকে দেখাব জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রবেশপথে সকলে এক দৃত লতিকাকে দেখতে পেল। নিতম্বপ্রদেশ ঘাগরায আচ্ছাদিত। উন্নত পীনপযোধর কাঁচুলিবদ্ধ। বিলম্বিত ঘনকৃষ্ণ বেণী। জড়োযার গহনায় অঙ্গ জড়িত। দেহের ত্বকে হিরণ্ময় দ্যুতি। নৃত্যনাট্যের সেই নাযিকা সভার মধ্যস্থলে এসে ঘুরে ঘুরে সবাইকে সালাম জানাল। প্রত্যেকেই এক দৃষ্টিতে তার মুখমণ্ডলের দিকে তাকিযে থাকল। নর্তকী যেন রক্ত মাংসের নয, একখণ্ড বহু মূল্যবান হৈমবর্ণ প্রস্তরখণ্ডের মূর্তি। সেই প্রস্তরখণ্ড থেকে একটা ছটা ছুটে বেরুচ্ছে। রক্তরাঙা দাড়িম্বের মত বিম্বাধোধর। চোখ দুটি আয়ত এবং উজ্জ্বল মোমের আলোয় তার মণি দুটির রঙ পর্যন্ত ধরা পড়ে যাচ্ছে। দুটো মণি যেন বৃত্তাকার দুটো নীল সাগর—এবং তর মধ্যে দুটি বৈদুর্য্যমণি স্থিত—কারণ কখনো কখনো আলোর রেখা ঠিক সেই মণি দুটির মধ্যভাগে পড়ে তেমনি এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। ঠিক এ যেন প্রস্তরখোদিত মূর্তিও নয, কারণ প্রস্তরে গতি নেই। এ চঞ্চলা। এ যেন মূল্যবান মণিনিসৃত আলোর ঝলকানি। চঞ্চল, জীবনীশক্তি সম্পন্না, কিন্তু ধরা যায় না। ত্রকে ধরা যায় কি? ধরা যাবে কি? অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিল। সমায়িক কালের জন্য সে কারণে সকলের দৃষ্টি আসন্ন বিদাযী বন্ধু জালালকে ত্যাগ করে তার দিকেই নিবদ্ধ হল। রিহানের বুকটা হঠাৎ তাকে দেখে প্রথমটা লাফিয়ে উঠেছিল যেন—কে! ফারুকউন্নিসা কি? অনেকটা সেই রকমই দেখতে। চমনলালও সেই মুহূর্তে রিহানের

দিকে তাকিয়ে ছিল। প্রথমটা সেও তেমনি ভুল করেছিল। তার পরই ধরা পড়ে। প্রায় ফারুকউন্নিসার মতই। কিন্তু নর্তকীর নাসিকা আর ভ্রূযুগল একটু অন্যরকম। ফারুকউন্নিসার নাসিকা ছিল আরো তীক্ষ্ণ। ভ্রূদুটি আরো দীর্ঘ। এবং সেজন্য তার মধ্যে একটা শান্তশ্রী ফুটে উঠেছিল যার অভাবে এ রমণী মূর্তি একটা চঞ্চল মোহিনী আকর্ষণে ভরে উঠেছে। ফারুক সুমুদ্রের গভীরে টানতো বলে তার সৌন্দর্য্যের নিবিড় বিস্তার মনকে কিছুটা আকর্ষণ করলেও অবগাহণ করতে সাহস হোত না। দূরে থেকে দেখে ভাল লাগত, কিন্তু কাছে এলে তার অতল স্পর্শ গভীরতায় যে একটা স্থির ভাব জাগত তা দেখে শেষ পর্যন্ত কেমন একটা ক্লান্তি এসে যেত যেন। ঠিক স্থির সমুদ্রের মত। প্রথমটা দেখতে ভাল লাগে বটে তারপর কিছুদিন দেখলে ক্লান্তি লাগে। তাই ফারুকের সৌন্দর্য্যকে যথাযত উপভোগ করা যায়নি। রিহান ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিল। এ নর্তকীও সমুদ্র, তবে তরঙ্গায়িত। তাই একটা জীবনের সাড়া পাওয়া যায়। আকর্ষণ করে। একে দেখবামাত্র রিহানের গুজরাটের সমুদ্র তীরে ফারুকের স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠল। যে চাঞ্চল্যের অভাবে ফারুক তাকে উন্মাদ করতে পারেনি, নতুন ফারুক তার রূপের উপর সেই চঞ্চল উন্মাদনার ঢেউ তুলে তাকে যেন পাগল করে দিল। কিন্তু দুলারীবাঈয়ের কথা মনে করে চমনলাল একটু নিজের মনের মধ্যেই হেসে নিল। হ্যাঁ দুলারীবাঈ সামায়িক তার মনের মধ্যে একটু দোলা দিয়েছিল বৈকি! কিন্তু চমনলাল কি সত্যিই অন্ধ ছিল! নইলে দুলারীবাঈকেও তার মনে ধরবে কেন? বর্তমানে এই নর্তকী যদি সুন্দরী, তবে তাকে কি বলা যেতে পারে? ভাগ্যিস সে সাময়িক দুর্বলতার কাছে নতি স্বীকার করে তাকে সে নিয়ে আসেনি। যদি আনতো, আজকে এই নতুন নর্তকীর পাশে তাকে দু হাতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকতো না।

চমনলাল এবং রিহানের মত প্রায় সবাই এই রমণীকে ঘিরে কল্পনা করতে লাগল। এবং নিজেদের জীবনের যে অপর্ণতা তা একে পেলেই পুর্ণ হবে এমন ভাবতে লাগল। জালাল হয় তো ভাবল—সুলতানের অধীনে রাজকর্ম্মচারির পদ গ্রহণ করে দূরে যাওয়াতেই তার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে। একে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। দূরে যাবার জন্য সমবেত বন্ধুরা তাকে বিদায় দিচ্ছে বলে মনে হয়নি, কিন্তু এবার সত্যি বিদায় বলে মনে হল। জীবনের কাছ থেকেই সে দূরে যাচ্ছে যেন, একটা বেদনা অনুভব করল সেজন্য। সে একটু বিমর্ষ হল। ভূষণ খাঁ একটি মঙ্গলকাব্য রচনা করবে বলে মনে করেছিল। মনের মত একটি দেবীর সন্ধান করছিল সে তখনো। অবশেষে পেয়েছিলও সে। ধনদা লক্ষ্মী রূপ এবং ঐশ্বর্য দুয়েরই জন্য বিখ্যাত। কাব্যে রূপ এবং ঐশ্বর্য দুয়েরই প্রয়োজন আছে। তাই সে দেবী লক্ষ্মীর মঙ্গল গানের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু সেই সমুদ্রমন্থনোত্তলিতা দেবীর নিবিড় সৌন্দর্য্যের একটা স্পষ্ট কল্পনা সে যেন নিজের মধ্যে আনতে পারছিল না। তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তার স্বপ্নকে যেন কিছুতেই ধরতে পারছিল না। হঠাৎ এই রমণী মূর্তির দিকে তাকিয়ে তার মন বলে উঠলঃ 'পেয়েছি, পেয়েছি।' সে মুগ্ধভাবে সেই বিলোল-কটাক্ষ নর্তকীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

নর্তকী দ্বিনয়না হলেও তাকে সহস্রাক্ষিণীর মত দেখাল। তার দুটি চোখ দিয়েই সে

যেন একই সময়ে সকলের দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগল। তার আঁখি-সুধা পান করে সবাই নিজেকে তৃপ্ত মনে করল। নর্তকী গানের সুর ধরলঃ

আনন লোনুঅ বচনে বেলএ হঁসি
অমিঅ বরিস জনি সরদ পূর্ণিমা সসি।

গানের কলি শুনে সকলে আরও আশ্চর্য হল। এ গান বাঈজী-কণ্ঠের চিরাচরিত গান নয়। হিন্দুস্থানী সংগীতও নয়। এ গান এ পেল কোথায়? বিশেষ করে ভূষণ খাঁ সে কথাই ভাবতে লাগল। অন্য সবাই চিন্তা করল—তাহলে এ কি....!

বাঈজীর মুখে বাংলা গান প্রথম। কিন্তু মাতৃভাষাতে গানের কলি রচিত হওয়াতে আসরে যেন এক নিবিড় মধুময় পরিবেশের সৃষ্টি হল। আর সেই মুহূর্তে বাঈজীকে সকলে আরো নিকটতর বলে মনে করল। তাকে আরো বেশী ভাল লাগল।

গনের সুরের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিমধুর বেহালা বাজতে লাগল। তবলা বাজল। তারপর গানের একটি পয়ার শেষ হলে নর্তকীর চরণমঞ্জীরে ধ্বনি উঠল। সেই ধ্বনি এমন প্রাণচাঞ্চল্যকর যে সকলে দেহের মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর শিহরণ অনুভব না করে পারল না। নর্তকী তার যৌবনহিল্লোলিত দেহলতা বঙ্কিমভঙ্গীতে আন্দোলিত করল। যেন একটা পাহাড়ী ঝর্ণা নৃত্যের ছন্দে ছন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই নিবিড় সৌন্দর্যের মধ্যে একটা চঞ্চল উচ্ছলতা। সবুজ ধান্যশীর্ষে হাওয়ার আন্দোলনে যেমন একটা মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তেমনি এক আকর্ষণীয় লাবণ্য ফুটে উঠল তার মধ্যে। সেই উদ্বেলিত দেহের আবেগ যেন প্রতিটি দর্শককেও আবেগময় করে তুলতে লাগল। নিজের কথা, আপন জনের কথা, পবিবেশের কথা প্রয়োজনের কথা সব যেন ভুল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আবেগের গভীবতা এতদূর গিয়ে পৌঁছুল যে শতজনের মধ্যে থেকেও প্রত্যেকে আর সকলের কথা ভুলে গেল। মনে হতে লাগল সে আর নর্তকী ছাড়া আর যেন কেউ নেই। তার লক্ষ্য নর্তকী এবং নর্তকীর লক্ষ্য সে। সেই বিলাসিনীর নয়ন-কটাক্ষ শুধু তার উপরেই যেন বর্ষিত হচ্ছে আর কারো উপরে নয়। এমনি করে নর্তকী তার যাদুময় আকর্ষণী শক্তিতে প্রত্যেককে অভিভূত করে দিয়ে শেষপর্যন্ত তার নৃত্য বন্ধ করল এবং গান থামাল। এক মুহূর্তকাল আর সকলে অন্য কিছুই ভাবতে পারল না। উন্মত্ত নেশার পর দেহে যেমন একটা আলস্যের ঝিম লেগে থাকে তেমন একটা ঝিমানো ভঙ্গতে সকলে বসে থাকল এবং দুটি উজ্জ্বল রত্নের মত প্রত্যেকের নয়নকোটরে দুটো চোখের মণি সেই নর্তকীর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে থাকল। নর্তকী সেটা দেখতে পেল এবং বুঝল তার যাদু প্রত্যেকের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত কামনার সৃষ্টি করতে পেরেছে। এই উপযুক্ত মুহূর্ত। এই সময়ই আমীর পুত্রদের কাছে হাত পাততে হয় এবং....।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ সে চমকে উঠল। রীতি পরিত্যাগ করে হঠাৎ কার কণ্ঠ শোনা গেল—আর একটি। এ কণ্ঠ ভূষণ খাঁর। তার শিল্পীমন এক আশ্চর্য জীবন্ত শিল্পকে সামনে দেখে বাস্তব সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রতিদানের প্রশ্নটাও আর মনে নেই। শুধুমাত্র অফুরন্ত এক অবাস্তব প্রাপ্তির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছে সে। ভূষণ খাঁর কণ্ঠ যেন প্রত্যেকেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। তাই সেই মুহূর্তে আর সকলেও চিৎকার করে উঠল—আরো, আরো!

এমন ব্যতিক্রম নর্তকী পূর্বে দেখেছে কি? সেকি একটু মনোক্ষুন্ন হল? বলা শক্ত। কিন্তু সে আবার প্রস্তুত হল। অন্য একটা গানের কলি মনের মধ্যে ভাঁজতে থাকল। হয়তো সে বুঝেছিল যে এই রীতিভঙ্গ আশাভঙ্গের নয়। এই অভূতপূর্ব চমক, প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই পূর্ব রীতি ভঙ্গ করবে—অর্থাৎ দানের পরিমাণ আশাকেও অতিক্রম করে যাবে। তাই বোধ হয় সে দ্বিতীয় বারের উদ্যমে দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করল। আবার তার কণ্ঠে ফুটে উঠলঃ

"অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি
চলিতে পেখল গজরাজ গমনি ধনি ধনি।"

আবার সেই মাতৃভাষার পয়াব। আবার সেই আত্মীয় সান্নিধ্য। মনের কথা যেন মর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল সবার। শুধু ভূষণ খাঁ এবার আরও একটু চমকিত হল—একি! কবির শেখের এ পদ এ নর্তকী পেল কোত্থেকে? এ তো তাহলে সামান্য নর্তকী নয়! সেই মুহূর্তে সে নিজের মনটাই যেন সমর্পণ করে বসল নর্তকীকে।

নর্তকীর গানের সুর এগিয়ে চলল ঃ

"কাজলে রঞ্জিত ধবনি ধবল নয়ন ভালে
ভোমরা ভুলল বিমল কমল দলে"

কি আশ্চর্য! সুরটাও যে চিরাচরিত নয! এ যে সম্পূর্ণ অভিনব! আশ্চর্য হয়ে ভূষণ খাঁ ভাবতে লাগল এ যে স্বতন্ত্র সৃষ্টি! কে করল! কিন্তু অন্যান্যরা সেটা বুঝতে পারল কি না তা বোঝা গেল ন। কারণ তাদের মধ্যে জাগ্রত শিল্পচেতনা নেই। তারা মুগ্ধ, মুগ্ধ অন্য জাদুতে। কিন্তু ভূষণ খাঁ ততক্ষণ অবাস্তব আর এক সৌন্দর্যকে মনোপ্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে। ঐ নর্তকী ততক্ষণ তার কাছে উপলক্ষ্য মাত্র। তার মধ্য দিয়ে দেহকে অতিক্রম করে এক দেহাতীত আশ্চর্য জগৎ তখন তার কাছে উঁকি দিয়েছে।

আবার নর্তকীর দেহ বঙ্কিম ভঙ্গীতে ছন্দায়িত হল। যেন কয়েক টুকরো আ[illegible] [illegible] করে উঠল। আবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। নূপুরের রুমঝুম, তবলার বোল আর বাঁশীর সুর সকলকে যেন এক রহস্যময় জগতের মধ্যে নিয়ে গেল। এক অপূর্ব সঙ্কেতে সে যেন সকলকে হতচেতন করে রাখল। তারপর একসময় ধীরে ধীরে কখন আবার তার লীলাময় ভঙ্গী শেষ হল। নর্তকী ফিরে তাকাল সকলের দিকে। দর্শকেরা তখনো বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। তার খেলা শেষ হয়েছে একথা যেন বিশ্বাসই করতে পারল না অনেকক্ষণ। কিন্তু অবশেষে তাদের.চেতনা ফিরে এল যখন তারা দেখল নর্তকী সালাম জানিয়ে পুরস্কারের প্রত্যাশায় আজকের আয়োজনের মধ্যমণি, বিশেষ অতিথি জালালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কি দেবে জালাল কিছুক্ষণ যেন ঠিক করতে পারল না। নিজের কাছে কি আছে ভাবতে লাগল। অবশেষে নিজের হীরক অঙ্গুরীর দিকে নজর পড়ল। একখণ্ড উজ্জ্বল হীরক হাতের আঙুলের উপর জ্বল জ্বল করছে। সে তাই খুলে নর্তকীর হাতে দিল। নর্তকীর মুখে একটা আনন্দের আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হীরকখণ্ডের মূল্য সে জানে। নর্তকী তার উপহার সানন্দে গ্রহণ করেছে ভেবে জালাল যেন আনন্দ পেল, নিজেকে কৃতার্থ বোধ করল।

নর্তকী গিয়ে দাঁড়াল রিহানের কাছে। রিহানও সেই একই সমস্যার মধ্যে পড়ল—কি দেবে? যে শিল্পসৃষ্টির একখণ্ড জালালকে উপহার দিয়ে সে কিছুকাল পূর্বে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল সে উপঢৌকন এ ক্ষেত্রে নিতান্ত তুচ্ছ বলেই যেন মনে হল। মনে হল, মূর্তিমান শিল্পকে আর কি শিল্প দিয়ে অভিনন্দন করা যায়! তাকে মূল্য দিয়ে প্রশ্রয় দিতে হয়। কিন্তু তেমন মূল্য রিহানের কাছে আছে কি? হঠাৎ নিজের কণ্ঠহারের কথা মনে পড়ল তার। পঞ্চাশ হাজার দিনার এর মূল্য। গৌড়জনের ঈর্ষার বস্তু। নির্বিকারে সেই বহু মূল্যবান কণ্ঠহারটি সে খুলে দিল নর্তকীকে।

নর্তকী এবাব গিয়ে দাঁড়াল চমনলালের পাশে। এর তুল্য মূল্যের কোন জিনিস পৃথিবীতে আছে বলে চমনলালের মনে হল না। সে নিজে কর্ণভূষণ দুটো খুলে দিল তাব হাতে। একবার বাণিজ্যের সমস্ত লাভের সমান মূল্যের সেই কর্ণভূষণ দুটি।

এবার নর্তকী গৃহস্বামী বুরহানের দিকে তাকাল। একটি মিনা করা পাত্রের উপর মোহর সাজান ছিল। জনৈক বান্দা অদূরে তাই নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বুরহান ইঙ্গিতে কাছে ডেকে, সেই পাত্রটি তার কাছ থেকে নিয়ে নর্তকীর হাতে তুলে দিল। এক ঝলক হাসি খেলে গেল নর্তকীব মুখে। বুরহানকে সালাম জানিয়ে সে অন্য আমীরের কাছে গেল। অবশ্য আমীর বলা উচিত নয়—অধিকাংশই এখানে আমীর পুত্র। প্রত্যেকেই তাব যথাসাধ্য দান করল। অবশেষে সে গিয়ে দাঁড়াল ভূষণ খাঁর কাছে। সকলেই একটু চমকিত হল, সকলেই একটু অপ্রস্তুত হল যেন। হায় ভূষণ লজ্জিত হবে। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুমার শিল্পপ্রসাদে পুষ্ট। সে অন্য জাতের ঐশ্বর্যের অধিকারী। তাই তার বাস্তব ঐশ্বর্যের ভিত্তিতে মূল্য স্থির না করে বন্ধুবান্ধবেরা তাকে এক অমূল্য আসন দিয়েছিল নিজেদের মধ্যে। তারা যে শিল্পের মর্য্যাদা দিয়েছিল, নর্তকী তা দিতে পারল না ভূষণের বেশভূষা দেখেও কি নর্তকী বুঝতে পারল না! একমাত্র উপবীত ব্যতীত কিইবা দেবার আছে তার! সকলে একটু লজ্জিত আর বিমর্ষ হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় শুনল ভূষণ কি বলছে। কি বলছে? সকলে সেই দিকে উৎকর্ণ হল। শুনল, দেখল, ভূষণ এতটুকু অপ্রস্তুত না হযে বলছেঃ

কি দিব তুয়ারে ধনি।
আপনি অপরূপ রূপ রমণী মণি॥
স্বরগ জিনিয়া মণি ধরল নয়ন বর।
রাই মুখ রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

শিল্পীকে তার শিল্প বঞ্চনা করেনি। আপনি তার কণ্ঠে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন। মূল্যাতীত উপহার দিয়েছে ভূষণ। সকলে সাধু সাধু করে উঠল। একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল নর্তকীর মুখে। সে তাকে সালাম জানাল। তার সে হাসি দেখে মনে হল—এতক্ষণ যে মূল্য সে পেয়েছে—তার চেয়ে বেশীমূল্য ভূষণ তাকে দিয়েছে। ইয়ার-বন্ধুরা একটু আশ্বস্ত হল।

এবার তারা উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। গৃহস্বামী বুরহানের কাছে সকলে বিদায় চাইল—এবং একে একে নাটমহল ত্যাগ করতে উদ্যত হল। নর্তকী তখনও মিহি মসলিনের ওধারে দাঁড়িয়ে-ছিল—কেন কে জানে অপসৃয়মান দর্শকদের দিকে সে তাকিয়ে ছিল।

চলে যাবার আগে শেষবার সেই অবস্থায় তাকে দেখবার কৌতূহল কেউ ত্যাগ করতে পারল না। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সকলে দেখল নর্তকী কাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সকলেই ভাবল তাকে কি? প্রত্যেকের অন্তরেই যে নর্তকীর জন্য বিশেষ কামনা জেগে উঠেছে! কিন্তু সকলেই দেখল নর্তকীর চোখের দৃষ্টি তাদের দৃষ্টির সঙ্গে মিলছে না। তবে? তবে কে সে ভাগ্যবান পুরুষ? ভূষণ খাঁ বুঝল নর্তকীর দুটি গভীর কালো চোখ তার দিকেই নিবদ্ধ। সে এগিয়ে গেল। যেন বীণা থেকে একটা সুর নিসৃত হল। নর্তকী বলল: বাঁদীর নাম আসমানতারা। মেহেরবান জনাবের নাম জানতে পারি কি?

প্রত্যেকেই হৃদয়ে যেন বৃশ্চিক দংশন অনুভব করল। —কেন, তার কারণটা আর ভাববার সময় হল না—কিন্তু অনুভব করল।

ভূষণ বলল: এ গরীবের নাম ভূষণ খাঁ।

নর্তকী বলল: পশ্চিম গড়ে থাকি আমি। জনাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে খুশি হব। হায় ভূষণের যে রূপ-কল্পনার দারিদ্র্য এ পর্যন্ত ছিল—তা যে আজ দূর হল এই নর্তকীর কল্যাণে! ভূষণ তারি কাছে কৃতজ্ঞ। বলল: আমিও খুশি হব সুন্দরী।

রক্ত ওষ্ঠে একটুখানি বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সুন্দরী। ঐশ্বর্য থাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে, কিন্তু আজ সরস্বতী তাকে লুণ্ঠন করল। অনেকেই যেন কেমন বিষণ্ণ, ব্যর্থ, ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু এ পরাজয়কে স্বীকার করে নিয়ে জালাল এগিয়ে এসে ভূষণকে অভিনন্দন জানাল: কবি, সত্যি তুমি জয়ী। মণি দিয়ে কি তার চেয়ে মূল্যবান মণি পাওয়া যায়? যায় না। শ্রেষ্ঠতম মণির মূল্য তার মূল্য নিরূপণ করা। তুমি সেই মূল্য নিরূপণ করেই জয়লাভ করেছে। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সেই সঙ্গে অন্য সকলেও ভূষণ খাঁকে অভিনন্দিত করল।

কিন্তু সকলেই অন্তর থেকে কি?

তিন

"আমরা দুজন ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

পরদিন গৌড়ে আবার সোনালী প্রভাত এল। দূরে দক্ষিণে নহবৎখানা থেকে সানাইয়ের মধুর রাগিনী শোনা গেল। প্রভাতেই সুলতানের নতুন সিপাহশালার ত্রিহুত রওনা হবেন। জালালও যাবে। তাকে শেষবারের মত বিদায় সংবর্ধনা জানানো প্রয়োজন। বন্ধুবান্ধবেরা সবাই সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। এক্কা গাড়ীতে চাপল রিহান। চমনলালের ঘরের পাশ দিয়েই তাকে যেতে হল। কিন্তু কী আশ্চর্য আজ সে তাকে ডাকবার জন্য থামল

না। বরাবর সে এগিয়ে গেল গৌড়ের প্রধান তোরণের দিকে। চমনলালের কথা কি সে ভুলে গিয়েছিল! কিম্বা নিজের মনের মধ্যে কোন একটি কল্পনাতে সে এতই ব্যাস্ত ছিল যে অন্য কোন কথা আর মনে পড়ল না? কিম্বা কোন ঈর্ষা? হলে কিসের ঈর্ষা? চমনলালের সঙ্গে আজ পর্যন্ত তার কোন স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয়নি। তাই সে মুসলমান হলেও হিন্দু চমনলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পেরেছিল। চমনলালও তার ব্যবসায়িক বুদ্ধি দিয়ে রিহানের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে কখনো ইতস্ততঃ করেনি। রিহানের বাণিজ্যের বুদ্ধিতে সেই তাকে হাতে খড়ি দিয়েছে বলা যেতে পারে। তাহলে কোনদিন যে ভুল হয়নি রিহান আজ সেই ভুল করল কেন? চমনলালের গৃহের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার কথা মনে পড়ল না কেন? সে কি একটু দেরী করে ফেলেছে? সুলতানের বাহিনী রওনা হয়ে গেছে—তাই আর বিলম্ব করা চলে না? এ কথার উত্তর রিহানই জানে।

অপর পক্ষে চমনলালের খোঁজ নিলেও দেখা যেত যে, সে ততক্ষণ নহবৎখানার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন? তাহলে জালাল কি তাদের অত্যন্ত প্রিয়তম বন্ধু যাকে বিদায়ের আগে আর একবার না দেখলেই নয়? তাই কেউ আর কারো জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি? কে জানে!

রিহানের গাড়ী এগিয়ে চলল। সদ্য নিদ্রোত্থিত গৌড় নগরীর উপর তখনও আলস্যের শিশির লেগে রয়েছে। তার সেই নিদ্রাজড়িত শান্ত ভাবকে উচ্চকিত করে রিহানের এক্কা এগিয়ে চলল। পাথরের উপর এক্কাযানের দুইটি বৃত্তাকার কাষ্ঠচক্র ও অশ্বখুর একটি বিশেষ ধরনের শব্দ করে চলল। কিন্তু সেই শব্দ রিহানের কর্ণমূলে প্রবেশ করতে পারল কিনা কে জানে। কী এক তন্ময় ভাবের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে রিহান যেন পরিবেশকে ভুলে গেছে। সে শুধু নিজের মনের দিকে তাকিয়ে আছে। এই অবস্থায় তার গাড়ী গিয়ে নহবৎখানার কাছে দাঁড়াল। নহবৎখানার একটু আগেই গাড়ী থেকে নামতে হয়—কারণ সুলতানের মর্য্যাদা রাখার জন্য নহবৎখানায় অন্য কারো গাড়ী নিয়ে যাওয়ার হুকুম নেই। কয়েক পা হেটে গিয়ে রিহান প্রধান তোরণে উপস্থিত হল। তখনো সানাই বাজছে। নহবৎখানায় দিনরাত অবিরাম সানাই বাজে—সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বরের গৌরব ঘোষণা করার জন্যই। তাঁর প্রতিপত্তির, তাঁর ঐশ্বর্যের কোন শেষ নেই।

রিহান দেখল সিপাহশালারের বাহিনী নহবৎখানার বাইরে কুচ্‌কাওয়াজ করছে। তখনো সিপাহশালার এসে পৌঁছাননি। কিন্তু জালাল উপস্থিত রয়েছে। জালালের পাশে রয়েছে বুরহান, চমনলাল ও অন্যান্য ইয়ার বন্ধুরা। জালাল রিহানকে দেখামাত্র উল্লসিত হয়ে উঠল। চিৎকার করে বললঃ এই যে দোস্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি। সে এগিয়ে এসে রিহানকে জড়িয়ে ধরল। দুই বন্ধু পরস্পরকে আলিঙ্গন করল।

রিহান বললঃ তোমার উন্নতি কামনা করছি। ত্রিহুতে নিশ্চয়ই আনন্দে থাকবে।

জালাল বললঃ সে কি সম্ভব?

রিহান বললঃ আল্লা করুন—তাই সম্ভব হবে।

জালাল বললঃ কিন্তু সুখ ঐশ্বর্যেও নয়, প্রতিপত্তিতেও নয়, সুখ আসে আত্মীয় বান্ধবের অনাবিল সান্নিধ্য লাভের মধ্য দিয়ে। সেই বন্ধুদের আমি গৌড়ে রেখে যাচ্ছি। দূরে গিয়ে কি আমি শান্তি পাব?

রিহান তাকিয়ে দেখল—সত্যি জালালের মুখ বেদনাক্লিষ্ট। ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির বাইরেও একটি জগৎ আছে, তা হল হৃদয়ের জগৎ। তার একটু ছোঁয়া না পেলে মনটা হাহাকার করে। দূর দেশে বাণিজ্যে যাবার আগে রিহানেরও এমন করত। তবু তো তার সঙ্গে সব সময় চমনলাল থাকতো। অথচ তা সত্ত্বেও দুজনেই গৌড় ছাড়বার আগে অত্যন্ত ভেঙে পড়ত। গৌড়ের একটি বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে, তা ঠিক গৌড় ছাড়বার মুহূর্তে আর দীর্ঘদিন প্রবাসের পর গৌড়ে ফিরে এলে তবেই বোঝা যায়। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্রই মায়ার অবাধ রাজত্ব। সর্বত্রই কিছু কিছু আকর্ষণ করবার আছে। একবার গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছুলে তার বিশেষ আকর্ষণও এই বিয়োগ ব্যথাকে আনকটা লাঘব করে দেয়। তাই সে বললঃ জানি বন্ধু, গৌড় ছেড়ে যাবার বড় নিদারুণ বেদনা। দুনিয়াতে গৌড়ের মত দ্বিতীয় নগরী আর নেই।

জালাল বললঃ গৌড়ের মানুষের মত দ্বিতীয় মানুষ আছে কিনা তাও জানি না।

রিহানের মনের মধ্যে আজ কি হয়েছিল কে জানে। তাই যে ধরনের কথা এখন বলা উচিত নয় তেমনি কথা সে বললঃ মানুষের আমরা কতটুকু জানি দোস্ত্। মানুষের কোন্‌টা যে আসল সত্তা, কোনটা যে নকল সত্তা, তাও জানা কষ্ট। তা কিছুটা নির্ভর করে পরিবেশের উপর। ভয়ঙ্কর সত্যের পরিবেশে হয়তো মানুষের সত্যরূপের দেখা মেলে। না হলে মানুষ জলের মত, তার কোন বিশেষ রূপ নেই। যে পাত্রে রাখ তেমনি রঙ। গৌড়ে যে মানুষ, সেই মানুষই বাইরে গিয়ে অন্যরকম হতে পারে। আবার এই গৌড়েরই যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাহলে আমরা এই গৌড়ের মানুষেরা ওই গৌড়ের মধ্যেই হযতো পাল্টে যায।

এ কথাটা যেন একটা সবুজ মনের কথা নয়, আবেগময় মনের স্বপ্নরঙিন কথা নয়। কিন্তু রিহান তো সেই জগতেরই ছিল! আজ তার এই হঠাৎ পরিবর্তন কেন? বুরহান অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকাল। রিহানের কথাগুলো জালালের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল সে-ই জানে। কেন যেন হঠাৎ সে একটু গম্ভীর হয়ে গলে। বললঃ হয়তো বা তাই সত্যি।

বুরহানের এ ভাবটা ভাল লাগল না—তাই সে বললঃ কিন্তু সে কথা আমাদের ক্ষেত্রে সত্য নয়। অমরা যা আছি তাই থাকব। যে কোন পরিবেশই আসুক আমরা অমরাই। আমরা তোমার জন্য অনুভব করব দোস্ত্। দুরে সেই ত্রিহুতে তোমার কথাই বারবার মনে করব। আশা করে পথ চেয়ে থাকব, তুমি কবে ফিরে আসবে বলে—যেমন অমরা রিহান আর চমনলালের জন্য পথ চেয়ে থাকি। কি বল চমন ভাই?

চমনলালও যেন নিজের মধ্যেই একটু আত্মস্থ আজ। তবু সে রিহানের চাইতে অনেকটা সপ্রতিভ। বললঃ সে তো নিশ্চয়ই। আর আমরা দূরে গিয়েও যেমন অনবরত গৌড়ের বন্ধুদের কথা ভেবেছি, জালালও নিশ্চয়ই তেমনি আমাদের কথা ভাববে। সেই ভাবনার মধ্যে যে অদৃশ্য একটি যোগসূত্র আছে—তা আমাদের প্রাণে প্রাণে সাড়া তুলবে। বন্ধুত্বই আমাদের সত্য পরিচয়। কোন পরিবেশের মধ্যেই এর আর পরিবর্তন হবে না।

বুরহান চমনলালের পিঠ চাপড়ে দিলঃ ভাল বলেছ দোস্ত্। এ দোস্তি অমর হোক্।

সে জালাল, রিহান, চমনলাল ও নিজের হাতটা একত্র করে বললঃ এই মিলন ছিল, আছে, থাকবে।

কী এক আত্মচিন্তায় একটু নিজের মধ্যে ছিল রিহান—এ ব্যবহারে তার মুখে হাসি ফুটল—অবশ্য স্মিত হাসি। সে বললঃ কিন্তু একজনের অভাব বড় বোধ করছি—আমাদের এই দোস্তি যে তার সঙ্গেও একসূত্রে গাঁথা। সে কোথায়? আমাদের কবি? ভূষণ খাঁ? বুরহান বললঃ সে নিশ্চয়ই এখুনি এসে পড়বে।

চমনলাল বলল ঃ তার দেরী করা উচিত হয়নি।

জালাল বললঃ না, ও শিল্পী, কবি। সাধারণ বিচারের মাপ-কাঠিতে ওকে ফেললে চলবে না। হয়তো কোন এক কল্পনার জগতে ও এতক্ষণ নিজেকে সপে দিয়েছে। কাল বিদায় সম্বর্দ্ধনায় গিয়ে আজ হয়তো বিদায়ের কথাটিই আর ওর মনে নেই। কিন্তু তাই বলে যে ও হৃদয়হীন, বন্ধুপ্রীতিহীন তা নয়। কোথাও এতটুকু খাদ নেই ওর। ওর মত যারা তাদের সবাই যখন বন্ধু তখন অকৃত্রিম, যখন দুঃখী তখন বেদনার ভারে ক্লান্ত, যখন সুখী ওদের মত সুখী আর নেই। ওদের সত্তা ঠিক সাধারণ মানুষের মত একই বৃত্তে ঘুরপাক খায় না। তাই হঠাৎ এমন পাল্টে যায় যে আমাদের কাছে তা অস্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু ওদের কাছে সবটাই স্বাভাবিক। যখন যে ভাব, সেটাই ওদের কাছে সত্য। এবং সে সত্য ওদের সত্তার সঙ্গে একীভূত। কিন্তু ওদের এই সত্যটুকু আমরা ধরতে পারি না বলে ভুল বুঝি। এই ভুল বোঝাব জন্য হয় ওরা খেয়ালী নয় তো পাগল বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

চমনলাল বললঃ কিন্তু আজ এমন কি হতে পারে যে হঠাৎ রাতারাতি ওর মনে অন্য জগতের দোলা লাগবে?

জালাল বললঃ ওদের কাছে কখন, কোন্ মুহূর্ত যে একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, বলা শক্ত। যে মুহূর্তের আমাদের কাছে কোন মূল্যই নেই হয়তো ওদের কাছে সেটা একটা বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

বুরহান বললঃ হতেও পারে, হয় তো কোন্ মঙ্গল কাব্যের দেবীস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে এতক্ষণ। যখন সেই দেবী-স্বপ্নমগ্ন ধ্যান ওর ভঙ্গ হবে, তখন হয় তো একটা সত্যিকারের অকৃত্রিম ব্যথায় জালালের জন্য ওর অন্তর কেঁদে উঠবে, কিন্তু জালাল তখন অনেক দূরে। আমি ভাবছি সত্যিই তাই কিনা।

জালাল বললঃ অসম্ভব নয়। তারপর হয়তো কাব্য শেষ হলে যখন আমার কথা মনে পড়বে —উৎসর্গ পত্রে তখন আমার উদ্দেশ্যেই প্রশংসার বাক্য ঝরে পড়বে।

রিহান বললঃ কিন্তু আমার মনে হয়...

সকলেই তার দিকে তাকালঃ কি?

—আমার মনে হয় গতকাল সন্ধ্যাবেলার সেই বিচিত্র পরিবেশেরই স্বপ্ন দেখছে সে এতক্ষণ।

বুরহান বললঃ হতে পারে। কাল ওর চোখের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করেছি। আসমানতারাকে দেখেই যেন কোন্ একটা স্বপ্নলোকে চলে গিয়েছিল সে।

জালাল বলল: হ্যাঁ, সেরকম একটু ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আর নর্তকীও সেটা ঠিক বুঝতে পেরেছিল।

বুরহান বলল: সত্যি আশ্চর্য—ঠিক মুখে মুখে বানিয়ে কেমন একটা কবিতাও বলেছিল।

রিহান বলল: তখন সে আত্মস্থ ছিল না। বোধ হয় নর্তকীময় হয়ে গিয়েছিল।

জালাল বলল: ঐটেই তো ওদের বড়গুণ—কামনার জিনিসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যাওয়া। যার ফলে সংবেদনশীল যে কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ওদের কাছে ধরা না দিয়ে পারে না। আসমানতারা বাঈজী হয়েও ধরা দিতে বাধ্য হল তো!

সকলেই একটু আশ্চর্য হয়ে জালালের দিকে তাকাল। তবে কি জানি কেন চমনলালের মধ্যে বিশেষ একটা লক্ষ্য করবার মত চমক দেখা গেল।

জালাল বলল: হীরে জহরৎ যতটা না হাসি ফুটাতে পেরেছে তার চেয়ে বেশী হাসি ফুটিয়েছে ওর মুখে ভূষণের দুটো শ্লোক।

কী জানি কেন চমনলাল একটু প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলে উঠল: ওটা অবজ্ঞার হাসি।

বুরহান তাকালে চমনলালের দিকে: কিন্তু দোস্ত্ তা হলে বিদায়বেলা নিমন্ত্রণটা শুধু ওকেই কবল কেন বাঈজী?

চমনলাল বলল: একটা বোকাকে কেমন করে খেলানো যায় তাই দেখার জন্য।

ঠিক যেন বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়ে কথাটি বলা হয়নি।একটু ব্যাথিত হল আর সকলে।

রিহান বলল: না চমনলাল কথাটা এভাবে বলা তোমার উচিত হয়নি। হাজার হোক ও আমাদের বন্ধু।

জালাল বলল: আর প্রকৃতপক্ষে ও বোকা নয়, সরল।

চমনলাল বলল: সরলতা আর বোকামী একই জিনিস। ওতেই ঠকতে হয়।

জালাল বলল: ঠিক। কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না চমন ভাই। ঠকা-জেতার চরিত্র সবার কাছে সমান নয়। আমরা যাতে মনে করি ঠকেছি ওরা হয়তো তার মধ্যে ছলনার গন্ধই খুঁজে পায় না। আর তা ছাড়া ওদের হৃদয়ের এমন একটা স্পষ্ট সততা আছে যে তা জানবার পর ওদের সহজে ঠকানো চলে না। তুমিই কি ভূষণকে ঠকাতে পেরেছ? আমিই কি পেরেছি?

চমনলাল বলল: অমরা ওর বন্ধু তাই।

জালাল বলল: একটা প্রশ্ন করব চমনলাল?

আবার যেন কেমন একটা চমক খেল চমনলাল। কেন সে-ই জানে। কিন্তু যথাসম্ভব নিজেকে আবার সে স্বাভাবিক করে এনে বলল: বল?

জালাল বলল: ভূষণ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, আমাদের সঙ্গে মেশবার তার নিশ্চয়ই কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তবু সে কি করে মিশলো, আমরাই বা কেন নিলুম?

চমনলাল জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাল জালালের দিকে।

জালাল বলল: ওর মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে, যা ওর দারিদ্রকে ঢেকে দিয়েছে; ওকে শ্রেণীর ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। ও তাই সকল শ্রেণীর। ওর সে গুণটি হল শিল্পপ্রসাদ।

ওর সারল্যও হল সেই শিল্পগুণের একটি অঙ্গ। তাই আমরা ওকে গ্রহণ করেছি, অবজ্ঞাও করিনি, ঠকাতেও পারিনি।

চমনলাল বললঃ কিন্তু তবু ওর আসা উচিত ছিল।

রিহান বললঃ তোমার যাবার সময়, সত্যি তার না আসাটা চমনলালের বেজেছে।

জালাল বললঃ কিন্তু এ কথাটা ভুললে চলবে না যে ও আমাদের চার জনের অত্যন্ত নিকট হলেও, চারজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। যে মুহূর্তে সে আমাদের কাছে রয়েছে, সে মুহূর্তে সে অন্যত্রও আছে। আমার বিশেষ অনুরোধ তোমরা তাকে যেন ভুল বুঝোনা।

রিহান জালালের কাঁধ চাপড়ে বললঃ তুমি পাগল হয়েছ! ওর সম্পর্কে আমাদের মনে করবার কিছু নেই। নিশ্চয়ই এতক্ষণ ও স্বপ্নলোকে বিচরণ করছে। সত্যি বলতে কি, কাল সন্ধ্যায় বুরহানের নর্তকীটি এমন এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল যে, আজ সকাল পর্যন্তও তার রেশ সম্পূর্ণ আমার মধ্য থেকে যায়নি। তাই আসবার সময় চমনলালকেও খোঁজ করে আসতে ভুলে গিয়েছি আমি। যাক, কোন কসুর হয়নি, কারণ চমনলাল আগেই এসেছে।

রিহান বলল ঃ হ্যাঁ, তোমাকে ফেলে চমনলালকে একা আসতে দেখে আমিও একটু অবাক হয়েছিলুম।

জালাল একটু দুষ্টু রকমেব হাসি হেসে বলল ঃ 'হযতো চমনলালও কাল আসরের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি।' কথাটা বলে সে চমনলালের মুখের দিকে তাকাল।

বসন্তের ক্ষতে বিক্ষত চমনলালের মুখ। রংটাও ফর্সা নয়। সুতরাং কখনো কোন আবেগের মুহূর্তে তার সেই মুখমণ্ডলের ত্বকেব আড়ালে রক্তের আনাগোনা চললে—তা সহজে বুঝবার উপায় নেই। কারণ রক্তিমাভা সহজে ধবা যায না। তবে তার মুখটা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল। একটু লক্ষ্য করলেই সে পরিবর্তনটা বেশ ধরা যায। কিন্তু পরিবর্তনটা কোন্ চরিত্রের তা ধরা যায না—কারণ মুখের আকৃতিখানা আরো বীভৎস হয়ে ওঠে। বসন্তের ক্ষতের জন্যই যে এরকম হয়েছে সে বিষযে সন্দেহ নেই। তবে তার নিকটতম বন্ধুরা সেই বিকৃত মুখের মধ্যেও আবেগের যথার্থতা ঠিক ধরতে পারে।

রিহানের মনে যদিও বা কোন দুর্বলতা আজ সকালবেলা পর্যন্ত ছিল আবার বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্যে এসে তার সেই দুর্বলতা কেটে গিয়েছে। সে চমনলালের মুখের দিকে তাকাল। বলল ঃ কি গো চমনভাই তাহলে নর্তকীর হাত এড়াতে পারলে না আর ? হ্যাঁ, এ গুজরাটের দুলারীবাঈয়ের চেয়ে অনেক সুন্দরী, একথা স্বীকার করতেই হবে।

চমনলালের বুকের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের দুর্বলতা এসে থাকবে। আর একবার যেন তার মুখে সেই বীভৎস ভাবখানা ফুটে উঠল। কিন্তু যথাসম্ভব সে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করে বলল ঃ আসমানতারা সুন্দরী হতে পারে, কিন্তু দুলারীবাঈয়ের চেয়ে সুন্দরী নিশ্চয়ই নয়।

রিহান বলল ঃ কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে ঢের সুন্দরী।

জালাল রিহানের দিকে তাকিয়ে বললঃ দেখ দোস্ত (সৌন্দর্য্যটা একটা অন্তরের জিনিস। সবটাই বাইরের উপর নির্ভর করে না। সৌন্দর্য্য যার চোখে ধরা দেয়—তার মন থেকে গড়া সৌন্দর্য্য সেখানে অনেকটা থাকে। তাই সৌন্দর্য্যের তারতম্য ভিন্ন চোখে ভিন্ন রকম।) দুলারীবাঈকে দেখিনি, কিন্তু দেখলেও তার সৌন্দর্য্য আমাদের চোখ দিয়ে বিচার করলে নিশ্চয়ই চমনের সৌন্দর্য্য বিচারের সঙ্গে এক হতে পারত না। বলেছি তো, ব্যাপারটা অনেকটা ব্যক্তিমনের উপর নির্ভর করে। তা না হলে বল—তুমিই কি কারুকউন্নিসাকে ত্যাগ করে চলে আসতে পারতে?

রিহান বললঃ তা ঠিক। আর চমনও নিশ্চয়ই দুলারীবাঈকে গুজরাটে ফেলে রেখে আসত না। টাকার ওর তো অভাব নেই। তাই মনে হয়—সৌন্দর্য্য কিছুটা দর্শকের মনের ব্যাপার তো বটেই। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য সৌন্দর্য্যের যিনি আধার তারও মনের কিছুটা রয়েছে সেখানে (হৃদয় আর মনও কিছুটা সৌন্দর্য্যের রূপবর্দ্ধন করে। বোধহয় সেটাকে ঠিক ধরা যায়না, স্পষ্ট দেখাও যায় না—আবার কিছুটা ধরাও যায়, দেখাও যায়।)

বুরহাম বললঃ একথাটা স্বীকার করতেই হবে। আমি অনেক সময় দেখেছি মাপ কাঠির বিচারে দৈহিক সৌন্দর্য্যের অনেকটা অভাব লক্ষ্য করা গেলেও—তবু অনেককে সুন্দর মনে হয়। হুসেন খাঁর কন্যা গোলাপ বানুকে তেমনি মনে হয়েছিল আমার। তার কারণটা কি জান?

সকলেই বুরহানের মুখের দিকে তাকাল।

বুরহান বললঃ তার কারণ চোখ (মানুষের চোখ দুটোই বুঝি তার সৌন্দর্য্যের সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। এই কারণে যে—চোখ হোল মনের দর্পণ। মানুষের মনের ভাবটা চোখের মধ্যেই ফুটে উঠে।)

রিহান বললঃ সত্যি বলেছ দোস্ত। ঠিক একই কারণে ভূষণ আমাদের আকর্ষণ করেছে। ওর চোখ দুটিই যেন ওকে অসাধারণত্ব দিয়েছে। বোধহয় নর্তকী কাল ওর চোখ দুটি দেখেই আকর্ষণ অনুভব করেছিল।

আবার চমনলালের মুখে কি বীভৎস ভাবটা [illegible] কে জানে? সে বললঃ কিন্তু আমার তা মনে হয়না। নর্তকী আর বাঈজীরা [illegible] কৃষ্ট হয় তা হোল সোনার চোখ!

বুরহান চমনলালের মুখের দিকে তাকালঃ মানে?

—মানে—তঙ্কা। বুঝলে বন্ধু সোনার মোহর।

সকলেই হেসে উঠল।

রিহান বললঃ দুলরীবাঈ বুঝি সেই সোনার চোখ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল?

চমনলাল জোর দিয়ে বললঃ নিশ্চয়ই। তোমার এই আসমানতারাও মুগ্ধ হবে।

জালাল বললঃ আমার কিন্তু তা মনে হয় না চমন। কাল ওর গান শুনেই সে কথা মনে হয়েছে।

চমনলাল বললঃ বেশ আমি বাজি রাখছি। আমি যে কোন দিন আসমানতারাকে নিয়ে আসতে পারি।

জালাল হেসে বলল : কিন্তু দোস্ত্ আমি যে এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। বাজি রাখলেও ফলাফল জানতে পারব না।

রিহান বলল : যাক বাজি রেখে দরকার নেই। আর বাজি রেখে চমনলাল জিততেও পারবে না—এই কারণে যে, ওর মনটা বাঁধা আছে ভাবির কাছে। নইলে দুলারীবাঈ আজ গৌড়ে থাকত। যে কারণে সোনার চোখ দুলারীবাঈকে আনতে পারেনি—সেই কারণেই আসমানতারাও আসমানেই থাকবে। চমনের ঘরে নিশ্চয়ই নেমে আসবে না।

এর মধ্যে চমনের প্রতি একটু প্রশংসা রয়েছে। তাই তার মুখের মধ্যে এবার আর কোন বীভৎস ভাব ফুটে উঠল না।

জালাল চমনকে জড়িয়ে ধরল : হ্যাঁ ভাই তাই ভাল। ভাবির আমার জয় হোক, বাজি আমি হেরেই গেলাম।

হঠাৎ এমন সময় বাইরে সুলতান-বাহিনীর দামামা বেজে উঠল। উচ্চনিনাদে কে সিঙ্গা ফুঁকল। সকলেই একটু চমকিত হল। জালাল চমনকে ছেড়ে দিয়ে নহবৎখানার দরওয়াজা দিয়ে বাইরে তাকাল। সকলেই তাকাল। দেখল : সেনাবাহিনী যাত্রা আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। পতাকা ধরে দুইপাশে অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত। হাতীর পিঠে সিপাহশালার চেপেছেন। তাই এই বাদ্যসঙ্কেত। বাহিনী রওনা হবে। জালালকেও যেতে হবে। একটা বিষণ্ণতা তৎক্ষণাৎ তার মুখের উপর নেমে এল। সকল বন্ধুরাও মুহূর্তে বিমর্ষ হল।

জালাল একে একে সকলকে আলিঙ্গন করল। তার হাতীর উপর তার বেগম আর পরিবারের অন্যান্যেরা চেপেছে। সে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। সালাম।

সবাই সমবেত ভাবে বিদায় জানাল তাকে আলেকম আস্‌-সালাম! জালাল এগিয়ে গেল। নহবৎখানার চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল বন্ধুরা। সে গিয়ে হাতীতে উঠল। ওরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। শেষ সিঙ্গা বেজে উঠল। বাহিনী রওনা হোল। হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওরা। বাহিনী চলতে লাগল। দু'ধারে বৃক্ষসারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল তারা। যতক্ষণ দেখা যায় তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে দেখল।

চার

"I can give not what men call love,
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not!"

—*P.B. Shelley*

একটা বিষণ্ণ ভাব নিয়ে সবাই ফিরে গেল। রিহান আর বুরহান যেন নিতান্তই ভেঙ্গে পড়েছিল। জালালের বিশেষ একটি গুণ ছিল—যা সবার মনকেই কেড়ে নিতে পারত। সে ধীর, স্থির, বিবেচক। সে হৃদয়বান। কোন বিপদে উদ্বেগাক্রান্ত হতে তাকে কোনদিন দেখা যায়নি। কোন উচ্ছ্বাসে আবেগপ্রবণও হয়ে ওঠেনি। কোন আক্রোশে উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়নি তার মধ্যে। চতুর্দিকে যে পরিবেশে, চতুর্দিকে মানুষের যে চরিত্র তাতে এ যুগে এমনটি হওয়া সম্ভব নয়। তবু সে হয়েছে। কোন এক তুর্কী বংশেরই সন্তান জালাল। কিন্তু চরিত্রের মধ্যে তুর্কী ঔদ্ধত্য এতটুকু নেই। তার মধ্যে অধিকাংশই বাঙালীর স্বভাব। হয়তো বাংলার পরিবেশে মানুষ হবার জন্যই এমন হয়েছে। হওয়া বিচিত্র নয়, গৌড়ে বাস করে সমস্ত মুসলমানই আজ এদেশীয়। সবাই বাঙালী। তাই বাংলার ভাষা, বাংলার চরিত্র তারা সবাই গ্রহণ করেছে মায় সুলতান পর্যন্ত। বাংলার একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যেন ধীরে ধীরে এদের আমলেই ফুটে উঠছে। যে কালে অন্যত্র তুর্কীরা আজো মাতৃভাষার চর্চা করে, আচারে বিচারে সেই প্রাচীন নীতিই শেখে, সে কালে বাংলার ক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ নতুন অবস্থা। এদের ভাষা বাংলা, দৃষ্টি বাংলা, জীবন বাংলার। এই বাঙালীত্ব এরা অর্জন করতে পেরেছে বলেই ধর্মের সীমানাকে অতিক্রম করে বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতির মিলন সম্ভব হয়েছে। তাই চমনলাল আজ জালালের বিদায়ে তাকে এগিয়ে দিতে আসে। আর ব্রাহ্মণ যুবক ভূষণ যাঁর জন্য জালালের সমবেদনার অভাব থাকে না। এটা বাংলার মুসলমানদেরই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। জালালও সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কিন্তু অন্য সবাই সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও মাঝে মাঝে নিজেদের রক্তের মধ্যে সেই তুর্কী-আবেগ অনুভব করে কখনও কখনও একটু অন্যরকম হয়ে যায়। তখন তাদের দেখে সেই দুর্দ্ধর্ষ জাতির কথাই মনে পড়ে। কিন্তু জালালের মধ্যে তুর্কী-স্বভাবের এতটুকু এ পর্যন্ত কেউ লক্ষ্য করেনি। তার চালচলন ব্যবহারে তাকে বরং মনে হয় ভারতীয় অরণ্যের উত্তরাধিকার রয়েছে তার মধ্যে, মধ্যএশিয় উদ্দাম অন্ধ যৌবনাবেগ নয়। সেই কারণে জালাল সবার প্রিয়। গৌড়ে তার উপস্থিতি একদল যুবকের মধ্যে একটা ঐক্যের ভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কোনদিন কারো মধ্যে মুহূর্তের ভুলেও একটাও মনোমালিন্যের আভাস লক্ষ্য করা যায়নি। একটা বিরাট সমন্বয়ের কেন্দ্র ছিল সে। যেন একটা জীবন্ত ভালবাসার উৎস। সে আজ চলে যাচ্ছে, সবাই তাই বিষণ্ন। প্রত্যেকেরই যেন মনে হল, সে এখন বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত, একক। বিষণ্ন মনে যে যার

ঘরে ফিরল প্রায় একা একাই। সাধারণত এক জায়গায় জড় হলেই এদের মধ্যে যে একটা যৌবনের আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, একটা ঐক্যবদ্ধ উত্তেজনা ফুটে উঠে আজ আর সেটা ফুটে উঠল না। যেন বিষাদের ভারে একক, বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড হয়ে যে যার ঘরে ফিরল। এক এক খণ্ড মৌন নীরবতাকে এক্কা গাড়ীগুলি বহন করে নিয়ে চলল। চমনলালও নীরবে এগুল। কিন্তু তার নীরবতাটা যে কোন্ কারণে তা বোঝা গেল না। কারণ প্রথম থেকেই সে আজ একটু আত্মস্থ ছিল। যদিও দু'একবার ভূষণ খাঁ প্রসঙ্গে তার মুখমণ্ডলের মধ্যে একটা বীভৎস ভাব ফুটে উঠেছিল, তা বেশীক্ষণ থাকেনি। তর্কে প্রবৃত্ত হতে হতে আবার চুপ করে গেছে। আবার যেন মনের মধ্যে ডুব দেবার চেষ্টা করেছে। তার গাড়ীও সকলের সঙ্গে এগুচ্ছিল হঠাৎ সে গাডোয়ানকে থামাল—এই রোখ। চল্‌তি গাড়ীটাকে হঠাৎ থামিয়ে দিল গাড়োয়ান। সমস্ত গাড়ীটা লাফিয়ে উঠে যেন একটা দোল্ খেল। গাডোযান ফিরে তাকাল চমনলালের মুখেব দিকে। চমনলাল বলল ঃ পশ্চিম গড়ের দিকে চল।

অন্যান্য গাডীগুলো তখন এগিযে গেছে। কেউ সেটা আব লক্ষ্য করল না। লক্ষ্য করবার মত অবস্থাও নেই কারোর। চমনলালের গাডী দিক ফিরিয়ে পশ্চিম দিকে চলল।

গাডী পশ্চিম দিকে কেন চলল গাডোযান জানল না। কিন্তু চমনলাল জানলো। তার এই গতি পরিবর্তনটা যদি তাব বন্ধুরাও কেউ দেখত তারা বুঝতে পারতো। কাল নৃত্যের আসর শেযে বাঈজী ভূষণ খাঁকে ঠিকানা দিযেছিল। আসমানতারা পশ্চিম গডের দিকে থাকে। এতক্ষণ বোধ হয় চমনলালের মধ্যে তাহলে পশ্চিম গডের এক অদেখা গৃহের কল্পনাই চল্‌ছিল। তাব আত্মস্থ্ ভাবেব মূল কারণ বুঝি তাহলে ছিল আসমানতারা। চমনলাল তাকে ভুলতে পারেনি।

কিন্তু গুজরাটের সমুদ্রতীরে দুলারীবাঈকে যে হেলায ছেড়ে আসতে পারল, গৌডে এসে সে কি তা পারবে না? সত্যি একটু আশ্চর্যই লাগে। যে পদ্মাবতী দূরে থেকেও চমনলালকে রূপের আকর্ষণ থেকে রক্ষা করেছে—কাছে থেকেও সে কি আজ তাকে ধরে রাখতে পারবে না? এটা একটা রহস্যই। মানুষের প্রকৃত মূল্য কি তবে কাছে থেকে বোঝা যায় না? হয় তো তাই। কোন জিনিসের মূল্য তার অভাব না হলে বোঝা যায না। বিশ্ব জুডে যদি শুধু ছায়াই থাকতো তাহলে রৌদ্র-দগ্ধ পথিক কখনো বৃক্ষের আড়ালের মূল্য বুঝতো না।

চমনলাল আজ বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে বলে তার মূল্য দিতে পারছে না। তাই বুঝি সে রৌদ্রের দিকে ছুলে চলেছে।

চমনের এক্কা বেশ কিছুক্ষণ ছুটবার পর পশ্চিম গড়ে এসে উপস্থিত হল। বেশ সময় লাগল তার। ঘোড়াগুলি ঘেমে উঠেছে। গাড়োয়ানও ক্লান্ত। গৌড়ের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ কোনটাই কম নয়। পশ্চিমে মাটির বাঁধের মত বিরাট দেয়াল চোখে পড়লে গাড়োয়ান চমনলালকে জিজ্ঞেস করল ঃ শেঠজী আপনি কোথায় যাবেন?

গভীর আগ্রহে পশ্চিমে মাটির দেয়ালটি দেখবার জন্য চমনলালও অপেক্ষা করছিল। পশ্চিমগড় চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেও চমকে উঠল। তার বুকটা একটু দুলেও উঠল

যেন। গাড়োয়ানের প্রশ্ন শুনে এতক্ষণে তাব বাস্তববোধ ফিরে এল—হ্যাঁ, কোথায় যাবে সে! আসমানতারার কাছে সে যে যাবে সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কোথায় থাকে?

চমনলাল গাড়োয়ানকে বলল ঃ আসমানতারাকে চেন তুমি?

গাডোয়ান যে স্তরের লোক তাতে আসমানতাবা তার কাছে আসমানের তারার মতই। বাঈজী নর্তকী তাদেরও আছে বটে, তবে সে নিতান্তই মর্তের ব্যাপার। সেখানে আসমানতারা নেই। আসমানতারাকে তারা স্বপ্নেও দেখেনি, জানেও না। তাই সে বলল ঃ সে কে শেঠজী?

অবাক হয়ে যেন চমনলাল তার দিকে তাকাল ঃ কেন তুমি তাকে চেন না? আসমানতারাকে কেউ চেনে না এটা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারল না। এ রূপ লক্ষের মধ্যে চললেও চোখে পডবার মত। অথচ গৌড়-নিবাসিনী হয়েও আসমানতারা অজ্ঞাত থাকতে পা^ এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। আকাশে নক্ষত্রের মেলা বসলেও চন্দ্রকে সবারই চোখে পড়ে। আসমানতারাকে ওদের চোখে পডেনি!

চমনলালকে চুপ্ করে থাকতে দেখে গাডোয়ান আবার জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাব শেঠজী? সে কে?

চমনলাল আবার জোর দিয়ে নামটি উচ্চারণ করল ঃ আসমানতারা, আসমানতারা বাঈজী।

—তাহলে বাঈজী পাডাতে যাব?

—সেকি সেখানেই থাকে?

গাড়োযান বলল ঃ তা বলতে পারব না বাবুজী, আমি তাকে চিনি না।

চমনলাল বলল ঃ বেশ তবে ওখানেই চল।

চমনলাল ভাবল ঃ আসমানতারা খাস বাঈজী, বাঈজী পাড়াতেই সে থেকে থাকবে। সেখানে গেলে নিশ্চযই তার খোঁজ পাওযা যাবে। একখণ্ড উজ্জ্বল হীরের টুক্‌রো যত অন্ধকারেই সে থাক, চোখে পডবেই। তার সে আলোর দীপ্তি আডালে লুকিয়ে থাকবার নয়। বাঈজীরা নিশ্চযই তাকে চেনে।

গাডোয়ান বাঈজী পাড়ার সঙ্গে পরিচিত—কারণ অনেক সময়ই তার গাড়ীতে মহাজনেরা এদিকে এসে থাকেন। বিশেষ কোন বাঈজীর সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তবে ফুলবাঈয়ের ঘরটি সে চেনে। সামসুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে সে অনেকবার সেখানে এসেছে—অবশ্য গাড়োযান হিসাবেই। দু'একবার ফুলবাঈকে দেখবার সৌভাগ্যও হয়েছে তার। সে বাড়ীটি তার চেনা। গাড়োয়ান তাই বরাবর ফুলবাঈয়ের ঘরের দিকেই চলল। কিছুকাল এগুবার পরই সে একটি সুন্দর গৃহের সামনে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ এক্কা গাড়ীটা থেমে গেল। চমনলালের দিকে তাকিয়ে সে বলল ঃ শেঠজী এসে গেছি।

—কোথায়?

—বাঈজী পাড়ায়

—এটা কি আসমানতারার বাড়ী?

—না শেঠজী।

—তবে?

—ফুলবাঈজীর ঘর শেঠজী।

—সে কে?

—নাচনেওয়ালী।

ওবা যখন সেখানে এসে থেমেছিল তখুনি ফুলবাঈয়ের দারোয়ানের নজরে পডেছিল। কোন মালিক মনে করে সে দৌড়ে ছুটে গেল গাড়ীব কাছে। গিয়ে সালাম ঠুকে দাঁড়ালো চমনলালকে ঃ আসুন শেঠজী।

চমনলাল জিজ্ঞেস কবল ঃ এ কার ঘর?

—ফুলবাঈয়ের।

—কিন্তু আসমানতারা কোথায থাকে বলতে পাব?

—জানিনা শেঠজী।

চমনলাল জিজ্ঞেস কবল ঃ তোমার মালিকানকে একবাব জিজ্ঞেস করে এসোনা, তিনি জানতে পারেন।

দারোযান বলল ঃ না শেঠজী, তাকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। তার অপমান হবে। তেমন জিজ্ঞেস করা রেওযাজ নেই।

একটা গাড়ী এসে দুয়ারে দাঁড়িয়েছে। দারোযান তাব সঙ্গে কথা বলছে ফুলবাঈও সেটা লক্ষ্য করেছিল। নিশ্চযই কোন নতুন অতিথি— নইলে বাইরে দাঁড়িযে গল্প করতো না সে, বরাবব ভেতবে ঢুকে পডতো। তাই সে কৌতূহলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। দারোযানকে সে জিজ্ঞেস করল ঃ কে রে?

—এক শেঠজী মালিকান।

—কি বলছে?

দারোযানকে আর উত্তর দিতে হল না। চমনলাল নিজেই এক্কা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল—আচ্ছা আসমানতারা কোথায় থাকে বলতে পার?

ফুলবাঈয়ের মুখে একটু হাসি ফুটল। তার নিজের ঘরে এসে অন্য কারো নাম জিজ্ঞেস করা যে বিধিবহির্ভূত লোকটা জানে না। কিন্তু এটা তার পক্ষে অপমানকর। তাই সে একটু কটাক্ষ না করে পারল না ঃ আসমানতারাকে মাটিতে খোঁজ করলে কি পাওয়া যাবে? আসমানে যান। বলেই সে ভেতরে চলে গেল।

চমনলাল একটু আহত হল। বুঝল এখানে তার কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না। সে গাড়োয়ানকে বলল, গাড়ী চালাও।

—কোথায় শেঠজী?

—আর কোন বাঈজী তোমার জানা আছে?

—আছে বাবুজী।

—কে?

—মেহের বিবি।

—চল।

গাড়োয়ান তৎক্ষণাৎ গাড়ী এগিয়ে নিয়ে চলল মেহের বিবির আস্তানার দিকে। আরো কয়েক মিনিট চলবার পর আরো একটি সুন্দর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো গাড়ী। গাড়োয়ান চমনলালকে ডেকে বললঃ

—শেঠজী এই মেহের বিবির বাড়ী।

চমনলাল বললঃ দেখ কে আছে?

দারোয়ানকে হাতের ইশারাতে ডাকল গাড়োয়ান। মুসলমান বিবি হলে কি হবে তার দারোয়ানটি রাজপুত। সে বসে বসে হাতে একরকমের পাতা টিপছিল। চুন আর তামাক পাতা। ওরা তরল পদার্থ তত পান করে না, কিন্তু নেশার জন্য এটুকুর প্রয়োজন। ঠিক মৌজের সময় হঠাৎ বুঝি তার রসভঙ্গ করল গাড়োয়ান। লোকটা সেই প্রস্তুত-নেশার গুড়ো নিম্নোষ্ঠ ফাঁক করে তার মধ্যে গলিয়ে দিল—তারপর একটা আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল। গাড়োয়ানের কাছে এগিয়ে এল সেঃ কি চাই?

—মেহের বিবি আছেন?

দারোয়ানের চোখে একটু দুষ্টুহাসির ছটা ফুটলঃ হ্যাঁ আছেন।

—শেঠজী দেখা করবেন।

দারোয়ান বললঃ কিন্তু মালিকান এখন নতুন মালিক নিয়ে আছেন, দেখা হবে না। আবার সে গিয়ে বারান্দায় বসল।

চমনলাল গাড়োয়ানকে বললঃ জিজ্ঞেস কর তো ওকে, ও আসমানতারাকে চেনে কিনা?

গাড়োয়ান তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলঃ এই সেপাইজী, আসমান বাঈজীর ঠিকানা জান?

দারোয়ান মুখের ভঙ্গীটা একটু বিকৃত করলঃ আসমান বাঈজী! না, না, চিনি না।

চমনলাল বললঃ গাড়ী ফেরাও, অন্যত্র চল।

গড়োয়ান গাড়ী ফেরালো।

হঠাৎ দারোয়ানটা উচ্চশব্দে পেছনে কি মনে করে হেসে উঠল যেন। সে হাসির শব্দ চমনলালের কানে গেল। একটু আঘাত পেল সে। কিন্তু আসমানতারাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

এক্কা গাড়ীর ঘোড়াটা ঘেমে উঠেছে। গাড়োয়ানও ক্লান্ত। সে বোধহয় মনে মনে একটু বিরক্ত হল। সামনে আর একটা বাড়ী দেখল—বাঈজী বাড়ীর মত। বললঃ শেঠজী এখানে থামবেন?

—কোথায়?

—বাঈজী বাড়ী।

—কে?

—নাম জানিনা, তবে জিজ্ঞেস করতে পারি? যাব?

—দেখ।

গাড়োয়ান প্রবেশপথে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলঃ কার ঘরগো ?

—আসমান বিবি ?

শোনামাত্র চমনলালের বুকখানা যেন কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে এল—এটা আসমানতারার ঘর ?

দারোয়ান বললঃ আসমানতারা নয়, বিবি।

—ঐ একই। তোমার মালিকানকে একবার খবর দাও।

—কি বলব ?

—বলবে শেঠ চমনলালজী এসেছেন।

দারোয়ান চমনলালকে সালাম জানালঃ আসুন জনাব, বৈঠকখানায় বসবেন। আমি মালিকানকে খবর দিচ্ছি।

চমনলাল বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। দারোয়ান ভেতরে বাঁদীকে সংবাদ দিল মালিকানকে জানাবার জন্য।

চমনলাল বৈঠকখানার সজ্জার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল—পরিষ্কার, পরিছন্ন, রংয়ে রেখায় অপুর্ব। মনে মনে ভাবল, আসমানতারা ছাড়া এমন রুচি সম্ভব! মনের মধ্যে একটা অপূর্ব দোলা নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল আবার তার সঙ্গে দেখা হবে বলে।

কিন্তু হঠাৎ যেন তার বুকটাকে চমকে দিয়ে ওধারে মিহি পর্দার আড়াল থেকে নারীকণ্ঠে কে কথা বলে উঠলঃ শেঠজী আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

চমনলাল একটু আশ্চর্য হলঃ সেকি! আসমানতারা তাকে ভুলে গেল নাকি ? কাল তার মহামূল্যবান কর্ণভূষণ দুটি সে তাকে উপহার দিয়েছে। তার মূল্য এক লক্ষ টাকা। সেই কর্ণভূষণের কথা ভুলে যাবে আসমান!

চমনলাল বাঁদীকে বললঃ যাও, বিবিকে বল যিনি কাল বুরহানের নর্তকীমহলে তাকে কর্ণভূষণ দিয়েছিলেন আমি সেই শেঠ চমনলাল।

—জী জনাব। বাঁদী আবার চলে গেল। কিন্তু কিছুকাল পরেই ফিরে এসে জানালঃ মালিকান কিছু বুঝতে পারলেন না।

অবাক হল একটু চমনলালঃ সেকি! তাহলে জালালের কথাই কি সত্য, এ বিবি তেমন বিবি নয়! সোনার চোখে ভুলবে না সে! আরো জেদ চেপে গেল তার। সে বললঃ ঠিক আছে, চেনার প্রয়োজন নেই—বল আমি তার সাঙ্গে দেখা করতে চাই।

বাঁদী আবার চলে গেল। তৎক্ষণাৎ ফিরে এল।

চমনলাল আগ্রহে তার দিকে তাকালঃ কি ?

বাঁদী বললঃ মালিকান জিজ্ঞেস্ করলেন, আপনি কি তুর্কী ? তিনি তুর্কী আমীর ভিন্ন অন্য কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

চমনলাল যেন আকাশ থেকে বললঃ সেকি!

বাঁদী বললঃ সবে তিনি তুরাণ থেকে এসেছেন। তুর্কী ভাষা ছাড়া কিছু বোঝেন না বলে এই ব্যবস্থা করেছেন।

চমনলাল যেন আরো অবাক হলঃ কী বলছ সে যে বাঙালা জানে! কাল দিব্যি বাঙলা পদ গেয়ে এল!

বাঁদী বললঃ তাহলে অন্য কোন বিবি হবেন, আমাদের মালিকান নন। আপনি আসতে পারেন।

চমনলাল তবু যেন তার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। মনে হল এই সেই আসমানতারা! কিন্তু এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। সে রহস্য বোধহয় তার অন্য বন্ধুরা জানে—তাই 'সোনার চোখকে' তারা তত আমল দিতে চাযনি। কিন্তু বাঈজীর কাছে সোনার চোখের মূল্য অনেক। অর্থে বশীভূত হবে না এমন বাঈজী নেই। নইলে এ পথে তারা পা বাড়াতে পারত না। তবে আসমানতারা এমন রকছে কেন? এটা কি একটা কৌশল? দর বাড়াতে চায় বুঝি?

সে তাই বাঁদীকে বললঃ শোন, আমি শেঠ চমনলাল। অর্থের আমার অভাব নেই। তোমাদের বাঈজী কত টাকা হলে দেখা করবেন বল। আমি তাব যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়েই দেখা করব।

বাঁদী আবার বলল ঃ এক হাজাব কেন, যদি বাঙলার সুলতানীও দেন তবু তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না।

চমনলাল তবু যেন কি বলতে যাচ্ছিলঃ শোন...

এবার বাঁদী একটু উত্তেজিত হল। বললঃ আমি তবে দারোযানকে ডাকতে বাধ্য হব। দুপুর বেলা মালিকানের বিশ্রামের সময়, আপনি আর বিরক্ত কববেন না।

কথাটা শুনে আকর্ণ একটা উত্তাপ অনুভব করল চমনলাল। বোধহয় তপ্ত রক্তে মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়ালো। অপমানে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল। আর বিলম্ব না করে বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান গাড়ীতে উঠল।

সে যে ভাবে বাইরে এল—তা দেখে গাড়োয়ানের বুঝতে বাকী রইল না যে—সে ভাবটা প্রাপ্তিসুখজনিত নয়। কিন্তু তার বলবাব কিছু নেই। কিছুকাল সে অপেক্ষা করল, চমনলাল কিছু বলবে কিনা তাই শুনবার জন্য। কারণ, যেতে হবে। এবার শেঠজী কোথায় যাবেন তিনিই জানেন। কিন্তু চমনলাল কিছু বলল না। একটা চাপা আক্রোশে নিজের মধ্যে হাঁপাতে লাগল সে। অগত্যা বাধ্য হয়ে গাড়োয়ানই জিজ্ঞেস করলঃ কোথায় যাবেন শেঠজী?

—চল।

—কোথায়?

একটু যেন উত্তেজিত হয়েই চমনলাল বললঃ যে দিকে খুসি।

—নতুন কোন বাঈজীর কাছে যাব?

—চল।

আবার অশ্বপৃষ্টে চাবুক কষল গাড়োয়ান।

উত্তেজনাটা কাটিয়ে উঠবার জন্য একটা অর্থহীন দৃষ্টিতে চমনলাল বাইরে তাকিয়ে থাকল। ধীরে ধীরে এক্কা গাড়ী এগুতে লাগল। হঠাৎ এমন সময় একটা আশ্চর্য্য জিনিস

চোখে পড়ল চমনলালের। একটা গাড়ী বিপরীত দিক থেকে আসছিল। সেই গাড়ী তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। সেই গাড়ীর মধ্যে এক আরোহিণী। একটা বোর্‌খা তার গায়ে চাপানো আছে বটে—কিন্তু তার মুখখানা অনাবৃত। গাড়ীর দরজার ফাঁকে সে বাইরে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সেই গাড়ীখানা পাশ দিয়ে যাবার সময় চমনলালের চোখে যেন একরশ্মি আলোক নিক্ষেপ করে গেল। একি! কে! চমকে উঠল চমনলাল। কিন্তু সে কিছু ভাববার আগেই গাড়ীখানি তার একা অতিক্রম করে দ্রুত বিপরীত দিকে চলে গেল। চমনলালের একাও এগিয়ে যাচ্ছিল—ফলে মুহূর্তের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যবধান হয়ে গেল। কিন্তু চমনলাল তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে।

চেঁচিয়ে সে গাড়োয়ানকে ডাকল—এই রোখ।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে গাড়ীটা থেমে গেল।

গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করল: বলুন শেঠজী।

—গাড়ী ফেরাও।

—কোথায়?

—উল্টো দিকে।

-উল্টো দিকে!

উত্তেজিত হয়ে চমনলাল বলল: হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলছি কর।

কিছু না বুঝতে পেরে হতভম্ব গাড়োয়ান একা ফেরালো। ততক্ষণ অপর গাড়ীটি বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে। চমনলাল সেই গাড়ী দেখিয়ে বলল: 'ঐ গাড়ীর পেছনে চল। ও যেখানে থামবে সেখানেই গাড়ী থামাবে।' কিছু না বুঝতে পেরে গাড়োয়ান গাড়ী চালাতে লাগল। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তার অর্থ পেলেই হল।

আগের গাড়ীটা দ্রুত চলছে, যেন ব্যস্ত এমন ভাব। চমনলালের গাড়োয়ানও তেমনি দ্রুত তার গাড়ী চালাল। তখন সূর্য আকাশে অনেকটা উঠে গেছে। পথিকদের মধ্যে যারা সেই দুটো গাড়ীর গতি লক্ষ্য করল, তারা একটু আশ্চর্য্য হল। যেন কোন বিপদের মুখে তাড়িত হয়ে চলেছে তারা। কিন্তু তাই নিয়ে কেউ আর ভাবল না।

আগের গাড়ীটিও পেছনে তাদের কেউ অনুসরণ করেছে কিনা দেখল না। দেখেছিল কিনা তাই বা কে বলতে পারে। সে তেমনিই চলতে লাগল। কিছু দূরে এগিয়ে গাড়ীটা পশ্চিমে বাঁক ফেরালো, তারপর মাটির দেয়াল লক্ষ্য করে ছুটল। চমনলালের গাড়ীও ছুটল সেই দিকে। অগ্রবর্তী গাড়ীটি ঠিক মাটীর দেয়ালের কাছে এসে থামল। থামল এমন একটি গৃহের কাছে যা মোটেই চমনলালের কল্পিত গৃহের কাছে কিছু নয়। এমনটি সে ভাবতে পারেনি। কিন্তু কী যে সম্ভব, কী যে সম্ভব নয়, কে জানে। হীরক উজ্জ্বল প্রস্তর বটে, থাকে তো অন্ধকার গহ্বরে, বেষ্টনীর মধ্যেই। ভূগর্ভের অন্ধকারে কত মণি-মুক্তোই না রয়েছে কে জানে! তা যদি সম্ভব হয় তবে এটা সম্ভব হবে না কেন!

আগের গাড়ীটা থামল। তার কিছু পেছনেই চমনলালের একাও থামল। চমনলাল আর কাল বিলম্ব না করে নেমে পড়ল এবং আগের গাড়ীটির দিকে এগিয়ে চলল। সেই গাড়ী থেকে একটি বোরখাবৃতা রমণী নেমে দ্রুত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করল। চমনলালও

গিযে সেই গৃহের সামনে দাঁড়ালো। কিন্তু কাছে গিয়েই দেখল গাড়ীতে আরোহিণী একা ছিলনা আর একজন পুরুষ ছিল। কি জানি কেন, তাকে দেখবা মাত্রই চমনলালের বুকের মধ্যে ঈর্ষার ভাব জাগল।

সেই আরোহীটি তখনো গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেনি। চমনলালকে দেখে সে ফিরে দাঁড়ালঃ কাকে চাই ?

দেশে বিদেশ ঘুরে, দিগ্‌বিদিগ্‌ যে জয় করেছে—সেই চমনলালও যেন অপ্রস্তুত বোধ করল।

আবার সেই আরোহী জিজ্ঞেস করলঃ কাকে চাই ?

চমনলাল বললঃ "এটা কি আসমানতারার..." কথাটা বলেই চমনলালের বুকটা একটু কাঁপতে লাগল। মুহূর্ত পূর্বে সে যে ব্যবহার পেযে এসেছে তাতে এখানেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। সেই পুরুষ আরোহীটি বললঃ হ্যা, আসমানতারা এখানেই থাকেন। আপনি কে ?

—আমি শেঠ চমনলাল ?

—আসমানতারাকে আপনার প্রযোজন ?

—হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

চমনলালের যেন একটু ভাল লাগল। না, এ তুর্কী নয়। অভিজাত্যের অহংকারে ঔদ্ধত্য দেখা দেয়নি এর মধ্যে।

আরোহী বললঃ আপনি বসুন। আমি আসমানতারাকে খবর দিচ্ছি।

চমনলাল ভেতরে এসে বসল। তাহলে তার চোখ ভুল করেনি! সে ব্যবসায়ী লোক, ভুল করাবার মত দৃষ্টি তার নয। সে তার সেই বিশ্লেষণী চোখ দিয়ে ঘরটার চতুর্দিক দেখতে লাগল। ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি তেমন নেই। সাধারণ একটি বাঙালীর ঘরের মতন—অবশ্য গৌড় নগরীতে সাধারণত্বের বিচার যে মাপকাঠিতে হয় সেই বিচারেই। ঐশ্বর্য্য না থাক, তার জন্য চমনলালের আফসোস করবার কিছু নেই। যে ঐশ্বর্য্যের অভাব সে এই ঘরে লক্ষ্য করেছে—সে ঐশ্বর্য্য তো সে নিতে আসেনি—তেমন ঐশ্বর্য্য এখানে রেখে যাবার জন্যই সে এসেছে। তবে যে রত্নের সওদায় সে এখানে এসেছে, তা মুল্যবান। ঝিনুকের পেটে তো মুক্তা থাকে, ঝিনুকটা মুল্যহীন হলে কি এসে যায়! মুক্তা থাকলেই হল। এখানে মুক্তা আছে, খাঁটি মুক্তা।

ঐশ্বর্য্যের অভাব এই ঘরটাতে বটে, কিন্তু আকর্ষণের অভাব নেই। ঘরটার বিচিত্র সজ্জা। দেয়ালে কোরাণের বযেত লেখা। অথচ রাধা-কৃষ্ণের একটি গৌড়ীয় ধরনের ছবি আঁকা। এ ছবি প্রকাশ্যে বিক্রী হয় না, একমাত্র অনুরক্তরাই নিজস্ব শিল্পীর কাছ থেকে কেনে। আসবাবপত্র যা রয়েছে তা দেখে মনে হয় গৃহের মালিক মুসলমান, কিন্তু দেয়ালে টাঙানো রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি দেখে আশ্চর্য্য লাগে। ঘরটাতে তাই ঐশ্বর্য্যের চমক না থাকলেও রহস্যের একটা অব্যক্ত ভাব আছে। পরিবেশে উচ্ছৃঙ্খলতা কোথাও নেই—একটা শান্ত সৌম্য ভাব। আসমানতারার আধার এ কেমন রহস্য কে জানে ?

চমনলাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছিল, এমন সময় পাশের পর্দা দুলে উঠল। ঘরে

প্রবেশ করল এক রমণী। চমনলাল চোখের নিষ্পলক বিস্ময়ে শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকল। আজ সকাল থেকে একেই খোঁজ রকছিল সে। কি আশ্চর্য্য! গত সন্ধ্যার মনোহারিণী একটি নটীর রূপের সঙ্গে আজ তার অনেক পার্থক্য। কিন্তু আকর্ষণ? এতটুকু কম নেই। কাল মনে হয়েছিল একখণ্ড জ্বলন্ত আগুন, ঝাঁপিয়ে পড়ি। আজ মনে হচ্ছে নিস্তরঙ্গ, গভীর, স্থির সমুদ্র। দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় লাগে। এর কোন কুল পাওয়া যাবে না বলে মনে হয়। কিন্তু আকর্ষণ কম নয়, ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না। চমনলাল অবাক হয়ে দেখতে লাগল। তার সেই দৃষ্টির মধ্যে যে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে সেটা বুঝতে বাকী রইল না আসমানতারার। এমন অনেক অনুরক্ত ভক্তের বিস্ময়বিমূঢ় ভাব সে বহুবার দেখেছে। তাই সে নিজে এতটুকু অপ্রস্তুত না হয়ে বরাবর চমনলালের সামনে একটি নিতান্ত বাঙালী মোড়ার উপর বসল। তারপর অবিচলিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললঃ বলুন শেঠজী কি খবর?

চমনলাল বলল ঃ তোমার উদ্দেশেই এখানে এলাম।

চোখে একটা কটাক্ষ টেনে আসমানতারা বললঃ কেন? আবার কোন বন্ধু দূর দেশে যাচ্ছে নাকি?

চমনলাল একটু রহস্য করতে ছাড়ল নাঃ কেন,শুধু বন্ধুবিয়োগ কেন, নতুন বন্ধু তৈরী করার জন্যও আসা যায় না!

আসমানতারা যে না বুঝতে পারল তা নয়। তবু একটু বাজিয়ে নেবার জন্য বললঃ ব্যাপারটা একটু ভেঙে বলুন।

চমনলাল বললঃ ভেঙে বলবার কিছু নেই, কথাটা স্পষ্ট। তোমার কাছেই এলাম আমি।

আসমানতারা বললঃ আমি বাঈজী, আপনাদের মত মহাজনদের চিত্তবিনোদন করাই আমার কাজ। আসবেন তাতে আর নতুনত্ব কি।

চমনলাল বললঃ তবে আমি একটু বিশেষ ভাবে আসতে চাই।

—বলুন।

—মানে, নতুন বন্ধু সংগ্রহ করতে।

—কাকে? আড়চোখে আসমানতারা চমনলালের দিকে তাকালো।

চমনলাল একটু ইতস্ততঃ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু করল না। বললঃ তোমাকেই যদি হয়?

কথাটা যে পূর্বাহ্ণেই আসমানতারা আঁচ করতে পারেনি তা নয়। এমন ঘটনা তার জীবনে বহুবার ঘটেছে। কিন্তু ঠকে ঠকে সে জীবনকে চিনেছে, তাই জীবনের দিকে তার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। চমনলালের কথাটা শেষ হতেই সে হো হো করে হেসে উঠল। একটু আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো চমনলালঃ বিবি তুমি হাসছ কেন?

আসমান বললঃ আমাকে বিবি বলবেন না। নৃত্য আমার পেশা হলেও বিবির দলে আমি নেই। আমাকে নাম ধরেও ডাকতে পারেন। কিন্তু কথাটা হচ্ছে আমি না হেসে পারলুম না। আপনাদের মত ঝানু ব্যবসায়ীর পক্ষে কথাটা কত সাধারণ হয়ে গেল ভেবে দেখেছেন কি?

চমনলাল চোখের কোণে জিজ্ঞাসার চিহ্ন টেনে আসমানতারার দিকে তাকালো : কেন, বল তো?

আসমান বলল: বন্ধুত্ব মানেই তো হৃদয়ের কথা। একটা ব্যবসায়ীর পক্ষে মোটেই এটা কৃতিত্বের কথা নয়।

চমনলাল বলল: কিন্তু ব্যবসায়ীরাও তো মানুষ!

—আপনার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে, হলে হতেও পারে। আচ্ছা শেঠজী তাহলে সত্য করে বলুন তো এরকম মানুষ হবার ইচ্ছা কতবার আপনার জীবনে জেগেছে?

চমনলাল অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো : হঠাৎ এ প্রশ্ন?

আসমান বলল: কখনো কখনো মুহূর্তের একটা আবেগে, আবেগ বলতে পারিনা, কামনার তাড়নায় আপনারা মানুষ হন, কিন্তু কতক্ষণ তার স্থায়িত্ব?

চমনলাল মুখের রেখাতে একটা আকৃতি টেনে বলল: (যদিও আকৃতির ভাবটাও বীভৎস হয়ে ফুটে উঠে তার মধ্যে) না না সুন্দরী এর মধ্যে আমার কোন কৃত্রিমতা নেই।

আসমান বলল: হ্যাঁ, কয়েক মুহূর্ত আপনাদের কৃত্রিমতা থাকেনা সত্যি, আবার কয়েক মুহূর্ত পরে আপনারা আপনাদের অকৃত্রিমতা ফিরে পান, অর্থাৎ বুঝতে পারেন কোন একটি বিশেষ দেহের উপর আপনাদের আকর্ষণ স্থায়ী নয়।

চমনলাল বলল: না না সুন্দরী, আমি ঠিকই বলছি। তুমি হয়তো জানো না, নইলে আমি গুজরাটের সমুদ্রতীর থেকে দুলারী বাঈকে কুড়িয়ে আনতে পারতুম।

আবার হাসল আসমান। বলল: কুড়িয়ে ঠিকই এনেছেন, যেটুকু আনবার। বাকীটুকু ফেলে এসেছেন।

চমনলাল কি বলবে ভেবে পেল না। শুধুমাত্র একটা প্রবল আবেগ তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ঘুরতে লাগল। তার মুখটা আবার বীভৎস হল।

কিন্তু আসমানতারার দৃষ্টি সূক্ষ্ম। এই বীভৎসতার অন্তরালে চমনলালের রক্তের মধ্যে কিসের আন্দোলন চলছে বুঝতে তার বাকি থাকল না। সে বলল: শেঠজী অন্য কথা বাদ দিন, আপনি ব্যবসায়ী, ব্যবসার কথা কিছু থাকে তো বলুন।

চমনলাল বলল: আমি ব্যবসায়ী বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে ব্যবসা করব না।

আসমান বলল: সেকি কথা! ব্যবসা না করলে আমার চলবে কি করে—নৃত্যটা যে আমার ব্যবসা ।

—আমি তোমার অর্থের কোন অভাব রাখবনা।

—শেঠজী সেটা আমার নসীব। আমি যদি এমন মহাজন পাই তো সৌভাগ্য।

চমনলাল বলল: পাবে। আমাকেই পাবে তুমি। আসমান আমি তোমাকে প্রথম দেখেই ভালোবেসে ফেলেছি।

আসমান বলল: কিন্তু মেহেরবান একটা কথা, ব্যবসাটা আমর হৃদয় নিয়ে নয়, নৃত্য নিয়ে, সঙ্গীত নিয়ে। আপনি অর্থের বিনিময়ে নৃত্য আর সঙ্গীত কিনতে পারেন, কিন্তু মনটাকে বিকোতে পারব না। জানেন তো, ওটা আমাদের আর নেই। যখন নাচের ব্যবসায়ে হাতেখড়ি হয়, তখন হেকিম এসে ঐ পদার্থটাকে কলজে থেকে ছেটে বের করে নেন।

চমনলাল বললঃ ঠিক আছে সুন্দরী। তোমার নৃত্য আর শিল্প দুইই আমি কিনে নেব।

—জনাবের অশেষ মেহেরবাণী।

চমনলাল তৎক্ষণাৎ তার কোমর থেকে একটি তোড়া বের করে আসমানের হাতে দিতে গেলঃ এর মধ্যে একশ' সোনার মোহর আছে।

আসমান আর একবার দৃষ্টুভাবে তার দিকে তাকালোঃ এটা কেন?

চমনলাল বললঃ তোমার বকশীস।

—কিসের জন্য? এই কয়েকটি কথা বললুম সে জন্যে? কিন্তু শেঠজী ব্যবসাটা তো আমার কথার নয়, গানের।

চমনলাল বললঃ তোমর কথাটাই আমার কাছে সঙ্গীতের মত মনে হয়।

আস্‌মান বললঃ জনাবকে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু জানেন, ঝুট্‌ ব্যবসা আমরা শিখিনি। সোনার আবরণ দিয়ে পিতলের খণ্ডকে আমরা চালাতে পারিনে। কথা আমাদের কাছে কখনই গান হয় না। অনেক বোকা ক্রেতা আছে, যাবা খাঁটি অখাঁটি চিনতে পারে না, কিন্তু তাই বলে বিক্রেতাকে তো অসৎ হলে চলে না!

চমনলাল বুঝল থাপ্পড়টা তার গালেই মারল বাঈজী। কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করলে চলবে না। বাঈজীদের জব্দ করবার অস্ত্রও তার জানা আছে। ওদের মারতে হয় সোনার পয়জার দিয়ে। সে বললঃ ঠিক আছে সুন্দরী, তোমার নাচ-গান যখন দেখব তখনই নজরানা দেব। তবে কথা কি জান, রোজই আমি তোমার নাচ দেখব। তুমি আমার কাছেই বাঁধা রইলে।

আসমান চমনলালেব দিকে তাকালোঃ 'তুমি' বলতে কি বুঝেছেন শেঠজী? এখানে তো আমার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই?

—মানে?

—মানে এই যে, আমার নাচ আর গানকে আমি আর্থের বিনিময়ে বিক্রী করি, আমাকে নয়। প্রতি সন্ধ্যায আপনি নাচ গানকে নিশ্চয়ই পাবেন। তাই বলে আমাকে তো বাঁধা দিতে পারিনে আমি।

—কথাটা কেমন হল সুন্দরী?

আসমান বললঃ স্পষ্ট। অর্থাৎ এই যে, আমি দেহোপজীবিনী নই।

কথাটা শুনে চমনলালের আর কিছু বলবার থাকল না। সে অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকল, তারপর উঠে দাঁড়ালোঃ আচ্ছা, আসি সুন্দরী।

তেমনি একটা হাসিভরা মুখে আসমান বিদায় জানালোঃ অসুন জনাব।

চমনলাল আর একবার তাকিয়ে দেখল। একেবারেই কোনরকম ক্রোধ বা ঘৃণার চিহ্ন নেই সে মুখে। অথচ কী আশ্চর্য্য দৃঢ়তার সঙ্গেই না কথা কয়টি বলল আসমান। সত্যিই কি তবে হৃদয়টা উপড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে সে! না সবই অভিনয়! আর অভিনয় হলেই এমন অভিনয় সে করবে কেন? সে তাড়াতাড়ি এক্কাতে গিয়ে উঠল।

গাড়োয়ান জিজ্ঞেস কবলঃ এবার কোথায় শেঠজী?

—দক্ষুল দরওয়াজা।

এক্কা চলতে লাগল। এক্কার লম্ফমান আন্দোলনের মধ্যে বসে চমনলালের দেহটা ওঠানামা করতে লাগল। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন স্থির হয়ে বসে থেকে তাকে কামড়াতে লাগলঃ আসামন কি তাকে অপমান করল ?

হ্যাঁ, অপমানই করল। তুর্কী অসমান বিবিও তাকে অপমান করেছে। কিন্তু কার অপমান বেশী ? একটি ভ্রূকুঞ্চিত ক্রোধান্ধ মুখের দুর্বাক্য, না একটি হাসির প্রলেপ মাখানো সুন্দর মুখের নিরাকর্ষণ ঔদাসীন্য ?

পাঁচ

"তুমি যে তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন।"

—রবীন্দ্রনাথ

কবি দরিদ্র হতে পারে কিন্তু সাধনা তার ঐশ্বর্য্যের। মণি-মুক্তা জহরৎই যে সে ঐশ্বর্য্য এমন নয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আরো ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে আছে; সেই ঐশ্বর্য্যই তাকে আরো বেশী আকর্ষণ করে। রূপের যে ঐশ্বর্য্য, তার আকর্ষণও তার কাছে কম নয়। তবে রূপটা দৈহিক কিম্বা দেহাতীত কে জানে! দৈহিক রূপ তাকে বিচলিত করে। কিন্তু সেটা প্রবেশপথ মাত্র ; সেই প্রবেশপথ দিয়ে সে এক দেহাতীত ঐশ্বর্য্যের জগতে প্রবেশ করে। সেখানেই তার প্রকৃত রূপচর্চা এবং ঐশ্বর্য্যচর্চা। ভূষণ খাঁ দরিদ্র হলেও সেই রূপ এবং ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই। সে ঐশ্বর্য্য মুল্যে কোন অংশে কম নয়। তাই ভূষণ দ্ররিদ্র হলেও আমীরপুত্রদের সঙ্গে সমান আসন পেয়েছে, আর ভূষণের সমগোত্রীয়েরা পর্ণ কুটীরে বাস করেও সুলতানের আকাঙক্ষার পাত্র। প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করেও মহাজন ব্যক্তি তাদের সেই কল্পিত ঐশ্বর্য্যের দিকে লোভের দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে থাকে। তাই কবি সভাষদ এবং কাব্য হল দরবারের ভূষণ।

ভূষণ নিজে সেই ঐশ্বর্য্যদেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করেছে। কিন্তু সোনার মোহরের আকারে নয়, কাব্যের স্বর্ণাক্ষরে। নতুন কাব্য লেখার জন্য সে বহুদিনই কল্পনায় মগ্ন ছিল। কিন্তু তার মনের মত কোন দেবীকে সে পায়নি। কাকে নিয়ে লিখবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল। অবশেষে ঐশ্বর্য্যদেবী লক্ষ্মীকে সে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মীর রূপ ধ্যান করতে গিয়ে বার বার সে একটা দৈন্য উপলব্ধি করছিল। গতকাল নৃত্যের আসরে অভাবিত রূপে সে তার ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পায়। মুহূর্তে তার দারিদ্র্য ঘুচে যায়। এই দারিদ্র্য ঘুচিয়েছে আসমানতারা। তার সেই অনিন্দিত মুখখানাই ছিল ভূষণ খাঁর স্বপ্নের আরাধ্য। তাই সেই নৃত্যের আসর থেকেই সে একটা উন্মাদনা নিয়ে ফিরেছিল। সে উন্মাদনা কোন দেহের

সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত নয়। তা প্রকৃতই দেহতীত কোন মানসিক সৌন্দর্য্য। পরদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই সে সেই রূপের ধ্যান করতে অরম্ভ করেছিল। তা প্রকৃত পক্ষে কোন মানবীর মুখ নয়, এক দেহাতীত অপার্থিব সৌন্দর্য্যের বৃন্তহীন অবস্থান। প্রভাতের রঙিন আলোতে সেই সৌন্দর্য্যের কথঞ্চিৎ তার কলমের মুখে ধরা দিয়েছিল। ভূষণ লিখেছিলঃ

"সিংহ জিনি মাজা খিনি তনু অতি কমলিনী।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি।।
কাজরে রঞ্জিত ধবনি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর।।
ভূষণ খাঁয়ে ভনে অশেষ অনুমানি।
জগত ঈশ্বরী দেবী লক্ষ্মী কমলপাণি।।"

লিখবার পর যেন একটা তৃপ্তি অনুভব করল ভূষণ খাঁ। ঠিক এমনটি এতদিন তার হয়নি। আজ যেন তার কল্পনা অনেকটা নিকটবর্তী হয়েছে। ঠিক যেন মনের গন্ধে ভরা। অনেকক্ষণ ভুষণ খাঁ সেই রূপকল্পনার মধ্যে ডুবে থাকল। তখন অন্য সব কথাই যেন সে ভুলে গেল। যে আসমানতারা তাকে এই রূপকল্পনার প্রেরণা জুগিয়েছে তার কথাও মনে পড়ল না আর। নিজের কবিতা থেকে একটা বিচিত্র ধূপের গন্ধ এসে তাকে আমোদিত করতে লাগল। কিছুকাল সেই ধূপের মধ্যে আনন্দের নিবিড় আবেশে তন্ময় হয়ে থাকল সে। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ মনে হল, একটা অস্বস্তি তার মধ্যে প্রবল ভাবে মোচড় খেয়ে উঠছে। কেন? যেন মনে হতে লাগল তার সেই আনন্দের ভার আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না সে। যেন তার ছোট্ট বুকটুকু যথেষ্ট নয়। কি এক বিচিত্র আনন্দে নিজের বুকটাকে খুলে ধরে নিজেকে বিকশিত করে দিতে ইচ্ছে করছে। তাই বুঝি ফুলের কুঁড়ি পুষ্পে বিকশিত হয় নিজের বুকের মধ্যে গন্ধকে ধরে রাখতে পারেনা বলে। ভূষণের মনে হল এ নিবিড় আনন্দ ভাগ করে নিতে হবে। কিন্তু কার সঙ্গে? সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল রিহানের কথা, বুরহানের কথা, জালালের কথা। হঠাৎ জালালের কথা মনে পড়তে একটু চমকে উঠল সে, সেকি! সে যে আজ চলে যাচ্ছে গৌড় ছেড়ে! নহবৎখানায় তাকে সবাই বিদায় জানাতে যাবে! ছি ছি ছি! লজ্জায় সে জিব কাটল। একদম যে তার ভুল হয়ে গেছে কথাটা! সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ল। কাগজখানি হাতে নিল। এতে নতুন কবিতা লেখা রয়েছ—জালালকে এই দিয়ে সে শেষ বিদায় সম্বর্ধনা জনাবে। ভূষণ দ্রুত বাইরে ছুটে এল।

আশেপাশে পরিবেশে কোথাও তার দৃষ্টি পড়ল না। এমন কি আকাশেও তার নজর পড়ল না। পড়লে দেখতে পেত, সূর্য্য আকাশের গায় অনেকক্ষণ পুরানো হয়ে গেছে। এতক্ষণ জালাল আর নেই। কিন্তু ততটা আর ভাবা গেল না, অতটা সে ভাবতে পারে না। যখন যা মনে হয় তাই শুধু তার লক্ষ্যের মধ্যে থাকে, আর সব হারিয়ে যায়। তাই এ সমস্ত প্রশ্ন তার মনে আসতে পারল না আর। ভূষণ দ্রুত নহবৎখানার দিকে এগিয়ে চলল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে সে যখন নহবৎখানায় পৌঁছুল—তখন দেখল যে সেখানে জনমানবের চিহ্ন নেই। সাধারণতঃ নহবৎখানাতে যে ভিড় থাকে তাও নেই। শুধু মিহি একটা একটানা করুণ সুরে সানাই বেজে চলেছে যা সাধারণতঃ সব সময়ই নহবৎখানাতে বাজে। দরওয়াজাতে শুধু দুজন তুর্কী সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। আর সমস্তটাই নীরব। হঠাৎ নিজের মধ্যে একটা চমক লাগল তার—সেকি! তবে কি আজ জালালের যাবার কথা ছিল না! সে কি ভুল শুনেছিল?

হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহের দোলা লাগল মনের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য্য, তখনো তার মনের মধ্যে এ প্রশ্ন এলনা যে—বেলাটা কত। আর খুব সকাল বেলাতেই জালালের যাবার কথা। এ প্রশ্ন তার নিজের মনে এল না কিন্তু কোন কারণে এসে গেল। সূর্য তখন বেশ খানিকটা উপরে উঠেছে। রক্তাভ সূর্য বেশ কয় প্রহর আগেই গলিত রূপার মত হয়েছিল। এবার সূর্য রশ্মির মধ্য দিয়ে আগুন ঝরছিল। সেই রৌদ্রের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। এবার ভূষণ খাঁ সেই রৌদ্রের তেজ অনুভব করল। শরীরের মধ্যে জ্বালা বোধ করে একটু উপরে তাকালো। দেখল—সূর্য্যটা সত্যি একেবারে গলে গেছে। তার চতুষ্পার্শের অগ্নিবলয়ের মধ্যে গলিত দ্রব্যরাশি ঝলমল করছে। সেইদিকে এক মুহূর্তও তাকিয়ে থাকা যায় না। চোখটা ঝলসে যায়। বেলা অনেকটা হয়েছে, তখন তার মনে পড়ল। মনে পড়ল জালালের বহু পূর্বেই গৌড় ত্যাগ করবার কথা। এতক্ষণ সে অনেক দূর চলে গেছে। নিশ্চয়ই আর সকলেও এসেছিল—তারা যথাসময়ে বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে চলে গেছে। শুধু ভূষণ খাঁই আসতে পারেনি। নতুন এক উন্মাদনার মধ্যে ডুবে ছিল সে, তাই এ কথা তার খেয়াল ছিল না। তখন তার ভুলো মনটার উপরই ভূষণ খাঁর রাগ হল। এই ভুলো মনের জন্য বহুবার তাকে অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। আবার আজো তাই হল। নিজের মনের এই পাগলামীটাকে একটা রোগ বলে মনে হল আজ। কিন্তু সময় হারিয়ে সে সব মনে করেই বা লাভ কি? লাভ শুধু অনুশোচনা।

সেই অনুশোচনায় একটুখানি মলিন হয়ে ভূষণ খাঁ ফেরবার জন্য প্রস্তুত হল। অনুশোচনার বিষয়টি মুহূর্তের মধ্যে তার মনে এতই প্রবল হয়েছিল যে, সে তার হাতের কাগজটির কথাও ভুলে গিয়েছিল। ফেরবার জন্য যখন পা বাড়লো, তখন তার মনে হল, কী একটা জিনিষ যেন তার পাশে গড়িয়ে পড়ল। নীচে তাকাল ভূষণ খাঁ—আর তৎক্ষণাৎ তার হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। কি সর্বনাশ! এ যে বহু স্বপ্নের সাধনার ফল। এ যে তার নতুন মঙ্গল কাব্যের 'দেবী বন্দনা'। তাড়াতাড়ি বহু শ্রদ্ধার ভঙ্গীতে সে কাগজটি কুড়িয়ে নিল, তারপর তাকে কপালে ঠেকিয়ে একেবারে বুকের মধ্যখানে আক্‌ড়ে ধরল। আবার তার মনের মধ্যে সকাল বেলার সেই পুলকের সঞ্চার হল। আর তৎক্ষণাৎই মনে হলা, সে পুলক বড় তীব্র, একটি মাত্র বুকের মধ্যে সেই আনন্দের উত্তেজনাকে ধরা যায় না। ভাগ করে না নিয়ে কোন উপায়ই যেন নেই। এই আনন্দ একটি রত্ন কুড়িয়ে পাওয়াতে, যে রত্ন তার মনের গহন থেকে আহরিত—এক খণ্ড কবিতা। এ যেন অপরকে না দেখালেই নয়, না শোনালেই নয়। এ যেন তার নিজেরই আকাঙ্ক্ষা নবজাত শিশুর মত বাইরে এসে একটু স্নেহের জন্য ব্যস্ত হয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। সে বুকের মধ্যে স্থান পেতে চায়। এক নয়, বহু বুকের মধ্যে।

নতুন আবিষ্কারের আনন্দ ভাগ করে নিতে হবে, কিন্তু কার সঙ্গে? জালালের কথা মনে পড়ল প্রথম। সেই মুহূর্তে একটা বেদানাও অনুভব করল। কারণ সে এখন বহু দূরে। বুরহান? হ্যাঁ সে সমজ্জদার পাঠক বটে, কিন্তু....! না এই মুহূর্তে তার কাছে যাওয়া যায় না। রিহান? সেও একই প্রশ্ন। চমনলাল? ভেবে লাভ নেই। হৃদয়টা তার মন্দ নয় কিন্তু কাব্যের সমজদার শ্রোতা সে নয়। তবে এই মুহূর্তে কার কাছে যাওয়া যায়? কাউকে না শোনাতে পারলেও যেন ভাল লাগছে না। একটি সংবেদনশীল হৃদয়, একটি সমবেদনাপূর্ণ মুখের কথা ভাবতে চেষ্টা করল সে। হঠাৎ তার মনে পড়ল গত রাত্রির সেই মুখের কথা, সেই নর্তকী,—যে তার সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী বর্ণনার মূল প্রেরণা। অথচ কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ তাকেই মনে ছিল না। ভূষণ মনে মনে বলল, সেখানেই যেতে হবে। হ্যাঁ, যাওয়া যেতেও পারে, কারণ কাল নর্তকী নিজেই তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। চলে আসবার সময় তার সেই কালো দুটি চোখের কথা মনে পড়ল ভূষণ খাঁর। আর তখনি লুব্ধ কল্পনা ছুটে গেল নর্তকীর দিকে। সে বলেছিল, পশ্চিমগড়ে সে থাকে। কিন্তু পশ্চিমগড়ের কোন্‌খানটায, সেটা জেনে নেওয়া হয়নি। না হোক্, খুঁজলে কি বের করা যাবে না? ভূষণ খাঁ যাবার জন্য প্রস্তুত হল। পশ্চিমগড় যথেষ্টই দূর নহবৎখানা থেকে। সে দেখল কোন এক্কা নজরে পড়ে কিনা। না, কোন এক্কা নেই। না, থাক, হেঁটে চলবার অভ্যাস আছে ভূষণ খাঁর, সে হেঁটে চলবার জন্যই তৈরি হল। একটু এগিয়েছে, এমন সময় পেছনে যেন একটা গাড়ীর শব্দ পেল সে। ফিরে তাকিযে দেখল একটি এক্কা আসছে। খালি। নহৎখানা থেকে একটু দূরে এসে এক্কাটি থামল। অনেক গাড়ী এখানে এসে অপেক্ষা করে, বহু আরোহী পাওয়া যায় এখানে। ভূষণ ফিরে আবাব এক্কার কাছে এগিয়ে এল।

গাড়ী থেকে নেমে গাড়োযান নিজেকে হাওয়া করছিল। ঘোড়াটাও ক্লান্ত, যেন কোথা থেকে এইমাত্র এল।

ভূষণ জিজ্ঞেস করলঃ পশ্চিমগড়ে যেতে পারবে?

প্রাশ্নটা শুনতেই গাড়োয়ানের মধ্যে কেমন যেন একটা বিস্ময়ের ভাব জাগল। একটা রহস্যভরা দৃষ্টি নিয়ে সে ভূষণ খাঁর দিকে তাকাল।

ভূষণ আবার জিজ্ঞেস করলঃ পশ্চিমগড় যাবে?

হঠাৎ যেন অকারণে গাড়োয়ানটার মুখে রহস্যের ভাব কেটে গিয়ে এক ঝলক হাসি খেলে গেল।

—একি হাসছ কেন?

গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করলঃ আপনি কোথায় যাবেন জনাব?

ভূষণ বললঃ বললুম তো পশ্চিমগড়।

—আসমানতারার ওখানে কি?

গাড়োয়ানের মুখে ও নামা শুনামাত্রেই কেমন আশ্চর্য্য হল ভূষণ খাঁ। সে কি! লোকটা আসমানতারার নাম জানল কি করে! অন্তর্যামী নাকি! ভূষণ খাঁ তার মখের দিকে একটু বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর বললঃ তুমি সে নাম জানলে কি করে?

গাড়োয়ান বললঃ আগে জানতুম না জনাব, এবার জেনেছি। আমি গাড়োয়ান, বহুকাল গাড়ী চালাচ্ছি। পশ্চিমগড়ে বড় যাবার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এবার থেকে পশ্চিমগড়ে বড় টান, যিনিই গাড়ী চাপছেন, বলছেন, পশ্চিমগড় যাব। কোথায়? আসমানতারার ওখানে।

ভূষণ জিজ্ঞেস করলঃ তুমি আমানতারাকে চেন?

গাড়োয়ান বললঃ চিনতুম না, আজ চিনেছি। বহুৎ খুবসুরৎ বাঈজী আছেন আসমান বিবি।

ভূষণ গাড়োয়ানের কথা শুনে কেমন একটু রহস্য অনুভব করল। বললঃ কি হয়েছে বলতো? আজই মাত্র তুমি আসমানতারাকে চিনলে, অথচ এরই মধ্যে কল্পনা করে নিলে যে, সব লোক তারই কাছে যায়, নইলে পশ্চিমগড়ে কোন কাজ থাকে না?

গাড়োয়ান বললঃ না, জী। একথা আমার মনে হোত না। কিন্তু আজ সকালে এমন অবস্থার মধ্যে আসমান বিবিকে দেখেছি যে, এখন পশ্চিমগড়ের কথা মনে পড়লেই আসমান বিবির কথাও মনে পড়ে।

ভূষণের আগ্রহ হল। বললঃ সবটা খুলে বল দিকিনি?

গাড়োয়ান বললঃ আজ সকালে এক পাগলা শেঠজী আমার গাড়ীতে চেপেছিলেন। মুখভরা তাঁর বসন্তের দাগ। অসমান বিবির কাছে গিয়েছিলেন তিনি। বিবির আস্তানার খোঁজ জানতেন না, শুধু তার নামই জানতেন। আমায় বললেন, আসমান বিবির ঘর খুঁজে বের করতে। আমি প্রতিটি বাঈজী বাড়ী খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। অবশেষে একটি আসমান পাওয়া গেল বটে, তবে তিনি গৌড়ের আসমান নন, তুরাণের আসমান।

ভূষণ জিজ্ঞেস করলঃ গৌড়ের আসমান, তুরাণের আসমান এসব কী বলছ তুমি?

—হ্যাঁ জনাব, এমনটিই হয়েছিল।

—তারপর আসমানতারাকে পেলে?

—পেলুম। তবে ঘরে নয়, বাইরে নয়, একটি গাড়ীর মধ্যে। সেই গাড়ী অনুসরণ করেই তাকে পেলুম। পাগল শেঠজী কম হয়রান করেছেন আমাকে?

শেঠজীর গাড়োয়ান যে বর্ণনা দিল তাতে ভূষণের কেমন সন্দেহ হল—চমনলাল নয় তো! কিন্তু হঠাৎ চমনলাল আজই আমানতারার ওখানে যাবে এমন কি কারণ ঘটল! চমনলালকে সে চেনে, তার দলবল সবাইকে। এমন ভাবে তাদের কাছে বাঈজীর কোন মূল্যই নেই। বাঈজী সান্নিধ্য ইয়ার-বন্ধুদেয় নিয়ে। চমনলাল একা যাবার পাত্র নয়। আর এই প্রত্যক্ষ দিনের বেলায় অসময়ে সে ওখানে যাবেই বা কেন? ভূষণ চলেছে অন্য কারণে। চমনলালের তেমন কোন প্রশ্ন নেই। তবে?

সে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলঃ আচ্ছা বলতো শেঠজী কোথা থেকে তোমার গাড়ীতে উঠেছিলেন?

গাড়োয়ান বললঃ এসেছিলেন দক্ষল দরওজার কাছ থেকে। এখানে নহবৎখানার কাছে এসে এক বন্ধুকে বিদায় দিলেন। সিপাহশালার সাহেবের সঙ্গে তিনি ত্রিহুত যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কার জন্য। তার পর বন্ধুকে বিদায় দিয়ে আমাকে নিয়ে পশ্চিমগড়ে যান।

ভূষণ খাঁর আর বুঝতে বাকী থাকল না যে, শেঠজী তাহলে চমনলালই হবে। সে গাড়োয়ানকে বলল: হয়েছে আর শুনবার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাকে নিয়ে গৌড়ের আসমান বিবির কাছেই চল।

সে গিয়ে গাড়ীতে বসল। গাড়োয়ানও তার নির্দিষ্ট আসনে বসে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল— সপাং। ঘোড়া ছুটল পাথর ছড়ানো পথের উপর দিয়ে, ঠকাঠক্, ঠকাঠক্। এবার আর গাড়োয়ানের কোন অসুবিধা নেই। বরাবর সে পশ্চিমের মাটীর দেওলের দিকে গাড়ী চালিয়ে দিল। বাঈজী পাড়ার মধ্যে আর তাকে ঢুকতে হল না, মুখেই ছোট্ট একটি বাড়ীর কাছে গাড়ী থামল। আরোহীকে ডাকল সে: জনাব এবার নামতে পারেন, আমরা এসে গেছি।

ঠিক এমন একটি কথা শুনে চমনলালের বুকের মধ্যে যে চমক লাগতে পারতো ভূষণ খাঁর মধ্যে তেমন কোন দোল্ খেয়ে উঠল না। উঠল না কারণ চমনলাল আর তার উদ্দেশ্য এক নয়। চমনলাল এসেছিল এক রূপোপজীবিনীকে প্রত্যাশা করে—অথচ যার কাছে প্রত্যাশা ছিল দেহবিলাসিনীর চাইতে একটু বেশী। হঠাৎ আসমানতারার জন্য হৃদয়ের মধ্যে একটা দুর্বলতা অনুভব করেছিল সে। ভূষণ খাঁর তেমন কোন দুর্বলতা নেই। সে কামনার দংশনে একটা উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসেনি, এসেছে একটি সংবেদনশীল হৃদয়ের সন্ধানে—যে তাকে বুঝবে, যে তাকে চিনবে। প্রেমটা তার আসমানতারার জন্য নয়, প্রেমটা তার নিজের কবিতার জন্য। সে নিজে নিজের রচনার প্রেমে পড়েছে, আর এক জনকে ফেল্‌তে চায়। এখানে তার ব্যক্তি-দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই; কিন্তু তার সত্তার প্রকাশ, একটি আনন্দের উদ্বেগাকুল প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্ক। কবিতার যদি নিজস্ব কোন চেতনা থাকতো তবে হয়তো সেই মুহূর্তে ভূষণ খাঁর হাতের মুষ্টির মধ্যে একখণ্ড একান্ত ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টি হিসাবে চমনলালেরই মত চঞ্চল চিত্তে দোদুল্যমান হত—কিন্তু তা তার নেই।

ভূষণ গাড়ী থেকে নামল। যে গৃহ সে প্রথম দেখল তা দেখে চমনলাল একটু আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু গৃহের বহিরাকৃতি মোটেও নতুন আগন্তুকের নজরে পড়ল না। তার সম্পর্ক গৃহকে নিয়ে নয়, গৃহীকে নিয়ে। আবার গৃহীর সঙ্গে দেখা হলে বা গৃহিণীর সঙ্গে কিম্বা গৃহ অধিকারিণীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে তার দেহকে নিয়ে নয়, তার অন্তর নিবাসিনী একটা শিল্প-সত্তাকে নিয়ে। ভূষণের লোভ সেইখানে। সুতরাং গৃহের কথা মোটেও তার মনের মধ্যে স্থান পেল না। সে গিয়ে বরাবর দোরের সামনে দাঁড়ালো—আর গৃহাভ্যন্তরের অধিবাসিনীকে জানাবার জন্য তার দরওয়াজার কড়া নেড়ে দিল। চমনলাল হলে কিন্তু আশ্চর্য্য হত বাঈজীর গৃহের সম্মুখে দারোয়ান না দেখে। কিন্তু ভূষণ বাঈজীদের সঙ্গে পরিচিত নয়। নৃত্যব্যবসায়িনী বিশেষ কোন নারীজাতিকে সে চেনেও না। সে আসমানতারাকে দেখেছে শিল্পীরূপে, বাঈজী রূপে নয়।

শব্দ শুনে একজন পুরুষ বেরিয়ে এল।

তাকে দেখলে চমনলালের মনে অন্য কোন প্রশ্ন দেখা দিত এবং দিয়েছিলও—কিন্তু ভূষণের মনে কোন প্রশ্ন দেখা দিল না।

—কাকে চাই? সেই পুরুষ ব্যক্তিটি প্রশ্ন করল।

ভূষণ জানালঃ আমি আসছি গৌড়ের দক্ষল দরওয়াজার কাছ থেকে।

—আপনি কে?

—আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, নাম ভূষণ খাঁ।

তার ইতস্ততঃ ভাবটা ভূষণের নজরে পড়ল কি না কে জানে। কিন্তু সে আবার জিজ্ঞেস করল—আসমান আছে?

—হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আপানর কি প্রয়োজন?

ভূষণ বললঃ প্রয়োজন বিশেষ কিছু নেই।

লোকটি বললঃ তাহলে দেখা হবে না। এটা দেখা করবার সময় নয়। আপনি বোধহয় ভুল করেছেন।

ভূষণ তাকাল লোকটির দিকে ঃ ভুল! কেন এই আসমানতারাই কি কাল বুরহানের নাটমহলে নাচতে যায় নি?

লোকটির সন্দেহ হল। আবার তাকালো সে ভূষণের দিকেঃ কেন বলুন তো? আপনিও সেখানে ছিলেন না কি?

—হ্যাঁ, ছিলুম। আসমানই আমাকে এখানে আসতে বলেছিল।

—আসমান!

—হ্যাঁ।

কি জানি, কি ব্যাপার! মাঝে মাঝে আসমানের অমন পাগলামি চাপে বটে। কিন্তু তাই বলে ভূষণের কথাও সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না। চমনলালকে সে যেমন ভেতরে বসতে বলেছিল একে তাও বলল না। বললঃ একটু দাঁড়ান, আমি আসমানকে খবর দিচ্ছি। কি যেন আপানার নাম?

—ভূষণ খাঁ।

—আচ্ছা আমি আসছি, লোকটি চলে গেল।

ভূষণ বাইরে দরওজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল।

ভেতর তখন আসমানতারা গুন্ গুন্ সুরে নিজের মনের মধ্যে কি যেন গানের একটা কলি ভাঁজছিল—এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যে কালে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা বাঈজীদের গর্বের বিষয়, আসমানতারা তখনো হিন্দুস্থানী সঙ্গীত চর্চা করতো না। বাংলা গানের উপর তার বিশেষ ঝোঁক। কেন? তার পিছনে ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস অনেকেরই কাছে অজ্ঞাত। অজ্ঞাত বলেই সাধারণ বাঈজী ভেবে অনেকে তার কাছে এমন সব প্রস্তাব তুলেছে যে, যাকে অন্যায় বলে তারা মনে করেনি। কারণ আসমানতারার মনের দিকে তারা তাকাতে পারেনি। পারা সম্ভবও নয়। সম্ভব নয় এই কারণে যে, মন দৃশ্যগত বস্তু নয় যা দেখা যায়। মনকে বুঝতে হলে মনের প্রয়োজন। মনকে দেখতে হলে মনোশ্চক্ষুর প্রয়োজন। বাঈজী পাড়াতে যারা চিত্ত বিনোদন করতে আসে—তারা মনের অধিকারী কেউ নয়। চমনলাল তাদের মধ্যে এক জন। তাই সে চিরাচরিত প্রথাতে বাঈজীকে কিনতে এসেছিল আজ। কিন্তু যে ব্যবহার সে পেয়েছে, কোনদিন বুঝি প্রত্যাশা

করতে পারেনি। আসমানতারার মুখের দিকে সে এমন একটা বোকার ভাব নিয়ে তাকিয়েছিল যে তা দেখেই আসমানতারা বুঝেছিল তার চমকটা কোথায়? আহা, বেচারি মনোক্ষুণ্ণ হয়েছে। সোনার মোহরের বিনিময়ে দু'দিন যে স্বর্গে সে বাস করতে চেয়েছিল—তা আর হোল না। হায়, আসমানতারা যদি তাই চাইতো তবে আজ এই দরিদ্র পরিবেশের মধ্যে তাকে বাস করতে হত না। কোন আমীর তাকে নিজের প্রাসাদ বিলিয়ে দিয়ে তার করুণা ভিক্ষা করত। হয় তো সে সুলতানের হারেমেও চলে যেতে পারতো। কিন্তু যাওয়া তার সম্ভব নয়, কেন নয় লোকে তা জানে না। জানেনা বলেই চমনলাল আজ আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে গেছে। সেই চমনলালের কথাই মনে পড়ছিল আসমানতারার। তার কথা মনে পড়ছিল, আর কখনো রাগ হচ্ছিল, আবার কখনো হাসি পাচ্ছিল। কি বিশ্রী লোকটা দেখতে! মুখের মধ্যে কেমন একটা বীভৎস ভাব। অথচ বলে কিনা—আসমানতারার সে প্রেমে পড়েছে। প্রেম কি লোকটা জানে কি? সাময়িক উন্মাদনাকে প্রেম বলে মনে করে। হায়, কি অজ্ঞ, আর কি দুর্বল লোকগুলো! নিজেদের পর্যন্ত চেনে না। প্রেম বুঝতে রাধার চিরজনম কেটে গেল—আর্ ওরা কিনা এক রাত্তিরেই প্রেমের স্বরূপকে উপলব্ধি করে ফেলল। ভাবতে মনের মধ্যে দমকে দমকে হাসি ফুটছিল তার। কতগুলো পাগল কুকুরের সঙ্গে এদের পার্থক্য কোথায়? প্রেম! প্রেম! কী আশ্চর্য্য! তাই সে নিজের মনেই গুন্ গুন্ করে গেয়ে উঠলঃ

জনম অবধি হম্ রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ানো না গেল।

সেই সময় গৃহের পুরুষ ব্যক্তিটি গিয়ে তার কাছে উপস্থিত হল।

পুরুষ ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, আসমানতারার কর্মচারী। আসমানতারা তাকে খাসনবিস বলে ডাকে। কেন তা সেই জানে। অবশ্য শুধু যে তার একজন মাত্র পুরুষ কর্মচারী আছে তা নয়। কজন বাঁদীও আছে। কিন্তু দারোয়ান এবং কর্মচারীর কাজ একহাতে করে বলে খাসনবিসকে আসমানের নিতান্ত প্রয়োজন। তাকে দেখেই আসমান গান বন্ধ করলঃ কি গো খাসনবিস সাহেব, আবার কেউ এল নাকি?

—হ্যাঁ, সে রকমই মনে হচ্ছে।

—কোত্থেকে?

—দক্ষিণ দরওয়াজা।

একটু যেন হেসে উঠবার চেষ্টা করল আসমান ঃ সে কি গো, একরাতের নাচ দেখেই পূর্বগৌড়ের লোকেরা পাগল হল নাকি!

খাসনবিস বললঃ সবাই পাগল হয়েছে কি না জানি না, তবে এবারের লোকটা যে পাগল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আসমান দুষ্টু হাসি হেসে বললঃ একটু আগে যে এসেছিল তার চেয়েও?

খাসনবিস বললঃ সে কথা হলফ করে বলা যেতে পারে।

—নাম কি মহাজনের?

—ভূষণ খাঁ।

ভূষণ খাঁ! নামটি শুনে যেন চমকে গেল আসমানতারা। একটু ভাববার চেষ্টা করল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে খাসনবিস বললঃ লোকটি বলছে আপনিই তাকে আসতে বলেছিলেন।

কেমন যেন একটা মৃদু আভা ফুটে উঠল আসমানের মধ্যে। আবার একটু কি ভাবল। সে মাটিতে বসে ছিল। যেন আলস্য ভাঙাল এমনই ভাবে মাটিতে দুটো হাতে ভর করে উঠে দাঁড়ালঃ হ্যাঁ,আমিই বলেছিলুম।

শুনে খাসনবিস একটু চমকিত হলঃ এই লোকটিকে আসমানতারা আহ্বান করবে কেন!

আসমান ধীরে ধীরে দরওয়াজার দিকে এগিয়ে গেল।

বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝি নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলছিল ভূষণ খাঁ।

বুঝি আবার সেই রূপকল্পনার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল সে। তার সন্তান সেকি আসমানেরও প্রশংসা অর্জন করতে পারবে?

এমন সময় আসমান এসে দরওয়াজার সামনে দাঁড়লোঃ এই যে কবি আপনি?

গতকালের দেখা আসমান আজ তার সামনে। একটা স্থির দৃষ্টি মেলে তাকে দেখে নিল ভূষণ খাঁ। তার কি মনে হল সেই জানে। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে যেন কেমন একটু সঙ্কোচে জড়িয়ে গেল। ঠিক এই সঙ্কোচের প্রশ্নটা যেন এতক্ষণ তার মনে উঁকি দেয়নি। সে একটু ইতস্ততঃ করে বললঃ 'আসলুম।' তার পরই আসাটা যে অন্যায় হয়েছে সেটা স্বীকার করার জন্যই তাড়াতাড়ি বলে ফেললঃ হয়তো বিরক্ত করলুম।

তার ভাব দেখে আসমান কি মনের মধ্যে কোন একটা করুণা অনুভব করল! চমনলালের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিতে যে মোহিনী রূপ ফুটে উঠেছিল—অথচ কণ্ঠে হৃদয়হীনা নারীর ঔদাসীন্য—ভূষণ খাঁর কাছে সে সব কিছুই হল না। শুধু একটা মধুর স্নিগ্ধ সুরে বললঃ মোটেই বিরক্ত হব না, আসুন।

তবু যেন ভূষণ খাঁ একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।

আবার সেই মধুর হাসি হাসল আসমানতারাঃ কই, আসুন, সঙ্কোচের কি আছে? আমিই তো আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছি।

ভূষণ বললঃ না, ঠিক সে জন্যে নয়।

আসমান বললঃ না, এখানে নয়, চলুন সব কথা ভেতরে গিয়ে শুনব।

ভূষণ ভেতরে প্রবেশ করল। ঘরটা ভাল লাগল। আসবাব পত্রের বাহুল্য নেই। চতুর্দিকে একটা পবিত্র ভাবের সঞ্চার। ঠিক যেন একটি বাঙালীর ঘর। এমনি ঘরে ভূষণ মানুষ। তাই এ ঘর তার ভাল লাগল। রিহানের ঘরে, বুরহানের ঘরে, চমনলালের ঘরে এমন একটি ঐশ্বর্য্যের চমক আছে যার সঙ্গে ভূষণ পরিচিত নয়। তাই তার ভাল লাগে না ওদের ঘর। নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করে সে। কিন্তু এ ঘর যেন তার পরিচিত পরিবেশ দিয়ে গড়া। অনেকটা সঙ্কোচ যেন মুহূর্তেই কেটে গেল তার। সে বিনা দ্বিধায় মৃত্তিকাতেই বসে পড়ল। প্রতিবাদ করে উঠল আসমানঃ একি, আপনি যে মাটিতেই বসলেন!

ভূষণ বললঃ তা হোক্ মাটীই আমার ভাল।

আসমান তার মুখের দিকে তাকালো। স্পষ্ট দেখল, যেন একটা তৃপ্তির ভাবই ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। সে আর কিছু বলল না। সেও মাটীর উপরেই বসে পড়ল।

মাটীর মানুষের মুখটাই যেন অন্যরকম, মাটীর একটা স্নিগ্ধতা রয়েছে সেখানে। আসমান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ভূষণ মুখখানা তুলতেই তার চোখে চোখ বেধে গেল। কেমন যেন একটা অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। কিছু একটা বলা দরকার তাই সে বললঃ জানেন, মাটীর চাইতে শ্রেষ্ঠ আসন আর নেই।?

আসমান মৃদু হাসল। বললঃ আমাকে আপনি বলবেন না—তুমিই বলবেন। আর তাছাড়া আমি বাঈজী, আমাকে সবাই তুমি বলেই ডাকে। নাচের আসরে টাকায় কেনা বাঁদী বই তো আমরা আর কিছু নই!

ভূষণ যেন আবার অপ্রস্তুত বোধ করল। সঙ্কুচিত হল। বললঃ না না আমি ঠিক....

আসমান তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললঃ জানি, আপনি আমাকে বাঈজী ভাবছেন না, এই তো?

ভূষণ আসমানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আসমান বললঃ কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আপনাকে কাল বাঈজী হিসাবেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

ভূষণের দুচোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল। সে আসমানের দিকে স্থির হয়ে তাকিযে থাকল।

আসমান বললঃ হ্যাঁ, সে কথাই সত্যি, আপনার সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন আছে। ভূষণ কোন কথা বলতে পারল না।

আসমান বললঃ আমি বাঈজী হলেও বাঙালা গান বড় ভালবাসি। নাচের আসরে বাঙলা ছাড়া গাইনে। আমার মা এদেশেরই মেযে ছিলেন কিনা। আপনি কবি, আমার গানের প্রয়োজন, নিত্য নতুন গানের। সেই স্বার্থেই আপনাকে ডেকেছি। জানেন তো বাঈজীরা স্বার্থ ছাড়া এক পা'ও অগ্রসর হয় না।

ভূষণ এবাব কথা বলল। বললঃ সে সব কথা কিছু জানি না। তবে বুঝেছি আপনি সমজদার। আরো বুঝেছি আপনি....

হঠাৎ তাকে যেন থামিয়ে দিল আসমান।

আশ্চর্য্য হযে ভূষণ তার মুখের দিকে তাকালোঃ কি?

—'আপনি' নয় 'তুমি'।

'ওহ্' একটুখানি হাসল ভূষণ। বললঃ আচ্ছা তাই হবে। আমি বুঝেছি যে তুমি শুধু সমাজদার নও, শিল্পীও। নইলে ঐশ্বর্য্যের আসরে দরিদ্র আমাকে অন্য কেউ হলে অবজ্ঞা করে তাড়িয়ে দিত। কীই যে ভাল লাগল তখন আমার, কি বলব! আমার মনের মধ্যে যেন আমি তখন নতুন প্রেরণা পেলুম। রাতে গিয়েই ভাবলুম, আর সকাল বেলাতেই লিখে ফেললুম।

—কি লিখলেন?

বহুদিনের সাধ ছিল মঙ্গল কাব্য রচনা করব। কিন্তু কাকে কেন্দ্র করে, ঠিক করতে

পারছিলুম না। এমন একজন দেবী তার কেন্দ্রস্থল হবে যে, আমার রূপকল্পনা তার মধ্যে সার্থকতা লাভ করবে। কাল তোমাকে দেখে আমার মনে হল, পেয়েছি। আর অমনি দেবী লক্ষ্মীকে আমার কাব্যের মূল কেন্দ্র করে নিলুম।

আসমানের কেমন কৌতূহল হল, বললঃ হঠাৎ আমাকে দেখে দেবী লক্ষ্মীর কল্পনা করলেন কেমন করে?

—লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যের দেবী। শুধু মাত্র ধন নয়, রূপেরও অধিকারিণী দেবী তিনি। কিন্তু কিছুতেই তার মনের মত রূপ আমি কল্পনা করতে পারছিলুম না। হঠাৎ তোমাকে দেখে মনে হল পেয়েছি—সে তোমারই মত। এই দেখ, কাগজখানা বের করতে লাগল ভূষণ।

আসমান তাকিয়ে দেখতে লাগল ভূষণকে। হায় সে জানে না, এই মুহূর্তে আসমানের কেমন সৌন্দর্য্যস্তুতি করল সে। এ বিষয়ে সে সচেতন পর্য্যন্ত নয়। তাই অমন কথাটা নির্বিকার বলে যেতে তার একটুও বাধল না। আসমান তার একটা প্রেরণা হয়েছে মাত্র, কিন্তু সে আসমানকে অতিক্রম করে এক দেহাতীত সৌন্দার্য্যের সন্ধান পেয়েছে। ভূষণ কাগজখানা খুলে মেলে ধরলঃ শোন।

পড়ুন।

ভূষণ পড়তে অরম্ভ করল।

আসমান দেখল সে খুশীর আনন্দে ডগমগ। এই খুশী কাকে নিয়ে? শুধু একটা কল্পনাকে নিয়ে! সত্যি এরা আশ্চর্য্য লোক। কবির শেখকেও সে দেখেছিল। তার গান আজো আসমান গায়। সেও এমনি পাগল ছিল। কতলোকে আসমনের রূপের প্রশংসা করেছে, কিন্তু সে পাশে থেকে একটি দিনের জন্যও আসমানের দিকে ফিরেও তাকায়নি। অথচ কী এক আনন্দে উদ্ভসিত হয়ে থাকত সে। ভূষণও যেন ঠিক তেমনি—আপনাতে আপনি মগ্ন।

ভূষণ পড়ে যেতে লাগলঃ

সিংহ জিনি মাজা খিনি তনু অতি কমলিনী।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি।।
কাজরে রঞ্জিত ধবনি ধবল নয়ন বর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥
ভূষণ খাঁয়ে ভনে অশেষ অনুমানি।
জগত ঈশ্বরী দেবী লক্ষ্মী কমলপাণি॥

পাঠ শেষে ভূষণ চোখ তুলে তাকালো আসমানের দিকে। এ দৃষ্টি কোথায়, কার দিকে আসমান জানে। এ দৃষ্টি তার কাছ থেকে কি খুঁজছে তাও সে জানে। এ দৃষ্টি শুধু নিতে জানে, দিতে জানে না। যা সে দেয়, নিজের অজ্ঞাতসারেই দেয়, সে তা জানেনা।

আসমান বললঃ খুব ভাল হয়েছে।

ভূষণের মুখের উপর দিয়ে একটা আনন্দের তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল।

—সত্যি!

আসমান জানে, একবারে সে তৃপ্ত নয়। সে চায় সহস্র লক্ষ বার তার কানের কাছে কেউ বলেঃ সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি.....।

—হ্যাঁ, সত্যি।

তা শুনে রৌদ্রদগ্ধ পথিক বৃক্ষছায়া পেলে যেমন একটা স্নিগ্ধ স্বাদ অনুভব করে আরাম সূচক শ্বাস ত্যাগ করে, ভূষণও তেমনি একটি ভাব করল। মনে হল যেন একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ স্থির সায়রেব জলে পড়ে দেহের জ্বালা জুড়ালো। হ্যাঁ, এ এক রকমের যন্ত্রণা বইকি। এ এক রকমের আগুনের দহন। আকাঙ্ক্ষার আগুনে মর্মের দহন। একমাত্র প্রশংসার শীতল বারি পেলেই তা শান্ত হয়। সেই বারি আসমান সিঞ্চন করেছে, তাই ভূষণ খাঁ শান্ত।

ভূষণের মুখের মধ্যে একটা শিশুর প্রশান্তি ফুটে উঠল। সে বললঃ এরই জন্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। নইলে রিহান বা বুরহানের কাছে যেতুম। ওরা কাব্যের মর্য্যাদা বোঝে না। কবিতাকে একটা বিলাসের জিনিস বলে মনে করে। কবি ওদের কাছে দাঁড়ের ময়না। বসিয়ে রেখে গান শুনতে ওদের আনন্দ। কিন্তু যা না পেলে কবির অন্তর শান্ত হয় না সেই হৃদয় ওদের নেই। ওরা আমাকে কৃপা করে, কিন্তু ওরা আমাকে বোঝে না। বুঝতে চায় না। বুঝতো জালাল—কিন্তু সে আজ বহুদূরে। সত্যি, জলালের বদলে আমি তোমাকে পেয়েছি।"

শুনে মনে মনে একটু হাসল আসমান। অপূর্ব তুলনা। নারী পুরুষের মধ্যে ভেদ নেই। জালালও এর কাছে যা, আসমানও তাই। এই জাতটাকে আসমান বুঝতে পারে না। কবিব শেখকে সে চিনেনি। কিন্তু আর এক কবির শেখকে চিনবে বলেই সে ভূষণ খাঁকে ডেকেছে।

আসমান বললঃ কিন্তু কবি, একটি কথা—

আগ্রহে উজ্জ্বল হল দুটি চোখ ভূষণ খাঁর। বললঃ বল।

—আপনি মঙ্গল কাব্য লিখছেন কেন?

—তাই তো লেখে এখন সবাই।

—সবাই লিখবে বলে আপনাকেও লিখতে হবে? আর দেবী বন্দনাই কেন? আপনার চতুর্দিকে এই যে মানুষ, এদের কথা আপনার মনে পড়ে না?

—মঙ্গল কাব্যে তো মানুষের কথাই বলা হয়। আমিও বলব।

আসমান বললঃ সে যেন কেমন। চতুর্দিকে মানুষ দেখে, মানুষের কথা লিখবেন ইনিয়ে বিনিয়ে, সে যেন কেমন। তার চেয়ে নিজের কথা লিখুন, নিজের কথা লিখতে গিয়ে আপনাআপনিই যে মানুষের কথা এসে পড়বে—সেই ভালো। সেখানেই দেখবেন সত্য ফুটে উঠবে।

ভূষণ বললঃ কিন্তু কাব্য ঐশ্বর্য্যের, রূপ-কল্পনার। সেই ঐশ্বর্য্য আর রূপ-কল্পনার কোন কেন্দ্র না থাকলে সৌন্দর্য্য ফুটবে কি করে? আসমান বলল: হায় কবি! ঐশ্বর্য্য আর সৌন্দর্য্য কাকে বলছেন? সোনা-রূপা, হীরা-জহরৎই কি ঐশ্বর্য্য। রূপ কি শুধু চোখ মুখ নাক আর কান?

ভূষণ যেন কেমন আশ্চর্য্য হয়ে আসমানের দিকে তাকালোঃ তা হলে ঐশ্বর্য্য কি? রূপ কি?

আসমান বললঃ ঐশ্বর্য্য হল হৃদয়। সৌন্দর্য্য হল হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের অনুভব।

—একটু বুঝিয়ে বল।

আপনি বিদ্যাপতির পদাবলী পড়েছেন?

—পড়েছি

—ঐশ্বর্য্য আর রূপের অভাব আছে সেখানে?

একটু ভেবে ভূষণ বলল, না।

—তা হলে?

ভূষণ বললঃ বিদ্যাপতিও রূপ-কল্পনার জন্য শ্রীরাধিকাকে বেছে নিয়েছেন।

কেন যেন হাসল আসমান। বললঃ আপনার কি মনে হয় বিদ্যাপতির রাধিকা বৃন্দাবনের রাধিকা?

ভূষণ কি একটু ভাববার চেষ্টা করল। তারপর আশ্চর্য্য হয়ে আসমানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আসমান বললঃ এ রাধিকা যে তার মনেরই ভাববিলাস মাত্র, নিজের মনের বহু উদ্বেলিত ভাবের আত্মপ্রকাশ মাত্র। "জনম অবধি হম রূপ নেহারলু, নয়ন না তিরপিত ভেল", একি সেই রাধারই মনের কথা?

ভূষণের মনে হলোঃ তাই তো! এতো কোন নায়িকা-কেন্দ্রিক নয়। নায়িকাকে কেন্দ্র করে বিদ্যাপতিরই মনের কথা।

আসমান বললঃ পদকর্তারা এত মধুর কেন জানেন? তাদের কবিতা এত মধুর এই কারণে যে, শ্রীরাধিকা তাঁরা নিজেরাই। রাধিকার কথা তাদের নিজেদেরই কথা। কিন্তু মঙ্গল কাব্যের কবিরা বাইরের বর্ণনা নিয়ে বেশী ব্যস্ত। রূপকে ফুটিয়ে তোলাতেই বেশী আগ্রহী। কিন্তু সত্য যে নিজের মন, সেই মনকে ফুটাতে না পারলে হয়!

ভূষণ আশ্চর্য্য হয়ে আসমানতারার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার বন্ধুরা আজ পর্য্যন্ত একথা তাকে কেউ বলেনি।

আসমান বললঃ বাইরের রূপও লাগে না, বাইরের ঐশ্বর্য্যেও লাগে না, মনের কথটা বলতে পারলে তাই এত মূল্যবান হয় যে, মণিমুক্তা হীরাজহরৎকে তা অতিক্রম করে যায়। কবীরের দোঁহা পড়েছেন নিশ্চয়ই আপনি?

—পড়েছি

—কবীর কহেছেনঃ—

বাগো না জায়ে নাজা
তেরে কায়ামে গুলজার।"

পুষ্পরস উপভোগ করবার জন্য, ফুলবনে যাবার প্রয়োজন আছে কি? নিজের মনের মধ্যেই ফুলের ভীড় রয়েছে। সেই বনই শ্রেষ্ঠ। ঐশ্বর্য্যের জন্য লক্ষ্মীকে ধরতে হবে,

এ কেমন কথা কবি? রূপ-কল্পনার জন্য রূপসী রমণীর প্রয়োজন? এই বা কেমন কথা। সৌন্দর্য্যটা কি নারী? না নারীকে দেখে মনের মধ্যে যে অনুভবের শিহরণ জাগে তাই? সেই অনুভবের আবার রূপ আছে নাকি? তা অত্যন্ত সহজ, আবার তাই অত্যন্ত কঠিন। সেই অনুভবের এতটুকুও যদি বাইরে ফুটে উঠে, তবে তার চেয়ে বড় সুন্দর আর কিছু নেই। কবীরের ভাষার মধ্যে মুন্সীয়ানা কোথায়? কিন্তু ভাবের মধ্যে রস ভরপুর—তাই তা এত সুন্দর। সৌন্দর্য্যটা ভাবের ঘরেই বাস করে।

এ কথাগুলো যেন সবই সত্য। এ কথাগুলো যেন ভূষণের মনেরই কথা। তার নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল কিন্তু কেউ এতদিন তাকে প্রকাশ করে দেয় নি। মনে হল এই সত্য। সে এক মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকল। আসমান তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল।

ভূষণ বললঃ তুমি এত জানলে কি করে?

আবার যেন একটা নর্তকীসুলভ চঞ্চলতা ফুটে উঠল আসমানের মধ্যে। বললঃ আমি বাঈজী যে। জানেন তো আমাকে কাব্যপাঠও নিতে হয়?

ভূষণ বললঃ কার কাছে তুমি কাব্য পাঠ নিয়েছ? আমিও তার কাছে যাব।

আসমানের দৃষ্টির মধ্যে কেন যেন একটা উদাসীন ভাব ফুটে উঠল। মুহূর্তে সে কোন্ দূরে তাকাল। বিহ্বল হয়ে কি দেখবার চেষ্টা করল।

ভূষণ যেন কেমন একটু অধৈর্য্য, সেই গুরুর সন্ধান সে চায়। সে আবার বললঃ কার কাছে তুমি পাঠ নিয়েছ বল।

আবার আসমান যেন চকিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। কি ভাবল সে-ই জানে। বললঃ কার কাছে আবার, এই তো আপনার কাছেই।

—না, না, তুমি সত্য বল।

—সত্যই বলছি কবি।

একটু যেন আহত হল ভূষণ।

তা লক্ষ্য করে আসমান বললঃ সত্যি বলছি কবি, এই মাত্রই এগুলো আমার মনে এল। আপনার কবিতা শুনে মনে হল, কাহিনী লেখা আপনার হবে না। আসলে আপনি মনের কথা বলবার লোক। কেমন একটা গানের সুরে ভরে রয়েছে আপনার পংক্তি গুলো। আসমান অতি সুললিত কণ্ঠে নিজেই আবৃত্তি করে গেলঃ

"কাজরে রঞ্জিত ধবনি ধবল নয়নবর,
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর।"

নিজের মনের কথাটিই আসমানের সুললিত কণ্ঠে ফুটে উঠতে শুনে কেমন যেন এক আশ্চর্য গৌরববোধে ভূষণের অত্যন্ত ভাল লাগল। যেন ভূষণ নিজেই আসমানের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

আসমান বললঃ কবি, একটি অনুরোধ করব?

—বল।

—আপনি গান লিখুন।

—লিখব।

—আমাকে একটি করে গান আপনি উপহার দেবেন?

—দেব।

আসমান বললঃ আমি ফুল ভালবাসি না, ফল ভালবাসি না, শুধু গান ভালবাসি। আমার নিজের ভাষার গান।

ভূষণ বললঃ আসমান তুমি বাঙালী?

—আপনার কি সন্দেহ হয়?

—না, ওরা বলছিল কি না।

—ওরা কারা?

—আমার বন্ধুরা। ওরা বলছিল তুমি তুর্কী রমণী।

আসামান বলেছিলঃ ওরা আমার ইতিহাস জানেনা কি না!

—কি তোমার ইতিহাস?

কথাটা যে আসমান নিজেই বলেছে, এ তার খেয়াল নেই। ভূষণের কাছ থেকে প্রশ্নটা শুনতেই সে চমকে উঠলঃ ইতিহাস! কিসের ইতিহাস!

—এই যে তুমি বললে, তোমাব ইতিহাস!

—"ইতিহাস ! আমার!" হো হো করে হেসে উঠল আসমান।

—বাঈজীব আবার ইতিহাস হয নাকি? ইতিহাস তো বাজা বাদশার।

ভূষণ বললঃ কেন মানুষেরও তো ইতিহাস হয়।

আসমান বললঃআমি তো মানুষ নই।

একটু না হেসে পারল না ভূষণঃ তুমি তবে কি?

—আমি বাঈজী। আমি কোন জাতেব মধ্যেই নই। আমি জলের বুকে বুদ্বুদ, যতক্ষণ আছি, ততক্ষণই; নেই তো নেই। না, আমার কোন ইতিহাস নেই।

ভূষণ বুঝল ইতিহাস তাব আছে। অতীতের এক রহস্যময় ইতিহাস। সে ইতিহাস সে বলতে চায না। না বলুক, অতীত শুনে আর লাভই বা কি? অতীতে যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হযে গিয়ে থাকে বর্তমানে আর তাকে সংশোধন করা যাবে না। যা শুধু শুনাতেই হয়, যা শুনবার পর আব কিছু করবার থাকে না, তা শুনবার প্রয়োজন নেই ভূষণের। ইতিহাস অতীতের মধ্যেই থাক। ভূষণ আর এ বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখালো না।

ভূষণ কাগজখানা গুটিয়ে নিল। আজ তার বড় আনন্দ। একটি সংবেদনশীল হৃদয়ের সন্ধান সে পেয়েছে। একটি রুচিবান মনেরও সন্ধান পেয়েছে সে। সে বাঈজী কিম্বা সাধারণ নারী, সে পুরুষ কিম্বা মহিলা, এ প্রশ্ন তার মনে নেই। সে একটি হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছে। এই হৃদয়ের সান্নিধ্যই সে এতদিন খুঁজছিল। সে আজ ধন্য। কাগজটা গুটিয়ে নিয়ে সে আসমানকে বললঃ তোমার কথাই সত্যি আসমান। এখন যেন আমার

মন বলছে, মনের কথা আহরণ করে সাজানোই কবির মুখ্য কাজ। এতদিন ভুল পথে পরিচালিত হয়েছি। আমার বন্ধুরা একথা বলেনি। তুমি সত্য পথের নির্দেশ দিয়েছ।

আসমান বললঃ আমি কিছুই বলিনি। আপানাকে আমি যতটুকু বুঝলাম তাই থেকে বলেছি। আমি না বললেও হয় তো আপনি একজন পদকর্তাই হতেন।

ভূষণ বললঃ ভগবান জানেন। কিন্তু আজ আমি উপকৃত হলুম।

ভূষণ কথা বলতে বলতে খাসনবিস সাহেব সেখানে এল। সে আসমানতারার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করল বাবু কখন যাবেন ? বেলা অনেক হল কিনা।"

কথাটা শুনে লজ্জিত হল ভূষণ। উঠে দাঁড়ালো। বললঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক বেলা হয়ে গেছে, আমি চললুম।

বেলার কথা আসমানেরও খেয়াল ছিল না। আর একজন লোক যে অস্নাত, অভুক্ত তার ঘরে বসে কাব্যালোচনা করে যাচ্ছে, একথা তারও খেয়াল হয়নি। খাসনবিসের কথা শুনবার পর ভূষণের দিকে তার দৃষ্টি গেল। মুহূর্তে সে বুঝতে পারল ভূষণ অস্নাত। অস্নাত এবং অভুক্তও সে।

আসমান বলল ঃ এই দেখুন, আপনি অস্নাত, অভুক্ত, এতক্ষণ আমার খেয়াল হয়নি। আপনি এই অসময়ে কোথায় যাবেন, তার চেয়ে বিশ্রাম করুন কবি।

ভূষণ বললঃ না, যাই।

আসমান বললঃ—হ্যাঁ, তা একটু আপনার অসুবিধা বৈকি, আমি বাঈজী—গোত্রহীনা। অপনি ব্রাহ্মণ সন্তান, আমার এখানে জল স্পর্শ করা আপনাব পক্ষে সম্ভব নয়।

কথাটা যেন ভূষণের মনে লাগল। ফিরে তাকালো সেঃ না, না, আসমান তুমি ভুল বুঝেছ।

আসমান বললঃ তা হলে ঘরে গৃহিণী নিশ্চয়ই আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন ?

একটু লজ্জা পেল ভূষণ। বললঃ না আমার গৃহিনী নেই।

একটু কটাক্ষ টানলো চোখে আসমানতারা, বললঃ দুর্ভাগ্য বলতে হবে। যা হোক মা নিশ্চয়ই ভাবছেন ?

—না, আমার মাও নেই।' ভূষণের চোখে কেমন একটা অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠল।

হঠাৎ যেন আসমানের বুকটার মধ্যেই একটা চমক লাগেঃ তাহলে! তাহলে কে আছে আপানার ?

—কেউ নেই।

—আপনি একা ?

—হ্যাঁ।

উঠে দাঁড়ালো আসমান। বললঃ তা হলে আপনাকে যেতে দিতে পারিনা। আমি বরনারী নই বটে, কিন্তু আমার ব্রাহ্মণ পাচক আছে। আপনার কোন কষ্ট হবে না, আপনি বসুন।

ভূষণ বলল: আসমান, জগতে আমার কোন বন্ধন নেই, কোন সংস্কার নেই, কোন জাতও নেই। তুমি প্রশ্নটা মিথ্যেই তুলছ।

আসমান বলল: তাহলে আপনি থেকে যান।

—না, থাকবার যে উপায় নেই। কিন্তু তুমি যে জাতবিচারের প্রশ্ন তুলেছ আমার তাও নেই। তুমি একটু কিছু আমাকে নিজে হাতে এনে দাও, আমি খাব। আমি ক্ষুধার্ত। কিন্তু থাকবার উপায় নেই।

আসমান বলল: কেউ নেই যদি, তবে পিছু টান কেন?

ভূষণ বলল: তবু আমার একজন আছে।

আশ্চর্য হল আসামান: কে?

—একটি কুকুর। ছোট বেলা থেকে আমাকে আশ্রয় করে আছে। আমি না গেলে সে অভুক্ত থাকবে।

অন্য কেউ হলে এতক্ষণ হেসে উঠত। কিন্তু আসমান হাসল না। আসমান বাঈজী হতে পারে, কিন্তু সে বাঈজী হবার জন্যই তো জন্ম গ্রহণ করেছিল না। তার মধ্যে যে একটা শিল্পীর অন্তর ঘুমিয়ে আছে। সে তাই আর কোন বাধা দিল না। বলল: তা হলে 'না' বলব না। কিন্তু আপনি একটু জল গ্রহণ করে যান।

ভূষণ বলল: দাও।

আসমান চকিতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তারপর কিছুকাল পরে মধুমিশ্রিত এক বাটি দুধ নিয়ে ফিরে এল। ভূষণের হাতে সে দুধের পাত্রটি তুলে দিল।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে যেন ভূষণ সেই গো-দুগ্ধ পান করতে লাগল। পান শেষ হলে, আসমান বলল: যাক দুধের কোন জাত নেই। আমার হাত থেকে খেয়েছেন বলে জাত যাবে না।

ভূষণের দুই চোখে যেন একটা বেদনার আভাষ ফুটে উঠল। সে একটা করুণ দৃষ্টিতে আসমানের দিকে তাকাল। আসমান সে দৃষ্টির অর্থ জানে। বলল: না, আমার অন্যায় হয়েছে কবি।

ভূষণ বলল: এবার তাহলে যাই?

—যাই নয়, আসি। আবার আসবেন।

ভূষণ বলল: নিশ্চয়ই আসব। কবিতা লেখা হলেই আসব। তোমাকে দেখাতে পারলে আমার ভারি আনন্দ হবে।

আসমান মুখে হাসির দীপ্তি টেনে বলল: আসতেই হবে। এইমাত্র শর্ত করালুম না রোজ আমাকে একটি করে গান দিতে হবে?

যেন ভূষণ অভিভূত হয়ে গেল। বলল: দেব, নিশ্চয়ই দেব।

আসমান জিজ্ঞাসা করল: আবার কবে আসবেন?

—যখনই লিখব।

—'হ্যাঁ। আর একটি কথা, শুধু এমন সময়ই আসবেন।' কেন যে এ সময়—আসমান তা জানে। কিন্তু ভূষণ তা বুঝল কি না কে বলবে।

ভূষণ বাইরে গিয়ে এক্কায় চাপল। ব্যস্ত গাড়োয়ান মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে ঘোড়ার

পিঠে চাবুক কষল। ঘোড়া ছুটে চলল। যতক্ষণ দেখা যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আসমানতারা। আর গাড়োয়ান মাঝে মাঝে ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগল ভূষণ খাঁকে। গৌড়ে এ পোষাকের মানুষগুলোকে সে চেনে। এরা ব্রাহ্মণ, এরা দরিদ্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখানে এ কেন? গাড়োয়ান ভেবেছিল লোকটা কাণ্ডজ্ঞানহীন। মুহূর্ত আগে শেঠজী যেখান থেকে একটা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে গেছেন, সেখানে এ কে? কিন্তু যেন মন্ত্রবলে সেই বাড়ীটাকেই জয় করে এসেছে লোকটি। এতক্ষণ শেঠজীও থাকতে পারেন নি। কি এক পরম প্রাপ্তির স্পর্শে ভরে আছে এ মুখটি। অসাধ্য সাধন এ করল কি করে! কৌতূহল চাপতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করলঃ জনাব এ বিবি কে?

—আসমানতারা।

—আপনার কেউ হন?

যেন একটা অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিল ভূষণ খাঁঃ হ্যাঁ।

—ওহ্, তাই! নইলে এমন সম্ভব হোত না। গাড়োয়ান ভাবতে থাকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎই আবার তার মনে প্রশ্ন জাগে, একটা বাঈজীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের সম্পর্ক! কোন দিন ছিল কি? হয় কি? হবে কি? দূৎ, এ যেন কেমন হেঁয়ালী। কি জানি কেমন সম্পর্ক। পিরীতি! কি জানি! শেঠজীর সোনার মোহর ফেলে গরীব ব্রাহ্মণের উপবীত দেখে ভুলবার মত বাঈজী থাকতে পারে কি না সে কথা গাড়োয়ানের জানা নেই। সে আরো জোরে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল।

অপরদিকে আসমানতারা ঘরে ঢুকেই নিজের দেহকে এলিয়ে দিল, পালঙ্কে নয় মাটির উপরেই। কি এক হারানো কথা মনে পড়ে জলভারে সিক্ত আকাশের মত তার স্মৃতির দিগন্ত জুড়ে মেঘ নেমে এল যেনঃ কবির শেখ কি এমনি ছিল না! সে আজ কোথায়? আরো বহু কথাই যেন কুয়াশার মত স্মৃতিকে ঘিরে মনের উপর লেপ্টে বসতে লাগল। সেই বহুদিন পূর্বের ছোট একটি আমবাগানে ঘেরা গৃহের কথা মনে পড়ল তার। তার মায়ের মুখ মনের মধ্যে ভেসে উঠল। তারপর তার বাবার কথা। সেই মুহূর্তে পাঠান আলাউদ্দিন খাঁর দুর্দ্ধর্ষ চেহারা। একদিনের সেই লুণ্ঠনের ইতিহাস। তারপর....! তারপর সেই প্রাসাদ। তারপর সেই বিলাস। তার মায়ের কান্না। তারপর আবার পথ। তারপর কি করে একদিন আবার হারিয়ে যাওয়া। মালিকান বিদরুন্নিসা। তারপর তার নৃত্যের ইতিহাস। একটি কৃষ্ণশ্মশ্রু ওস্তাদ যুবক। তার কবিসত্তা। তার সেই গানের চমক—কাব্যের উদার ব্যাপ্তি। বাঙলা গানের হাতেখড়ি। তারপর? তাকে বুঝতে না পারার বেদনা। রহস্যের সেই মধুরতা। কিন্তু...! হঠাৎ আবার সে শিউরে ওঠে—একটি রক্তাক্ত ছুরিকা। সে কথা মনে পড়তেই যেন চিৎকার করে উঠে সে—না, না, না,। না, ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই। প্রতিশোধ নেবে সে এই সমাজের উপর। নেবে, নেবে, নেবে। কিন্তু, কিন্তু, আবার তবে ভূষণ খাঁ কেন? কাঁদতে ইচ্ছে হয় আসমানের। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ছয়

"বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।"

সূর্য্যটা পশ্চিম আকাশের গায়ে ঢলে পড়েছে। পূবে আমবাগানের সবুজ পাতার উপর বক্তরশ্মিপাত হয়েছে। আবার সেই লোটন বিবির কমল সরোবর থেকে দাক্ষিণের বাতাস ভেসে আসছে। দক্ষল দরওয়াজায় লোকের ভীড় হয়েছে। কিন্তু তার চত্বরে একা নীরবে বসে আছে চমনলাল। কেন? সে কি কবি হল নাকি! তার মুখটা গম্ভীর, অন্তরে যেন একটা কিসের সংগ্রাম চলছে। কিসের সংগ্রাম? হ্যাঁ, সংগ্রাম একটা চলছিল, সে সংগ্রাম তার বিশ্বাস আর প্রাপ্তির মধ্যে সংঘাতের সংগ্রাম। বহু নর্তকী, বহু বারবনিতাকেই উপভোগ করেছে চমনলাল। অর্থের শক্তিতে কি সম্ভব নয়! সবই সম্ভব। একজন বিত্তবান শেঠনন্দনকে আজ পর্যন্ত কোন নর্তকী অবহেলা করতে পারেনি। দুলারীবাঈ তাকে পাবার জন্য কি চেষ্টাই না করেছিল। রূপের অভাব তারও কি ছিল? না। রূপ তারো ছিল। কিন্তু এতটা রহস্যের আবরণ ছিল না। দেহ তার পুষ্ট ছিল, রঙও তার উজ্জ্বল ছিল। তবু যেন কিছুর অভাব ছিল। একই আকাশে কখনো সূর্য্য কখনো চন্দ্র উঠে। দুইই আলোর বৃত্ত। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে চন্দ্রকে ভাল লাগে। এ দুইয়ের ক্ষেত্রে কতকটা তাই। দুজনেই সুন্দরী। কিন্তু তবু কেন যেন স্নিগ্ধ আকর্ষণ আছে আসমানতারার। হ্যাঁ, বিশেষ কোন একটি গুণের জন্যই তার মধ্যে এই আকর্ষণের সৃষ্টি। সেই গুণ চমনলালের কাছে অজ্ঞাত। কারণ অজ্ঞাত হোক, তবু সে আকর্ষণ বোধ করেছে। কিন্তু আসমানতারা তার কোন মূল্যই দেয়নি।

সে যদি তুর্কী আসমানতারার মত তাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিত, চমনলালের কিছু বলবার ছিল না। তা হলে নর্তকীর স্বরূপটা সে চিনতো। তুর্কী নর্তকীর স্বরূপটা মুহূর্তেই চমনলাল আবিষ্কার করে ফেলেছিল। তার দুর্বলতা কোথায় তা এখন জলের মত স্বচ্ছ তার কাছে। কোন্ পথে কি ভাবে তাকে জয় করতে হবে, তা সে জানে। প্রয়োজন হলে তাকে অঙ্কশায়িনী করতে খুব বেশী সময় লাগবে না তার। কিন্তু এ আসমানতারা! আভিজাত্যের গৌরবে জাতি বিচার করে সে তুর্কী রমণীর মত চমনলালকে আঘাত হানেনি। স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা করে নিয়েছে, বসিয়েছে, কথা বলেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কত সহজে তার ভালবাসার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অর্থের লোভ কত নিস্পৃহ ভাবে সম্বরণ করেছে। ঔদাসীন্যটাই তার সব চাইতে বড় অহংকার। অহংকারের যে হুল সে চমনলালের গায়ে ফুটিয়েছে, তার যন্ত্রণায় এখনো চমনলাল জ্বলছে। সেই

কথাই বন্ধুজনের মধ্যে এসেও দক্ষল দরওয়াজার চত্বরে বসে একাকী ভাবছে চমনলাল। ভাবছে পরাজয়ের কথা, ভাবছে আসমানতারার কথা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই ব্যর্থতার পরেও ভীষণ একটা রাগ হয়নি আসমানতারার উপর। শুধু তার জন্য আকর্ষণটা আরও প্রবল হয়েছে। তাকে পেতে ইচ্ছে করছে। অথচ অন্য কোন নর্তকীর জন্য আজ পর্যন্ত এমন কোন দুর্বলতা তার দেখা দেয়নি। ইয়ার-বন্ধুদের বাদ দিয়ে কখনো নর্তকীগৃহে যাওয়া যায়, মন চায়, চমনলাল ইতিপূর্বে ভাবতেই পারেনি। কিন্তু আসমানতারা তার মনের মধ্যে এক নতুন ভাবের সঞ্চার করেছে। একে রাখাও যায় না। রহস্যের মর্মার্থ উদ্ধার করা না গেলে মনে শান্তিও আসে না। উদ্ধাবেব চেষ্টা করতে গেলে সমস্যা আরো বাড়ে, আরো জট পাকাতে থাকে। সেই সব জটিল গ্রন্থি খুলতে মনের মধ্যে কল্পনার জটলা চলছে চমনলালের। তাই সে বহু ভীড়ের মধ্যে থেকেও দক্ষল দরওয়াজার নীচের ধাপে বসে একাকী আত্মমগ্ন।

চমনলাল কল্পনাপ্রবণ নয়, কবিও নয়, দার্শনিকও নয়। সাধারণ বাস্তব জগতের জ্ঞান-বিচার দিয়ে তৈরী মানুষ। কিন্তু জীবনে সাধারণ মানুষেরও কখন এমন সময় আসে যখন সে কল্পনার রঙিন স্বপ্নজাল বুনতে চায়, অত্যন্ত চিন্তাপ্রবণ হয়ে উঠে বা দার্শনিক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন ব্যাপাব ঘটে প্রেমে পডলে। তাহলে চমনলাল কি প্রেমে পড়ল নাকি?

হায! সহস্র নারীর অধরোষ্ঠ যে পান কবেছে, মদির কটাক্ষ যে আস্বাদ করেছে, মক্ষিকা'র মত ঘুবে বেড়াবাব স্বভাব যে তৈবী করেছে জীবনে, তারও আবাব প্রেম বলে কোন জিনিষ আছে না কি! বনের পাখী দাঁড়ে এসে বসতে চায়! সোনার পিঞ্জর হলেও বন্ধ হতে চায নাকি কেউ? প্রেমটাকে তো এতকাল বন্ধন বলেই মনে করেছে চমনলাল। উপভোগেব পথে এতবড প্রতিবন্ধক আব নেই। ভোগেব বাইরে জীবনের অস্তিত্ব কিছু নেই চমনলালের। তাহলে আবাব সে সীমাবদ্ধ হতে চাচ্ছে কেন? কেন এ প্রশ্নের উত্তর নেই। যার মনে এ প্রশ্নের প্রথম উদয হয, তিনিও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। যাকে জিজ্ঞেস করা হয তিনিও। যে প্রশ্নের উত্তর আছে, সেটা 'কেন'র নয়। সেইটেই সত্যিকারের 'কেন' যার উত্তর নেই। উত্তর নেই বলেই 'কেনর' পেছনে লোকে ছোটে, জগৎ চলে। আব বক্র ভঙ্গীতে বিদ্রূপ হেনে 'কেন'(?) তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেনটা একটা প্রাচীন বর্শার মত। মনের মধ্যে ঢুকলো তো মনটাকে গেঁথে ফেলল। তারপব বক্তপাত আব দাহ। দাহ চিতাগ্নির। তাকে টেনে সোজা করে 'দাঁড়িতে' পরিণত করতে না পাবলে অব্যাহতি নেই। কিন্তু সেই অব্যাহতিটা এত ঋজু, স্থির, নির্বাক যে, সেটা সহজে কেউ চাইতে পাবে না। যেন একটা স্মৃতিফলক, শ্মাশনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। জ্বালা থাকে থাকুক, তবু বঙ্কিম এই চিহ্নটিই ভাল। সহজ সরল, নিষ্প্রাণ স্থির হয়ে যাবাব চাইতে ভাল। বঙ্কিম পথেই ঝর্ণার গতিটা ভাল। চমনলালের মনের ঝর্ণা সেই বঙ্কিম প্রশ্নবোধক চিহ্নটির উপব দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বয়ে যাচ্ছে দ্রুত। ঝর্ণাধারা যে মাটিব উপব দিয়ে যায, সে মাটি কিন্তু স্থিরই থাকে। তেমনি চিন্তা-স্রোত মন-নদী হয়ে যে দেহের উপর দিয়ে বয়ে যায় সে দেহও স্থির থাকে। মজার ব্যাপার

এই যে, এখানে স্রোত যত প্রবল, দেহের স্থৈর্য্য তত বেশী। চমনলালও তাই স্থির হয়ে বসে আছে!

ভাবতে ভাবতে চমনলাল একটু আগেই এসে সেখানে বসেছিল। কিছুকাল পরে নিত্য অভ্যাস মত বুরহান আর রিহানও সেখানে এল। দক্ষল দরওয়াজায় এলে প্রথম তাদের যেখানে দৃষ্টি আটকায় তা হল দরওয়াজার সিঁড়ি। ওটা তাদের বড় প্রিয় জায়গা। ওখানে তারা এসে বসবেই। এবং অন্যান্য নাগরিকেরাও তাই স্থনটিকে চিহ্নিত করে ফেলেছে। তারা জানে, ও জায়গাটা কাদের জন্য, কারা এসে বসে ওখানে। স্থানটি শূন্য থাকলেও অপর কেউ এসে এখানে বসে না। রিহান আর বুরহান দক্ষল দরওয়াজায় এসেই সেই দিকে তাকাল। দেখল তাদের অনেক আগেই চমনলাল এসে সেখানে বসে আছে। কি যেন ভাবছে সে। একটা উদাসীন দৃষ্টিতে দূরে আম্রকাননের শীর্ষদেশে তাকিয়ে আছে।

রিহান কাছে গিয়ে ডাকল : এই যে দোস্ত্, তুমি যে আগেই আজ?

রিহানের কণ্ঠস্বর শুনে চম্‌কে ফিরে তাকাল চমনলাল্ : এই যে এস।

রিহান আর বুবাহান, ওবাও গিয়ে বসল সেই সিঁড়ির উপর।

রিহান চমনলালকে বলল : কিগো দোস্ত্ কি ভাবছ অত?

চমনলাল অস্বীকার করবার চেষ্টা করল : কই, না তো!

বুরহান বলল : না, তুমি ভাবছ। সকাল থেকেই আমি লক্ষ্য করছি। জালাল যখন বিদায় নিল তখনো তুমি এমনি বিমর্ষ ছিলে। কি হল বলতো?

রিহান বলল : আচ্ছা চমনভাই তুমি তখন নহবৎখনা থেকে ফেরবার সময় কোথায় গেলে বলতো? ফিরে তাকিয়ে তোমাকে আর দেখতে পেলুম না।

প্রশ্নটা শুনেই যেন একটু কেঁপে উঠল চমনলাল। লজ্জায় একটু রক্তাভ হবার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা আবার বীভৎস আকার ধারণ করল। চমনলাল কোন কথা বলতে পারল না। সে চুপ্ করে থাকল।

তার চুপ করে থাকা দেখে কেমন সন্দেহ হল বুরহান আর রিহান দুইজনেরই।

বুরহান বলল : চমন, আমরা সবাই একাত্ম দোস্তি করেছি। কারো কাছে কোন জিনিষ লুকানো কি উচিত হবে?

রিহান বলল : হ্যাঁ, দোস্ত্। যদি তোমার মনে বিন্দুমাত্র সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে তবে তা আমাদের বলা উচিত। আমরা কি এতটুকু সাহায্য তোমাকে করতে পারব না? কোন গোপন ব্যথার কথা বন্ধুর কাছে প্রকাশ করলে তার বেদনা হ্রাস পায়। তুমি বল।

চমনলাল যেন কি একটা বলবার চেষ্টা করল কিন্তু বলতে পারল না। বুরহান তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : বল।

তবু যেন চমনলাল বলতে পারল না।

রিহান বলল : ভাবির সঙ্গে কোন বিরোধ হল?

—না।

—তবে?

চমনলাল বলল : ও কিছু নয়, চল, আজকে কোন নাচের আসরে যাওয়া যাক।

বুরহান বলল ঃ সে কি গো? গৌড়ে ফিরে তোমাকে তো এর আগে নাচের জন্য ব্যস্ত হতে দেখিনি! আমার ভাবিজানকে ছেড়ে তুমি কোনদিন থাকতে পারনা।

রিহান বলল ঃ কিম্বা ভাবিজানই তোমাকে ছেড়ে দেন না। তবে তুমি এমন কি সমস্যার মধ্যে পড়লে?

চমনলাল কোন উত্তর দিল না।

বুরহান বলল ঃ শোন দোস্ত, তোমায় বলছি ঃ কাল নাচ দেখবার পর থেকে তোমার এমন হয়েছে। তবে কি তুমি আসমানতারা.....

নামটা শুনে মুহূর্তে রিহানেব বুকটা কেঁপে উঠতে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রিহান উচ্চ হাসির শব্দে সে দুর্বলতাকে কাটিযে উঠল। বলল ঃ তাই নাকি চমনভাই? তবে এটা আবার সমস্যা নাকি? প্রথমটা আমারও কেমন একটা ঘোর লেগেছিল। কাল রাতটা মাঝে মাঝেই ওর কথা মনে পড়েছে। হ্যাঁ, চোখ দুটো ভারি অপূর্ব বাঈজীর। আর ভাবটাও একটুখানি পৃথক। কিন্তু তাতে কি এসে যায়! হাজার হোক বাঈজী তো। ছো! ছো....কি, মন কেমন করছে বিবির জন্য? চল আজ না হয আব একবার ঘুরে আসা যাক্।

কেমন যেন বুকটা একটু কেঁপে উঠল চমনলালেব। বলল ঃ না, না।

—কেন?

—যদি যেতে হয, ওখানে নয। শুনেছি আসমানতারা নামে আর এক তুর্কী বাঈজী আছে গৌড়ে, তাব কাছে যাব।

রিহান আর বুরহান বলল ঃ ঠিক আছে, তাই হবে, চল।

রিহান বলল ঃ এ জন্য আবার এত ভাবনা। বাঈজী একটা কেন, প্রয়োজন হয় দশটা আনব। শত নটীব নাচ দেখব। ওদের জন্য আবাব ভাবনা ওদের জন্য আবাব চিন্তা আছে নাকি? ওরা তো উপভোগের বস্তু, টাকা দিয়ে কিনলেই পাওযা যায। মনের তো আর সম্পর্ক নেই! মনের প্রশ্ন হলে অবশ্য টাকার ক্ষমতার বাইরে ছিল। ঐ একটি জায়গা—যা অর্থ দিয়েও কিনতে পারা যায় না। আর মনের আমাদের দরকারই বা কি?

বুরহান বলল ঃ বিশেষ করে চমন ভাইয়ের। পদ্মাবতী ভাবিজান মনের শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

রিহান বলল ঃ হ্যাঁ, তা আর বলতে। নইলে দুলারীবাঈ তো গুজরাটে ক্রীতদাসী হয়ে পড়েছিল চমন ভাইয়ের। হতের তুড়ী মারলেই নৌকায় চেপে পাড়ি দিত বাঙলায়। এলনা কেন? মনের নৌকো নোঙর করার জন্য গেরাপির আর প্রয়োজন নেই—সে গোরাপি চমন ভাইয়ের ঘরেই আছে—গৌড়ের ঘাটে যেমন বড় বড় গোরাপি পড়ে আছে তেমনি।

কথাটা শুনে কেমন একটু না হেসে পারল না চমনলাল।

তা দেখে বুরহান বলল ঃ এই তো হাসি ফুটেছে দোস্তের মুখে।

তা দেখে বুরহান বলল ঃ নইলে উপায় আছে? গৌড়ে দুঃখ নেই, চিন্তাও নেই, ভাবনাও নেই। গৌড়ের অধিবাসী হয়ে মুখ ভার করে থাকলে চলে?

বুরহান বলল ঃ যথার্থ বলেছ দোস্ত্! তোমার কাছে কোন ফাজিল কথা শুনিনি কখনো।

এবার চমনলালেরও মুখ খুলল ঃ আমাদের জালালেরও ঐ গুণটা ছিল। সত্যি গৌড়ে ফিরে এবার সঙ্গসুখ পেলুম না ওর।

বুরহান বলল ঃ সেটা একটা দুঃখের কথা। আমাদের কয় বন্ধুর মধ্যে দীর্ঘ্যস্থায়ী বিরহ দেখা দেবে ভাবতে পারিনি কখনও।

চমনলাল বলল ঃ আচ্ছা, একটা আশ্চর্য্য জিনিস লক্ষ্য করলে?

—কি?

—জালাল আমাদের ভূষণকেই প্রশংসা করত বেশী, অথচ যাবার বেলা ওই এল না। জালালের নিশ্চয়ই লেগেছে?

রিহান বলল ঃ না, ভূষণকে ও চেনে।

চমনলাল বলল ঃ তা যাই বল, মনের মধ্যে ও নিশ্চয়ই আঘাত পেয়ে থাকবে। ভূষণকে ও সত্যি ভালোবাসতো।

বুরহান বলল ঃ তা যাই হোক, ভূষণ একেবারেই কেন এলনা সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

রিহান বলল ঃ আসমান ওর মাথাটাকেই ঘুরিয়ে দিল কিনা কে জানে। যাবার সময় কিনা আবার এতজনের মধ্য থেকে ওকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। কি মতলব আছে কে জানে?

কথা শুনে কেন যেন আবার চমনলালের বুকের মধ্যে একটা আঘাত লাগল। তার মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না।

বুরহান বলল ঃ আমার মনে হয় ওর কোন অসুখ বিসুখ করে থাকবে। চল দেখে আসি।

রিহান বলল ঃ চল দেখেই আসি। দেখি কার সন্দেহ সত্য।

বুরহান বলল ঃ চল।

ওরা দুজন আবার ফিরতে লাগল। চমনলাল ওদের সঙ্গে যাবে কি যাবে না, ভাবতে লাগল!

রিহান ডাকল ঃ কৈ চমন ভাই, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে?

চমনলাল বলল ঃ চল। কিন্তু তার বুকটা কেন যেন একটা অনাবশ্যক আশঙ্কায় দুলতে লাগল। কি জানি, যদি ভূষণ খাঁ নাই থাকে! তবে নিশ্চয়ই সে আসমানের ওখানে যাবে। ভূষণ খাঁ ঘরে না থাকলেই আসমানের ওখানে যাবে তার প্রমাণ আছে কি? আর যায়ই বা যদি, তাতে চমনলালের কি বলবার আছে? বলবার কিছুই নেই। সবটাই মনের খেয়াল। কিম্বা মন কিছুটা সত্য কথা বলে? কে জানে! প্রেমে পড়লে মনের মধ্যে অনেক সময় সত্য অনুভূতি আসে। চমনলাল কি সেই অনুভূতি লাভ করেছে?

রিহান, বুরহান আর চমনলাল অল্প সময়ের মধ্যেই ভূষণ খাঁর গৃহে এসে পড়ল। এককালে ভূষণ খাঁর পূর্বপুরুষদের অবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে বিলাসের যে রোগটি দেখা দেয়, ভূষণ খাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেই রোগটি দেখা দিয়েছিল। মদ আর নর্তকীর পেছনে তারা সব ব্যয় করে এক সময় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাদের

অবস্থা এতটাই পড়ে গিয়েছিল যে ভূষণ খাঁর বাবার রক্তের মধ্যে সেই অতীত দিনের একটা ধারা থাকলেও সেই বিলাসের তিনি আড়ম্বর আর রক্ষা করে চলতে পারেন নি। দরিদ্র জীবনিই তিনি যাপন করে গেছেন। সেই দরিদ্রের সন্তান ভূষণ খাঁও দরিদ্র। অধস্তন পুরুষে সুযোগের অভাবে সেই বিলাসের প্রবৃত্তি কমতে কমতে এসে একেবারে বুঝি শূন্যের পর্য্যায়ে ঠেকেছিল। তাই ভূষণ খাঁর মধ্যে তার এতটুকু আর লক্ষ্য করা যায় না। মদ বা নর্তকী কোন জিনিসের প্রতিই তার আকর্ষণ নেই। কিন্তু সে এক নতুন উত্তরাধিকার লাভ করেছে—শিল্পবৃত্তি। এটা যে সে কার কাছ থেকে পেল ভাগবান জানেন। নেশার মধ্যে ভূষণ খাঁর ছিল শুধু ঐটুকু।

ওরা এসে ভূষণের গৃহের কাছে দাঁড়ালো। বাড়ীটা বিরাট। তবে পুরাণো। স্থানে স্থানে ধ্বসে গেছে। কিন্তু একটা গাম্ভীর্য্যে ভরা। লক্ষ্মণ সেনের আমল থেকে ভূষণ খাঁ'রা এখানকার অধিবাসী। সেই পুরাণো ঐতিহ্যের অহংকারে বোধ হয় বাড়ীটা আজও গম্ভীর হয়ে আছে। গৌড়ের অন্যান্য গৃহের মত এই বাড়ীটাতে এখন আর আলোর মালা ফোটে না। কোথায় কখনো কোন নীরব কক্ষে একটি প্রদীপ জ্বলে, তার ম্লান আলোতে ভূষণ খাঁ কাব্য চর্চা করে।

তখন সূর্য্য ডুবে গিয়েছে। বড়ীটার মধ্যে অন্ধকারের ছায়া পড়েছে। তিন বন্ধু দুয়ার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। ভূষণের অনুগত কুকুরটি আগত অন্ধকারে তিনটি মূর্তিকে প্রবেশ করতে দেখে চিৎকার করে উঠল।

রিহান কুকুরটাকে ধমকে উঠল ঃ আরে থাম্, আমরা চোব নই।

এ কণ্ঠস্বব ভূষণের কুকুরটার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। তৎক্ষণাৎ সেই সারমেয় নন্দন লেজ নেড়ে আগন্তুকদেব অত্যন্ত কাছে এসে আব্দাবের ভঙ্গী কবতে লাগল।

বুরহান কুকুরটাকে বিদ্রূপ করে বলল ঃ হাউ-ও-ও ! হাউ-ও-ও !

ওরা আরো এগুলো। একটু এগুতেই দেখতে পেল, একটি কক্ষ থেকে মৃদু আলোর রশ্মি আসছে।

রিহান বলল ঃ তাহলে কবিবর বোধ হয় রয়েছেন।

বুবহান বলল ঃ নিশ্চয়ই, নইলে আর প্রেতপুরীতে আলো জ্বালবে কে ? সে কণ্ঠস্বর উঁচু করে ডাকল ঃ ভূ-ষ-ণ।

ভূষণ তখন সামনে মেলে-ধরা কাগজটার উপর চোখ বুলাচ্ছিল।

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠ শুনে উৎকর্ণ হয়ে দরজার দিকে কান ফেরাল।

বুরহান আবার ডাকল ঃ ভূ-উ-ষ-ণ।

ভূষর তাড়াতাড়ি তার কাগজ ফেলে উঠে দাঁড়ালো। ছুটে সে বাইরে এল। দেখল ওরা তিন জন দাঁড়িয়ে। এই যে তোমরা !

রিহান বলল ঃ দেখতে এলুম ভূষণ খাঁ আছে কিম্বা নেই।

ভূষণ তার স্বাভাবিক সেই মৃদু হাসিটি হাসল।

বুরহান বলল ঃ না দোস্ত্ কালকে আসমানতারা যে চমক দিয়ে গেছে তাতে এরকম মনে হওয়া অসম্ভব নয় !

চমনলাল কিন্তু কোন কথা বলল না। অকারণ, (কিম্বা প্রকৃত অর্থে সকারণ) এক ঈর্ষায় তাকিয়ে ভূষণ খাঁকে দেখতে লাগল।

ভূষণ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাল ঃ এস, বোস!

সবাই গিয়ে তার জীর্ণ বক্ষে একটা রঙিন মাদুরের উপর বসল।

রিহান বলল ঃ তা কি করছিলে দোস্ত্ এই নীরব ঘরে একা বসে?

—লিখছিলুম একটু।

—আশ্চর্য্য তোমার লেখা। লিখতে বসলে আর কোন দিকে খেয়াল থকেনা বুঝি?

আবার ভূষণ একটু মৃদু হাসল।

বুরহান জিজ্ঞাসা করল ঃ তুমি সকালে নহবৎখানায় গেলেনা কেন? জালাল তোমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ভূষণ বলল ঃ গিয়েছিলুম, কিন্তু একটু দেরী হয়ে গেল।

—সেকি গো, আমরা যে অনেকক্ষণ ছিলুম সেখানে।

—আমার যেতে একটু বেশী দেরী হয়ে গিয়েছিল।

—কেন, তোমার মনে ছিলনা আজ জালাল যাবে?

—ছিল, কিন্তু হঠাৎ লিখতে বসে কেন যেন একটু দেরী হয়ে গেল। কিছুটা সময় আর কিছুই মনে ছিল না। যখন লেখা শেষ হল উঠে দেখি বেলা অনেক। দৌড়ে ছুটে গেলুম, কিন্তু গিয়ে দেখি তেমরা সবাই চলে গেছে।

বুরহান রিহানের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ জালাল ঠিকই বলেছিল। তারপর সে ভূষণের দিকে ফিরে তাকাল। বলল ঃ সত্যি তোমরা আশ্চর্য্য জীবই বটে। তোমাদের কি কারণে এমন হয় কে জানে! তা এতক্ষণ কি কবিতা লিখলে দোস্ত্?

ভূষণের চোখে একটা উজ্জ্বল আগ্রহ ফুটে উঠল। বলল ঃ শুনবে?

—নিশ্চয়ই শুনব, নইলে এলুম কেন? কি লিখলে?

কীর্ত্তনের পদ।

রিহান বলল ঃ হঠাৎ কীর্ত্তনের পদ? কাল না বললে মঙ্গল কাব্য লিখছ?

ভূষণ একটু লজ্জা পেল। কি বলবে সে! আজকে সকালের কাহিনীটা বলতে কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করল। বলতে পারল না। সে শুধু বলল ঃ কি জনি, কেমন সব পাল্টে গেল।

চমনলাল আরো গভীর সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে ভূষণ খাঁকে দেখতে লাগল। বুরহান তা দেখে চমনলালকে বলল ঃ একি চমন তুমি একেবারে চুপ?

চমনলাল একান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল ঃ কাব্যে আমার মোটে আসক্তি নেই। আমি ব্যস্ত বিলাসে আর উপভোগে। প্রয়োজন হয় উপভেগের জন্য অর্থ ব্যয় করে যা ইচ্ছে তাই করি। বাইরের দৈন্য মনে মনে কল্পনা দিয়ে পূরণ করবার ইচ্ছে আমার নেই। কারণ অর্থের অভাব আমার নেই। দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটাতে চাইনে।

একটু যেন আঘাত পেল ভূষণ খাঁ। সে একটা করুণ দৃষ্টিতে চমনলালের দিকে তাকাল। বুরহান ভূষণ খাঁর পক্ষে এগিয়ে এল কারণ সে জানে লেখনী যাদের বাঙ্ময়, জিবে তাদের কথা থাকে কম।

বুরহান বলল ঃ তুমি এটা কি বলছ চমন ?

চমনলাল বলল ঃ ঠিকই বলেছি। ওর স্বপ্নের মধ্যে রমণীবিলাস। বাস্তবে ক্ষমতা নেই, স্বপ্নের মধ্যে মেয়েদের চুষে খাওয়া। আমার প্রয়োজন হয় অর্থ দিয়ে মেয়েমানুষ কিনে আনি। কাব্যের কি ধার ধারি আমি ?

বুরহান বলল ঃ চমনলাল তোমকে আমার বোঝাবার ক্ষমতা নেই। দুটি বিপরীত জিনিষের সঙ্গে তুলনা করছ তুমি—একটি স্থূল আর একটি বস্তুর অতীত। একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর একটি আতীন্দ্রিয়। তুমি জানো না যে রমণীকে কেন্দ্র করে ওদের কাব্য তা সেই পার্থিব রমণীকে অতিক্রম করে এক দেহাতীত সৌন্দর্য্যের রাজ্যে চলে যায়। সেখানে পার্থিব সৌন্দর্য্য, নর-নারী, কারও কোন মূল্য থাকে না আর।

চমনলাল বলল ঃ দন্তহীন বৃদ্ধ মাংসের চেয়ে মাসের নিংড়ানো রসকেই অধিক উপাদেয় বলে মনে করে। ব্যাপারটা সত্যিই তাই। দেহ যারা উপভোগ করতে পারে না তারাই দেহাতীত রসের সন্ধান করে। অক্ষমের ভাববিলাসে আমি নেই।

বুরহান বলল ঃ না থাকো ক্ষতি নেই। তবে আমি কিন্তু এখন একটু কাব্য-চর্চা করব। শুনব ভূষণ কি লিখেছে।

রিহান বলল ঃ আমারও ভারি আগ্রহ হচ্ছে।

চমনলাল বলল ঃ আপত্তি নেই, শোন। কিন্তু অন্যত্র যাবারও কথা আছে মনে রেখ।

—নিশ্চয়ই। ভূষণকে বাদ দিয়ে তো নয়!

বুরহান ভূষণকে বলল ঃ দোস্ত্ কি লিখেছে পড় শুনি ?

ভূষণ কাগজ খুলে পড়তে লাগল ঃ

"পন্থ পিছর নিশি কাজর কাঁতি—
পাঁতরে ভৈ গেল দীগ ভরাতি।
চরণে বেঢল অহি তাহে নাহি শঙ্ক
সুন্দরী হৃদযে নূপুর পবিপঙ্ক।
কি কহব মাধব পিরীতি তুহারী
তুয়া অভিসারে না জিয়ে বরনারী।।"

সত্যি এক নতুন রসের ইঙ্গিতে ভরপুর। ভূষণ খাঁর কলমে এ এক নতুন সৃষ্টি। বুরহান আবেগে ভূষণ খাঁকে জড়িয়ে ধরল।

রিহানও বলল ঃ সুন্দর দোস্ত্, সুন্দর!

চমনলালের নিষ্ঠুর আঘাতে ভূষণের কবি-মন যতটুকু ব্যথা পেয়েছিল মুহূর্তে যেন তা মুছে গেল। শিল্পীর এটুকু বড় গুণ। নইলে তাদের যে আবেগপ্রবণ মন আঘাতের প্রবলতায় তা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। তারা যেন ঠিক শিশু। এই মায়ের একটু তিরস্কারে কান্না জুড়ে দিল—আবার মুহূর্তে মায়ের আদরে কান্নার কারণ মন থেকে নিশ্চহ্ন করে দিল। এ না করতে পারলে প্রতি পদে তাদের কোমল অন্তরে যে আঘাত লাগে, সেই আঘাতের প্রবলতা তাদের নিশ্চহ্ন করে দিত। ভূষণ খাঁ প্রকৃত কবি, তাই মুহূর্ত কয়েক পূর্বে তার উপর আক্রমণের কথা আর তার মনেও থাকল না।

রিহান বলল ঃ আর একটি পড়।

আর একটি কবিতা পড়তে লাগল ভূষণ খাঁ ঃ

"বড় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি
যমুনা কুঞ্জ রহল বনয়ারী।
সুন্দরী মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ—
অহ অভিসারে দ্বিগুণাধিক রঙ্গ।

বুরহান উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠল ঃ দোস্ত্—তুমি সত্যিই পাল্টেছ। আহা জালাল যদি এ পদ শুনতে পেত!

ভূষণ অনুতপ্ত হয়ে বলল ঃ সত্যি, আমি দুঃখিত বন্ধু।

বুরহান বলল ঃ কিন্তু আমরা আনন্দিত।

বুরাহানের ভাবটা যেন চমনলালের কাছে বেশী বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। সে বলল ঃ সন্ধ্যেটা তাহলে কি এই আনন্দেই কাটাতে চাও বুরহান?

বুরহান বলল ঃ এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কোথায় মিলবে বল?

চমনলাল রাগ করে বলল ঃ বেশ এই আনন্দ নিয়েই তবে তোমরা থাক, আমি চললুম। আর কোন কথা বলবার অবকাশ পর্য্যন্ত না দিয়ে সে দ্রুত ঘর থেকে বাইরে চলে গেল।

রিহান বলল ঃ সত্যি, চমনলালেব যেন কি হযেছে।

বুরহান বলল ঃ কাল থেকেই এটা লক্ষ্য করেছি। বোধ হয় আসমানতারাকে দেখেই ওব এরকম হল।

রিহান বলল ঃ তাই হবে। ভূষণকে আসমানতারা আমন্ত্রণ জানিযে গেল—ওকে জানাযনি— তাই বোধ হয় ওর ভূষণেব উপর রাগ।

বুরহান বলল ঃ যাই হোক, হঠাৎ বন্ধু বিচ্ছেদ হওয়া উচিত নয। ওকেও দেখতে হবে। চল আসমানতারার ওখানে যাওয়া যাক। চল ভূষণ।

ভূষণ বলল ঃ না বন্ধু, আমাকে মাপ কর।

—কেন?

—আমার ভাল লাগে না।

রিহান বলল ঃ চল, চল, ভাল লাগবে। কাল এক প্রশস্তিতেই কাৎ, আজ যদি এ পদগুলি শোনে, তবে তোমাকে বুকে করে রাখবে।

ভূষণ তবু বললে ঃ না ভাই, আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

—কেন? তুমিও যে আসমানতারার উপর বিরূপ? তোমাদের হল কি হে?

কি বলবে ভূষণ! সে বলতে পারবে না যে আসমানতারা নিজেই তাকে সন্ধ্যাবেলা যেতে বারণ করেছে।

বুরহান বলল ঃ চমনলালের কথা ভেবে বুঝি তুমি যেতে চাচ্ছ না। ও কিছু মনে ভাববে তাই?

ভূষণ যেন কথাটা পেয়ে গেল। বলল ঃ হ্যাঁ তাই।

হো হো করে হেসে উঠল বুরহান। বলল ঃ তোমার ইতস্তুতঃ করবার কোন কারণ

নেই। আমরা যাচ্ছি আর এক আসমানতারার কাছে। আর এক আসমানতারা নাকি আছেন গৌড়ে, তিনি তুরস্কের রমণী। চল যাই, বাঙালিনী তো দেখা গেল, এবার তুরাণিনীকে দেখি।

না হেসে পারল না ভূষণও। বলল : চল।

ওরা গিয়ে পশ্চিম গড়ে উপস্থিত হল। খুঁজে বের করল কোন তুর্কী আসমানতারা আছে কিনা? দেখা গেল সত্যি আছে।

ওরা গিয়ে বৈঠকখানাতে বসল।

গৃহের অভ্যন্তরে তখন আলোক সজ্জা হয়েছে। তুর্কী বাঈজী আসর সাজিয়ে বসেছেন। তবে আজ কোন আমীর তার কাছে আসেন নি।

ওরা বৈঠক খনায় বসতেই বাঁদী এসে সালাম জানাল।

বুরহান জিজ্ঞেস করল : এটা আসমানতারার আবাস?

—জী জনাব।

—বিবিকে সংবাদ দাও, আমরা সন্ধ্যায় তার অতিথি হয়ে এসেছি।

—"জো হুকুম মেহেরবান" বাঁদী চলে গেল। অল্পকাল বাদেই সে ফিরে এল।

রিহান বলল : মালিকানকে সংবাদ দিয়েছ?

—দিয়েছি জনাব।

—সন্ধ্যার আসর পাওয়া যাবে?

বাঁদী বলল : আজ কোন অতিথি নেই।

—বেশ চল তবে।

—কিন্তু মেহেরবান আমাদের মালিকানের একটি শর্ত আছে।

অবাক হয়ে ওরা তাকাল বাঁদীর দিকে। ব্যবসায়ে আবার শর্ত কী? শর্ততো টাকা! কি শর্ত?

বাঁদী বলল : আমাদের মালিকান একমাত্র তুর্কী আমীর ছাড়া আর কাউকে অতিথি করেন না।

শুনে বুরহান আর রিহানের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

রিহান নিজেকে চেপে রাখতে পারল না। বলল : তবে তোমার মালিকান বাঙলা দেশে এসেছেন কেন?

বাঁদী বলল : জনাব সে প্রশ্নের জবাব আমি জানিনে। মালিকানের মর্জী মালিকানই জানেন। আমি শুধু তার হুকুমের বাঁদী।

বুরহান বলল : যাও, তুমি গিয়ে তোমার মালিকানকে বল যে, বহু তুর্কী আমীরকে কিনতে পারেন, এমন মালিকরাই তার ঘরে এসেছেন।

—কিন্তু আপনারা কি তুর্কী?

রিহান বলল : তুর্কী। কিন্তু বাঙলায় থাকলে তুর্কীও বাঙালী হয়।

বাঁদী সালাম জানিয়ে ভেতরে চলে গেল। কি বলল সে তুর্কী নর্তকীকে সেই জানে। কিন্তু একটু বাদেই ফিরে এল।

—আসুন মেহেরবান, আমাদের মালিকান আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ওরা তিন জন উঠল। কিন্তু শর্ত শুনে সবারই স্পৃহা চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র একটা জেদ চেপে ছিল বলেই ওরা এগিয়ে চলল।

ভূষণ খাঁ বলল ঃ তা হলে আমি ফিরে যাই?

বুরহান তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ কেন ভাই?

রিহান বলল ঃ বাঙলা দেশে কেউ আর তুর্কী নয়। এমন কি বাঙলার সুলতানও আজ নিজেকে তুর্কী বলে গর্ব করতে পারেন না। আজ তাঁর দরবারের ভাষা বাঙলা। তাঁর দরবারের ভূষণ বাঙালী কবি। এমন কি তুর্কী আমীরেরা পর্য্যন্ত বাঙলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। চল, দেখি কার ঘাড়ে দশটা মাথা বাঙলা দেশে এসে বাঙালীকে অপমান করে। বাঙলা দেশে এসে বাঙলীকে অবজ্ঞা করা চলে না এই বোধটা ওর মধ্যে এনে দেবার জন্যই আমরা ওখানে যাব।

ভূষণ বলল ঃ চল। বাঙলার জন্য যা বলবে করব।

ওরা গিয়ে ফরাস বিছানো নর্তকী মহলে উপস্থিত হল।

তুর্কী রমণী সালোয়ার কামিজের ওপর ওড়না চাপিয়ে বিদেশী সাজেই প্রস্তুত হয়ে আছে। ওদের দেখে অভ্যর্থনা জানাল ঃ—আইয়ে মেহেরবান।

খাস বাঙলায় জবাব দিল বুরহান ঃ হ্যাঁ, আসব তো নিশ্চয়ই।

কথা শুনে থ খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল 'আসমান' একি! এরা তবে তুর্কী কিসে!

তা বুঝতে বাকী থাকল না বুরহানের। সে বলল ঃ ঘাব্‌ড়াইয়ে মত! ভয় পেওনা আমরাও তুর্কী। তবে দেশটা বাঙলা। এখানে যখন ঘর বাড়ী তৈরী করেছি বাঙালী না হয়ে উপায় কি?

নর্তকী এক নজরে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখল। হ্যাঁ, অভিজাত ঘরের সন্তান সন্দেহ নেই। মুসলমান যখন তখন তুর্কীই হবে।

গৌর বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, উন্নত নাসা, এরা বাঙালী নয়। কিন্তু ভূষণের বিচিত্র পোযাক দেখে তার ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

রিহান তা লক্ষ্য করল। বহুত্‌ এলেমদার আদ্‌মি বিবিসাব—ঘাবড়ানা মত্‌।

বুরহান বলল ঃ গৌড়ে অভিজাত্যটা বংশের উপর নির্ভর করে না। অর্থের উপর, রূপিয়ার উপর নির্ভর করে। সে রূপিয়া আমাদের আছে।

বিবির মনের অবস্থা কেমন হল সেই জানে। সে মনের দিকে নজর দেবার সময় এদের নেই, ইচ্ছেও নেই।

আসমানেরও কিছু বলবার থাকল না। সে বুঝল, বলে লাভ নেই। এরা দুর্বল নয়। গৌড় যারা শাসন করেন এঁরা তাদের দলে।

সে নতুন অতিথিদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করল। বলল ঃ ফরমাইয়ে জনাব, নাচা ঔর গানা?

বুরহান বলল ঃ নাচ আর গান দুটোই আমাদের প্রচলন।

রিহান বলল ঃ বিবিকে দেখেই বুঝতে পাচ্ছি বাঙলা জানা নেই। কিন্তু হিন্দুস্থানের কোন গান জানা আছে কি?

—থোড়ে থোড়ে।

—কার?

—সন্তু করীর কো।

—তবে তাই হোক।

তুর্কী বিবি আসামানতারা তানপুরার তারে হাত দিল। বাদ্যকারেরা পাশে বসল। গুন্ গুন্ করে গান ধরল আসমানঃ

"সাঝ পড়ে দিন বীতরে
চক্‌রী দীন্‌হা রোয়।
চল চকরা বা দেশ কো
বাঁহা রৈণ ন হোয়।।"

গানটা ভাল, অর্থটাও ভাল। ওরা মুহূর্তে নর্তকীর অহমিকার কথা ভুলে তার দিকে তাকালঃ নর্তকী সুন্দরী ঠিক। চিকণ ভুরু, কুঞ্চিত কেশোদম, তীক্ষ্ণ নাসা, রক্ত ওষ্ঠ, পীনপয়োধর। আর ভূষণ খাঁ যে লিখেছে "সিংহ জিনি মাজা খিনি" সেই রকম কোমর, কিন্তু তবু যেন ঠিক তেমনটি নয়—যেমনটি ছিল বাঙলার আসমান। নর্তকীর গান চলল। মন্দ নয়। কিন্তু পশ্চিম গৌড়ের আসমানের কণ্ঠে ভাববিলাস যেমন মূর্ত হয়ে অপার্থিব জগতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তেমনটি নয। ভূষণ খাঁ দুই আসমানকে বিচার করে দেখবার চেষ্টা করল। এ আসমানের অভাব কিছু নেই। রূপ আছে, যৌবন আছে, কণ্ঠ আছে---সব। তবুও যেন একটা কি নেই? কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূষণ খাঁ ধরতে পাবল কি নেই। নেই প্রাণ। এ আসমানের ব্যবসা, ও আসমানের শিল্প। তাই এ রয়েছে মাটিতে আর ও উঠছে আসমানে।

তুর্কী আসমান তার গান শেষ করল। তাকালো সমবেত অতিথিদের দিকে। কিন্তু দেখল যে, প্রশংসার উচ্ছ্বাসে ওরা কেউ ভেঙ্গে পড়ল না। বলল না, আর একটা হোক; অনুরোধ করল না নাচের জন্য। গান শেষ হতেই বুরহান আর রিহান তাদের তোড়া থেকে সোনার মোহর বাঈজীর ফরাসের উপর ঢেলে দিল। বাঈজী দেখল, একটা নয়, দুটো নয়, বহু। ছোট একটা সোনার পাহাড় বললে হয়। দেখে তার দুচোখে আশ্চর্য্য একটা ভাব ফুটে উঠল। বুরহান আর রিহান সে দৃষ্টি চেনে, সে দৃষ্টি লোভের। চমনলালের 'সোনার চোখ'। নৃত্য ব্যবসায়ে নেমে এ চোখ দেখে ভুলবে না এমন নর্তকী কম আছে। এর কাছে জাতির কোন মূল্য নেই। এ আন্তর্জাতিক। এতগুলো মোহর একবারে দেখে মুহূর্তে তুর্কী আসমানের আভিজাত্যের কথা বুঝি ভুল হয়ে গেল। সে কুর্ণীসের ভঙ্গীতে বুরহান আর রিহানকে সালাম জানালো।

বুরহান ভূষণ খাঁকে ধরে নর্তকীর দিকে তাকাল। বললঃ বিবি এরও পুরস্কার দেবার কিছু ছিল। কিন্তু এতই মূল্যবান সে জিনিষ যে, একমাত্র যোগ্য পাত্র না হলে দান করা যায় না। তাই থাকলো।

ভাগ্যিস তুর্কী আসমান ভালো বাঙলা জানে না, তাহলে কথাটার অর্থ বুঝে লজ্জায় ম্রিয়মান হত সে। কিছু না বুঝে সে ভূষণ খাঁকেও সালাম জানাল।

আসমান জিজ্ঞেস করল ঃ আউর নাচ?

বুরহান বলল ঃ আজ নয়। বিবির দরবারে আবার এ বান্দারা হাজির হবে। আজ আমাদের সময় নেই।

উঠে দাঁড়ালো ওরা তিন জন। যাবার জন্য প্রস্তুত হল। আসমান বিদায়ের ভঙ্গীতে কুর্ণীস জানাল ওদের।

বুরহান, রিহান আর ভূষণ বেরিয়ে এল।

বুরহানের চোখে মুখে একটা উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠেছে; রিহানেরও।

বুরহান বলল ঃ বেটীর অহংকার ভেঙেছে।

রিহান বলল ঃ তুর্কী আর বাঙালী প্রভেদটা বুঝেছে। কোন্ ব্যাটা তুর্কী আমীর আছে এতগুলো সোনার মোহর দেবে?

বুরহান তাকাল ভূষণের দিকে ঃ কেমন লাগল দোস্ত্, ঠিক করিনি?

ভূষণ বলল ঃ বাঙলার সম্মান বাঁচিয়েছ।

রিহান বলল ঃ এখনই কি? ওকে দিয়ে তোমার পদ গাইয়ে ছাড়ব।

এবার বুরহান বলল ঃ সবতো হল, কিন্তু বল তো আমাদের চমনলাল গেল কোথায়? আসমান বিবির নাম করেই তো সে এল!

রিহান বলল ঃ বোধ হয় বিবির আভিজাত্যের দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে।

—কোথায় গেল?

—হয় তো নিজের ঘরে।

রিহান বলল ঃ চল, সেখানে মান ভাঙাবার চেষ্টা করি। একবারও তাদের গৌড়ের আসমানতারার কথা মনে পড়ল না।

কিন্তু চমনলাল প্রকৃত পক্ষে সেই গৌড়ের আসমানতারার কাছেই এসেছিল। একটা ব্যর্থতার গ্লানি আজ সে সারাদিন ধরে মনের মধ্যে পোষণ করেছে। আসমানের অনাগ্রহ ঔদাসীন্য যেন তাকে চাবুক মেরেছে। সোনার চাবুক মেরে চমনলাল সেই আঘাত ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অবহেলায় সোনার মোহরের মায়া পরিত্যাগ করে সে পয়জায়েরও অধম পাদুকা দিয়ে তাকে আঘাত করেছে। সে আঘাত চমনলাল ভোলেনি। আঘাতটা বেশী লাগার কারণ আকর্ষণ। আসমানের জন্য প্রাণ আকুল হয়েছে ব্যাকুল হয়েছে তার। তাই তার প্রত্যাখ্যান তাকে দ্বিগুণ বিঁধেছে। তখন এ আসমানের কাছে আসবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল কেন সে? কারণ এ আসমানকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটা সোরগোলের মধ্যে উপভোগ করবার ইচ্ছে নেই তার। বন থেকে তুলে এনে গৃহের প্রাঙ্গণে একান্ত নিজের ফুলের মত তাকে উপভোগ করবার ইচ্ছা চমনলালের। তাই সে যেকোন ছলে একা বেরিয়ে পড়তে পেরে আর বিলম্ব না করে বরাবর পশ্চিম গৌড়ে বাঙলার আসমানতারার কাছে চলে এসেছিল। আসমানতারার গৃহে তখন অতিথি। গৌড়ের অন্যান্য আমীরেরা। চমনলাল দুয়ারে যেতেই খাসনবিস তাকে বাধা দিয়েছিল ঃ কি চাই?

—আসমানতারাকে।

—কিন্তু এখন তো তার সঙ্গে দেখা হবে না ।

—কেন ?

—এখন সে নাচের আসরে।

চমনলাল বলেছিল ঃ আমিও তার নাচ দেখতেই এসেছি।

—কিন্তু আগে বন্দোবস্ত না করলে তো আসমানের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়!

একটু আশ্চর্য্য হল চমনলাল। এই আসমানই তো তাকে সন্ধ্যাবেলা আসার কথা বলাছিল! সে বলল ঃ আমাকে আসতে বলা হয়েছিল।

খাসনবিস বলল ঃ কার সঙ্গে কথা হয়েছিল ?

—আসমানের সঙ্গে।

—কিন্তু শেঠজী, ব্যবসার কথা বলবার মালিক তো আসমান নয়, আমি।

—মানে ? অবাক হয়ে চমনলাল তাকালো তার দিকে।

খাসনবিস বলল ঃ দিনটা আসমানের—ব্যক্তির । কিন্তু রাতটা ব্যবসার। আর সেই ব্যবসা পরিচালনার ভার আমার উপর।

চমনলাল বলল ঃ বেশ, অমি বাইরে আপেক্ষা করছি—আপনি আসমানকে খবর দিন।

খাসনবিস বলল ঃ রাত্রিবেলা একটির বেশী দুটি আসর বসে না আসমানের। আর রত্রিবেলা সে অন্য কারো সঙ্গে দেখাও করে না। দেখা করতে হয় দিনে আসবেন। আসরের চুক্তি করতে চান আমার সঙ্গে করুন।

চমনলাল বলল ঃ আমি আসরের চুক্তিই করব।

—বেশ করুন।

—বাঈজীর নজরানা কত ?

—পঁচিশ মোহর।

—চমনলাল বলল ঃ আমি তাকে প্রতি আসরে একশ মোহর দেব।

খাসনবিস নিস্পৃহ ভাবে বলল ঃ দেবেন।

"এই নিন।" কোমরবন্ধ থেকে একটি মোহরের তোড়া বের করে সে খাসনবিসের হাতে দিল। [illegible] গুণে দেখবেন। প্রতি আসরের জন্য একশত মোহর। এতে যে কয়দিনের হবে সে কয়দিনই আমার। বাকী দিনও আমিই কিনব।

খাসনবিস তেমনি নিস্পৃহ ভাবে বলল ঃ শেঠজীর মর্জ্জি।

চমনলাল বলল ঃ হ্যাঁ, আমি শেঠ চমনলাল। আসমানতারাকে জানাবেন আমি তার প্রতিটি সান্ধ্য আসরই কিনে নিলুম।

চমনলাল দ্রুতবেগে ছুটে পথে নেমেছিল।

বরাবর এক্কা নিয়ে সে ছুটেছিল সরাইখানায়। বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে, বড় বেশী ক্লান্ত, বড় বেশী যন্ত্রণামথিত। একটু বিশ্রাম, একটু ভোলার প্রয়োজন। কয়েক পাত্র উগ্র সিরাজী পান করেছিল সে। বাঙলা দেশের মদে সম্ভব নয়, দূর পারস্যের দ্রাক্ষাসুধার প্রয়োজন তার।

একটা উন্মাদ ব্যক্তির মত সে পেয়ালার পর পেয়েলা সিরাজী পান করল।

সরাইখানার মালিকের কাছে শেঠ চমনলাল অপরিচিত নয়। কখনো এমন ব্যবহার করতে দেখেনি সে চমনলালকে। একটু অবাক হয়ে সে চমনলালের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মাত্রাতিরিক্ত কয়েক পেয়ালা পান করবার পর আবার যখন সে সরাইখানার বান্দার কাছে নতুন পেয়ালা তলব করল—মালিক নিজে উঠে এল চমনলালের কাছে। চমনলালের দলটিকে সে চেনে। এমন ভদ্র এবং সংযমী গৌড়বাসী সে কম দেখেছে। সরাইখানার মালিকের কাছে এদের তাই বিশেষ সম্মান। নেশার জিনিষ নিয়ে ব্যবসা করলেও মূল্যবোধ আছে তার। এগিয়ে এসে সে বলল : শেঠজী, আপনি কী করছেন! এ যে অত্যন্ত উগ্র পানীয়, আর পান করবেন না।

হঠাৎ যেন চমনলাল চোখ রাঙিয়ে উঠল : চোপ্ রাও কম্‌বক্ত্। আমার পয়সায় আমি মদ খাব তুমি কে হে?

সরাইখানার মালিক বুঝল নিশ্চয়ই একটা বিরাট চিত্তবিকলনের ব্যাপার কিছু ঘটে থাকবে। সে তাই চমনলালের ব্যবহারে ক্ষুন্ন হলনা। ইঙ্গিতে ভৃত্যকে বলল : মদ নয়, পানি দাও।

ভৃত্য মালিকের ইঙ্গিত মতই কাজ করল।

নতুন মদ্যপানের প্রয়োজন ছিল না। ততক্ষণ পারস্যের উগ্র সিরাজী চমনলালের মস্তিস্কে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। ঝিমুতে লাগল চমনলাল। তারপর হঠ্যাৎ কি মনে পড়তে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো আর বাইরে চলে এল। সরাইখানার মালিক নিজেও দেখল চমনলাল এক্কায় উঠল। গাড়োয়ানকে ডেকে মালিক বলল : শেঠজীকে বরাবর বাড়ী পৌঁছে দিও, আর কোথাও নিয়ে যেও না।

সে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে গাড়োয়ানের আর বাকী থাকল না।

সে বরাবর চমনলালের গৃহের দিকে গাড়ী হাঁকাল। গৃহের দরওযাজায় এসে পৌছুলে সে হাঁক দিল : শেঠজী এসে গিয়েছি।

জড়িত কণ্ঠে চমনলাল বলল : কেথায়? আসমানতারার কাছে?

গাড়োয়ান বলল : হ্যাঁ।

চমনলালের অবশিষ্ট যা কিছু অর্থ তার কাছে ছিল গাড়োয়ানের হতে দিযে বলল : বহুৎ আচ্ছা।

সালাম জনিয়ে গাড়োয়ান গাড়ীর মুখ ফিরিয়ে দিল।

চমনলাল নিজের গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। এক পাও যেন সে এগুতে পারল না। সেখানেই দরওয়াজার সামনে বসে পড়ল।

বাড়ীর লোকেরাও জানতে পারল না যে, গৃহের মাঙ্গিক নিজে দরওয়াজার কাছে বসে রয়েছেন অসহায়ভাবে।

রিহান, বুরহান আর ভূষণ তুর্কী আসমানের কাছ থেকে বরাবর চমনলালের খোঁজেই বেরিয়ে ছিল। বরাবর শেঠজীর ঘরের দুয়ারে এসে তারা দেখতে পেল যে চমনলাল গম্ভীর হয়ে বসে আছে। বুরহান ডাকল : চমনলাল!

জড়িত কণ্ঠে চমন উত্তর দিল : কে? আসমান?

ওরা বুঝল যে চমনলাল নেশা করেছে। কিন্তু এমন নেশা পূর্বে কখনো তাকে করতে দেখা যায় নি। হঠাৎ এত বেশী পান করল কেন চমনলাল?

রিহান বুরহানের মুখের দিকে তাকাল: কি ব্যপার বল তো?

বুরহান বলল: তুর্কী আসমানতারা কি চমন ভাইকে অপমান করেছে? তাই কি...

রিহান বলল: হ্যাঁ, তা হতে পারে।

ভূষণ চমনলালকে ডাকল: এই চমন, কি হল তোমার?

চমন যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল: বদমাস কোথাকার, তুমি কবিতা শোনাতে এসেছ? তুমি শয়তান, শয়তান। হু হু করে কেঁদে ফেলল সে।

কি ব্যাপার! বুঝতে না পেরে ওরা তিন বন্ধু মুখ চাওয়া চাওযি করতে লাগল।

বুরহান বলল: এখন কিছুই বোঝা যাবে না, এখন ও প্রকৃতিস্থ নয়। নেশার ঘোর কাটুক কাল জানা যাবে। চল এখন ওকে ভেতরে পৌঁছে দেওয়া যাক্।

চমনলালকে ধরল সকলে: চল ভেতরে চল।

চিৎকার করে উঠল চমনলাল: "না, না, ছাড় ছাড। সাবধান, কেউ ভেতরে যাবে না তোমরা। না, আসমনের কাছে যাবে না, সে আমার, আমাকে..." কথাটা শেষ কবতে পাবল না সে।

বুরহান তাকাল ওদের দুজনের দিকে: নিশ্চযই তুর্কী আসমানতারা ওকে অপমান করেছে।

চমনলালের ভৃত্য ইতিমধ্যে বাইরে গোলমাল শুনে বেরিযে এসেছিল। বুরহান বলল: ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। বেশী নেশা হযে গিযেছে।

ভৃত্য ডাকল চমনলালকে: শেঠজী ভেতরে চলুন।

চমনলাল জড়িত কণ্ঠে বলল: কে?

ভৃত্য বলল: আমি হরিদাস।

—কি হল আবার?

—চলুন, ভেতরে চলুন, মাইজী আপনার জন্য যে বসে আছেন।

চমনলাল যেন উৎকণ্ঠ হল। খুঁড়িয়ে খুঁডিয়ে বলল: কে? আসমান?

বুরহান হরিদাসকে ইশারা করে বোঝাল যে, বল, হ্যাঁ আসমান।

হরিদাস বলল: হ্যাঁ শেঠজী, তিনিই ডেকেছেন।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল চমনলাল: চল, চল।

তার পা দুটি কাঁপতে লাগল।

বুরহান বলল: যাও, ধরে নিয়ে যাও।

ভৃত্য চমনলালকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল।

রিহান বলল: সত্যি, এরকম হতে কখনো দেখিনি চমনলালকে।

বুরহান বলল: ওর মনের মধ্যে কোথাও যেন একটা আঘাত লেগেছে। পরে জানা যাবে। জ্ঞান ফিরে এলে নিশ্চয়ই আমাদের কাছে কিছু লুকোবে না। চল এবার আমরা যাই।

ওরা তিনজন নিজেদের গৃহের দিকে চলল।

বাইরে অন্ধকার ছিল, অন্ধকারের মধ্যে মুহূর্তে হারিয়ে গেল ওরা।

সাত

"ঘরের বাইরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।"

—চণ্ডীদাস।

ভূষণ খাঁ রাত্রিতে ঠিক ঘুমোতে পারেনি। বহু প্রশ্ন বার বার তার মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে। তার প্রথম প্রশ্ন গৌড়ের আসমানতারা। সে নর্তকী হল কি করে, আসমানতারার গৃহে গিয়ে সকালে সে যে চিত্র দেখে এসেছে, তাতে তাকে সাধারণ একজন বাঙালী ঘরের বধূ বললেই চলে। বধূ হিসাবে যাকে মানাতো সে নর্তকী হয়ে আসরে নামল কেন? আসমান কথায় কথায় অতীত এক ইতিহাসের ইঙ্গিত দিয়েছিল, কিন্তু তারপর আর সে ইতিহাস বলবার আগ্রহ দেখায়নি। কী সে ইতিহাস! নিশ্চয়ই কোন এক রহস্যে ভরা সে ইতিহাস। নিশ্চয়ই কোন বেদনার্ত করুণ কাহিনী আছে সেখানে। একটা অতীত স্মৃতি বোধহয় হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল আসমানের। তার দৃষ্টির মধ্যে যে একটা মলিন ভাব ফুটে উঠেছিল, বৃন্তচ্যুত ফুলের মলিনতার মতই মনে হয়েছিল সে ভাবকে। তাহলে কি সত্যিই কোন মধুর স্মৃতি বৃন্তচ্যুত হয়ে সে পুষ্পবিলাসীদের হাতে পড়েছে? পড়তেও পারে। পুষ্পবিলাসীরা প্রকৃতপক্ষে পুষ্পের মর্য্যাদা দিতে জানে না, তাই তার জীবনপ্রবাহের মূলকে ছেদন করে তাকে উপভোগ করতে চায়। যতক্ষণ সৌন্দর্য্য থাকে একটু আদর করে, কিন্তু যেইমাত্র প্রাণস্রোতের অভাবে সে ফুল মলিন হতে থাকে তাকে দূরে নিক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করে না। হায় পুষ্পের অন্তরের বেদনা কি তারা বুঝতে পারে! পারে না। তাহলে বুঝতো যে শুধুমাত্র সৌন্দর্য্য বিকশিত করেই পুষ্প সার্থক নয়। তার অন্তরের মধ্যে আর একটি স্বপ্ন থাকে, সে স্বপ্ন বীজ ধারণ করবার। সেই পুষ্পই তো ফলের জন্মদান করবে। কিন্তু সেই ফলের সার্থকতা বিলাসীদের কাছে নেই। নর্তকী জীবনের সঙ্গে ফুলের এখানে একটা বিরাট সামঞ্জস্য। বৃন্তচ্যুত করে এনে তার সৌন্দর্য্য পান করার জন্য ব্যস্ত নটীবিলাসীরা। কিন্তু সেই বৃন্তচ্যুত পুষ্পের সৌন্দর্য্য যেদিন এতটুকু মলিন হবে, তাকে তারা দূরে নিক্ষেপ করবে। অথচ এই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা যে ফল ধারণে তার সুযোগ থাকবে না আর নর্তকীদের। বৃন্তচ্যুত মলিন পুষ্পের মূল্য নেই, মলিন নর্তকীরও। অথচ প্রাণপ্রবাহের স্রোত থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করে ফুটিয়ে রাখবার কী প্রচেষ্টাই না চলেছে। আসমানও কি সেই বৃন্তচ্যুত পুষ্প নয়? কিন্তু সেই বৃন্ত ছিল কোন্ পুষ্পশাখায়? সে স্মৃতি হয়তো আসমান ভুলতে পারেনি, তাই তার মধ্যে আজও অতীতের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কিন্তু সে কথা স্মরণ করতে তার বেদনা বাড়ে, তাই বুঝি ভুলে যেতে পারেনি।

তুকী আসমানতারাও তো বৃন্তচ্যুত পুষ্প। কিন্তু অতীতের জন্য তার মনের মধ্যে কোন

আবেগ আছে কি? তার জীবনের অর্থই সে ভুলে গেছে। তাই এমন হৃদয়হীন ঔদ্ধত্য। ফুলদানীটাকেই হয়তো নিজের জীবনের মূল আশ্রয় বলে সে মনে করেছে। কিন্তু বৃন্তচ্যুত হয়ে গেলে অতীত জীবনের স্মৃতিচারণাই ভাল, না বর্তমানকে গ্রহণ করাই ভল?

তুর্কী আসমান যদি বর্তমানটাকে গ্রহণ করতে পেরেছে, গৌড়ের আসমান তবে কেন পারল না? হয়তো তুর্কী রমণী ফুলের কুঁড়ি থাকাকালীন বৃন্তচ্যুত হয়েছে? তারপর ফুলাধারের কৃত্রিম রস পান করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাই বুঝি তার রূপ থাকা সত্ত্বেও লাবণ্যের অভাব। আর গৌড়ের আসমান একটি সদ্য বৃন্তচ্যুত পুষ্প, লাবণ্যের রস তার সর্বাঙ্গে জড়িত।

চমনলাল কোন্ আসমানের মোহে পড়েছে? গৌড়ের না তুরস্কের? চমনলাল ব্যবসায়ী, রূপের ক্ষেত্রেও সে ব্যবসায়ী। রূপ নিয়ে তার কথা, তা কোন্ দেশের আর কোন্ খনির সে খোঁজ সে করবে কি? দেহের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, সে খোঁজ সে রাখে কি? রাখে না। নইলে 'সোনার চোখের' কথা বড়াই করে সে বলতে পাবতো না। তার মনের কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বুঝি সোনার চোখে ধরা দেয়নি তাই তার এই চিত্তবিকলন! দুই আসমানতারাই 'সোনার চোখে' ধরা না দিতে পারে। এক আসমানের বুকের মধ্যে অন্তর আছে, হঠাৎ যদি তা খেয়ালের বসে বিগড়ে বসে, তবে সোনার চোখের ইঙ্গিতকে সে মোটেই আমল নাও দিতে পারে। আর এক আসমানতারা এখনো আভিজাত্যের অহংকারে স্ফীত—সেও 'সোনার চোখের' আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারে। সেই প্রত্যাখ্যানের বেদনা হয়তো চমনলালের বুকে বেজেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাজবেই বা কেন? ব্যবসা করতে গিয়ে তো আর হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়ে বসেনি চমনলাল! তাহলে ব্যবসা অসম্ভব। দু'দিন ঘরে রেখে আপনবোধে বিক্রয় দ্রব্যের প্রেমেই পড়ে যেত সে। ব্যবসায়ীদের সে প্রেম নেই।

মূল্য দিয়ে নর্তকী কিনবে গৌড়ে কি সে নর্তকীর অভাব আছে? তবে? তবে কি নিজের বুকের মধ্যে মন বলে যে একটা জিনিষ আছে সেটাই চমনলাল বুঝতে পেরেছে? হঠাৎ মনের স্বরূপটা সে ধরতে পেরেছে? সেই মন কি তবে কৃত্রিম ব্যবসার মূল্যহীনতা বুঝতে পেরে অমূল্য রতনের দিকে ধাওয়া করোছে? চমনলাল কি প্রেমে পড়েছে?

প্রেমে পড়লে, কার? কোন্ আসমানের? দুই আসমানের মুখ নিজের কল্পনার মধ্যে ফুটিয়ে তুলল ভূষণ খাঁ। দু'টি পুষ্প। দু'টি সুন্দর রঙিন পুষ্প। একটি যেন একটু বেশী গাঢ় লাল। গভীর রক্তরঙের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ ছায়ার ভাব রয়েছে। একটি লাল, আর একটি ফিকে লাল। গাঢ় লাল পুষ্পটি গৌড়ের আসমান। আহা বেচারী চমনলাল! দুঃখ হোল ভূষণ খাঁর। আবার সেই মুহূর্তে আসমানের জন্যও দুঃখ হল। চমনলাল যদি তাকে ভালবাসে তবে সেটা তারো দুঃখের কারণ নয় কি? সে যদি কারো ভালবাসার যোগ্য হয়ে থাকে....। হঠাৎ যেন একটা হোচট খেল ভূষণ খাঁ—কে সে? আসমানের প্রেমিক হতে পারে এমন লোক কে আছে? না, তার চোখে পড়ে না। তবে চমনলাল যদি আসমানকে ভালও বাসে সেটাই আসমানের অভিশাপ। চমনলাল আসমানকে ভালবাসলে সেটা আসমানের পক্ষে কতটা বেদনার হবে সেটা ভাবতেই যেন ব্যথা পেল ভূষণ খাঁ।

আসমানের সেই স্নিগ্ধ মধুর চোখ দুটি মনে পড়ল। হায় সে দুটি চোখ যে কবির ধ্যানের; লোভীর উপভোগের হতে পারে কি করে? সে দুটি চোখ যে মধুর, অবর্ণনীয়। হঠাৎ তার যেন মনে হল, দুছত্র সেই চোখের উপর লিখেই ফেলা যাক্। প্রদীপের আলোটা মৃদু মৃদু তখনো জ্বলছিল। ভূষণ খাঁ উঠে কলম নিয়ে বসল। লিখল ঃ

"প্রাতঃ কমল নয়নজোড়,
মাঝে মধুপ রহ অগোর,
মন বিমোহন চাহনি।"

সত্যি যেন তাই। সকাল বেলায় সদ্য বিকশিত পুষ্পের পবিত্র অবাক দৃষ্টির মত চোখের চাহনি আসমানতারার। তার মধ্যে অগোচর একটি মধুপ হয়েছে যেন। দেখলেই লোকে ভুলে যায়।

ভুলে যায়!

তবে কি ভূষণও ভুলেছে?

কি জানি কে জানে! তবে আসমানতারার জন্য অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই ভূষণ খাঁর। তার বিরহে অন্তরের মধ্যে তার কোন যন্ত্রণাও নেই। আসমানতারা একটি ব্যক্তি হিসাবে তার মনে স্থানই পায় না।

আসমান যেন তার একটি দর্পণ, তার মধ্যে পরিপূর্ণ নিজেকে দেখতে পায় ভূষণ। সেই নিজেকে দেখবার মোহেই আসমানতারা তার কাছে মূল্যবান। তবে মাঝে মাঝে কারুকার্যখচিত সেই দর্পণের বহিরঙ্গও যে তার চোখে না পড়ে, তা নয়। কিন্তু মূল্যতো সেখানে নয়। (দর্পণের নিজস্ব রূপের মূল্য কতটুকু? যখন ব্যক্তি তার প্রতিবিম্বিত মুখের ছায়া দেখে সেই স্বচ্ছ কাচের উপর, মূল্য তখন) ভূষণ ভুলছে সেই পরিষ্কার কাচ দেখে। হ্যাঁ ভুলেছে বৈকি। কিন্তু প্রথম রজনীতেই যদি সে দর্পণ একটি বিকৃত মুখের ছবি ফুটিয়ে তুলতো তার? তবে? তবে কি দর্পণের বহিরঙ্গসজ্জা যতই মধুর হোক্, তাকে আকর্ষণ করতে পারতো? না।

ভূষণ আবার গিয়ে শয্যা গ্রহণ করল। তার অশান্ত মনটা এখন যেন একটু শান্ত। একটি নয়নের ব্যাখ্যা সে করতে পেরেছে। যেমনটি সে চেয়েছিল, তেমনটিই করতে পেরেছে।

এ নয়ন কার? আসমানের? এ নয়নের মধ্যে আসমানকে কল্পনা করতে গিয়ে ভূষণ দেখল, বহু আসমান এর মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, আরো বহু আসমানের ছবি দেখা যাচ্ছে। এ কোন বিশেষ আসমান নয়, এ সমস্ত আসমানকে জুড়ে রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রণয়িনী-নারীর চোখ এই একই চোখ।

আবহমান কাল থেকে অশেষ ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত সেই চোখ যেন একটা মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে ভূষণের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সেই মধুর দৃষ্টিবর্ষণের স্নিগ্ধ স্পর্শে ভূষণের সর্বাঙ্গ-জুড়ে একটা স্নিগ্ধ আলস্য নেমে এল। ভূষণ ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন কিন্তু ঘুম ভেঙে উঠেই নিজের মূল্য যাচাইয়ের জন্য ভূষণের মন ব্যাকুল

হয়ে উঠল। একটি যাযাবর জীবন তার, নিয়মের শৃঙ্খলা নেই, সংস্কারের বন্ধন নেই। ব্রাহ্মণ হলেও সন্ধ্যা আহ্নিকের প্রয়োজন বোধ করে না সে। মনটাকে সে ছেড়ে দিয়েছে বস্তুর অতীত এক ভাববিলাসের মধ্যে। সেই ভাবের জগৎ নিয়মের বহু ঊর্ধ্বে। তাই সকাল বেলাতেই যখন আসমানতারার কথা মনে পড়ল তার—আর বিলম্ব করল না ভূষণ—বেরিয়ে পড়ল সে। বেরিয়ে পড়ল পশ্চিমগড়ের দিকে। আজ আর গাড়ী নিল না, হাঁটতে হাঁটতেই চলল। গাড়ী নিতে হবে একথা তার মনেই পড়ল না। সে যে হেঁটে চলেছে একথাও তার বোধ হল না। মনের মধ্যে পশ্চিমগড়ের কল্পনা যখনই তার এসেছে, তখনই যেন সে পশ্চিমগড়ে চলে গিয়েছে।

এক মনে হাঁটতে হাঁটতে অনেকক্ষণ বাদে সে এসে পশ্চিমগড়ে পৌঁছুল। তখন কিন্তু বেশ বেলা হয়ে গেছে। সূর্য্যের কমলা রঙের রোদ গলিত রূপালী স্রোতের আভা ধারণ করেছে। তার অবচেতন মন ঠিক তাকে পরিচালিত করে নিয়ে এসেছে পশ্চিমগড়ে।

হায় নর্ত্তকীরও মন আছে! আসমানের কি হয়েছিল কে জানে, ঘর-বার করছিল শুধু। ভূষণের জন্য কি? সে বারে বারে নিজের মনকে তেমন প্রশ্ন করে দেখেছে। ভূষণের জন্য প্রেমিকার আকুল স্পন্দন সে নিজের মধ্যে কখনো অনুভব করেনি। করেছে? না। তথাপি লোকটাকে পেলে যেন ভাল হয় এমন অবস্থা। লোকটা যেন মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান। বহুজনের মধ্যে বাস করেও আসমানতারা যেন নিঃসঙ্গিনী। ভূষণ যেন সেই অসহায় নিঃসঙ্গতার মধ্যে বিরাট একটা আশ্রয়। ঠিক আত্মীয়ের মত মনে হয়, আশ্রয়ের মত মনে হয়, তাই তার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা। মদনের জন্য রোহিণীর আকাঙ্ক্ষা নয় এটা। প্রজাপতির জন্য ফুলের আকাঙ্ক্ষা নয়। শিশিরের জন্য শেফালীর আকাঙ্ক্ষা।

বাইরে সে ঘুরছিল। ভূষণ আসবেই এমন কোন কথা ছিল না। সে আসবেই মনের মধ্যে এমন কোন দাবীও তুলছিল না আসমানতারা। কিন্তু হঠাৎ দূরে ভূষণকে দেখে সে যেন অপ্রত্যাশিত আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। সকালবেলার সূর্য যেমন এক দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে স্নিগ্ধ নয়ন নিয়ে তাকায় তেমনি করে সে তাকাল ভূষণের দিকে।

আপন খেয়ালে যেন ভূষণ এগিয়ে আসছে। সে এসে দাঁড়ালো আসমানতারার ঘরের সামনে। উদ্বেল মূর্চ্ছনায় দুলে উঠল আসমানতারা: এই যে কি সৌভাগ্য আমার, সকালবেলাই ব্রাহ্মণ দর্শন!

ব্রাহ্মণ সম্ভাষণ শুনে ভূষণ আনন্দিত হল কি? সে বলল: আমি কি ব্রাহ্মণ?

শিল্পীর অন্তরের কথা আসমানতারা জানে। সে যে বহুদিন শিল্পীর সান্নিধ্য লাভ করেছে। তারা অর্থে তৃপ্ত নয়, শুধু তৃপ্ত হৃদয়ের স্পর্শে।

শিল্পীকে শিল্পী বললে মুহূর্তে কেনা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সহস্র স্বর্ণ মুদ্রাতেও তার মন পাওয়া যাবে না।

কবিকে কবি না বললে তার চেয়ে বড় আঘাত আর কিছু নেই। আসমান বলল: না, আপনি ব্রাহ্মণ নন, ব্রাহ্মণেরও বড়, ত্রিকালজ্ঞ কবি।

ভূষণের মুখে একটুখানি হাসি ফুটল। দর্পণে নিজের মুখ দেখতে পেল আসমানতারা। তাকে ঘরে নিয়ে গেল সে। আবার সেই ভূমির উপরেই বসল দুজন।

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি আসমান আজ সকালবেলা একটু সজ্জা করেছিল। তাম্বুল রাগে রঞ্জিত করেছিল ওষ্ঠ, কাজলের রেখা টেনেছিল নয়নের পত্রে। অবচেতন মনটা যে নিজের অজ্ঞাতসারে কখন কি কাজ করে, মনের অধিকারী মানুষ পর্য্যন্ত তা জানতে পারে না। আসমান তো জানতোই না যে সে সজ্জা করেছে সকালবেলা।

ভূষণ সেই দিকে তাকিয়ে বলল ঃ বা ঃ সুন্দর সজ্জা করেছ তো আজ?

আসামান বল ঃ সজ্জা! কোথায়?

—দর্পণে একবার মুখটি দেখ।

তাকিয়ে আসমান দেখল, সত্যি সে সজ্জা করেছে। একটুখানি যেন লজ্জিত হল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নর্তকীসুলভ একটা ঠমক এনে বলল ঃ

"পিয়া জব আওয়ব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে।।
কনঅা কুম্ভ করি কুচ জুগ রাখি।
দরপন ধরব, কাজর দেহি আঁখি।।"

তার সেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে, শিল্প দিয়ে নিজেকে বিচার করবার প্রচেষ্টাতে, আসমানকে যেন আরো, আরো বহুগুণ ভাল লাগল ভূষণের।

ভূষণ বলল ঃ আসমান তুমি কেন কবি হলে না?

আসমান বলল ঃ তবে কবিদের শ্রদ্ধা করতো কে?

ভূষণ বলল ঃ তা ঠিক। তবে তুমি যদি কবি হতে, আমি করতুম তোমাকে শ্রদ্ধা।

আসমান বলল ঃ ঠিক উল্টোটি হত।

—মানে?

—জল কি জলকে ধবে?

—না।

—জলকে ধরে রাখে কি?

—পাত্র।

—কিন্তু জল যদি জলকে ধরত?

—প্লাবন হত।

আসমান হেসে বলল ঃ তবেই বুঝুন, কবিকে কবি ধরতে পারে না। দুই কবি পাশাপাশি হলে অনাছিষ্টি কাণ্ড হয়, প্লাবন হয়। কবিকে ধরতে পাত্রের দরকার। সে পাত্র সমজদার শ্রোতা।

ভূষণ বলল ঃ তবু যেন মনে হয়, তুমি কবি হলে লাভ হত। শুধু ধরাতে কি আনন্দ আছে?

আসমান বলল ঃ যিনি ধরেন না, তিনি তা কেমন করে বুঝবেন বলুন? নদীর উপর দিয়ে জলস্রোত যায়, মৃত্তিকার কি সেই স্রোত ধারণে কোনই আনন্দ নেই? আছে, তাই ভাদ্রের নদী এত সুন্দর, আর গ্রীষ্মের নদী এত বিষণ্ণ।

ভূষণ খাঁ এত আনন্দ পেল যে, বলবার নয়। যে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠল ঃ তুমি আমার ভাদ্রের নদী।

আসমান হেসে বলল ঃ একথা মনে থাকবে তো?

ভূষণ বলল ঃ কেন থাকবে না?

আসমান বলল ঃ আমি যদি ভাদ্রের নদী হই, আপনাকে তবে হিমালয় পর্যন্ত হতে হয়।

—কেন?

—আপনার যে অনেকটা দাযিত্ব বেড়ে যাবে।

ভূষণ বলল ঃ তার সঙ্গে হিমালয়ের কি সম্পর্ক?

আসমান হেসে বলল ঃ মজাই তো ঐখানে। হিমালয়ের সঙ্গে জগৎ জুড়ে লোকের যে কি সম্পর্ক তা হিমালয় জানে না। যদি জানবার মত অতটা চতুর হিমালয় হোত, তবে জগৎ ঠকতো। আব চতুর নয় বলেই ওকে ভাল লাগে।

ভূষণ বলল ঃ আমাকে বুঝিয়ে না বললে কিন্তু সত্যিই আমি বুঝছি না।

আসমান বলল ঃ তবে শুনুন, ভাদ্রের নদীর জল আসে কোত্থেকে?

—হিমালয় থেকে।

—আমি যদি ভাদ্রের নদী হই তবে আমার বুকর উপব দিয়ে তেমনি জলস্রোতের প্রয়োজন হবে না কি? সে ক্ষেত্রে যে আপনাকেই হিমালয় হতে হয়।

ভূষণ বললঃ কেন, শুধু আমি কেন?

আসমান বলল ঃ এই মাত্র তো আপনি বলেছেন, আমি আপনার ভাদ্রের নদী। আপনার এই নদীর বুকে জলস্রোত ঢালবে কে?

ভূষণ হেসে তাকাল আসমানেব দিকে ঃ বল সে স্রোত কিসের?

আসমান বলল ঃ কবিতার। পারবেন, পারবেন আপনি আমাকে কবিতার বন্যায ভাসিয়ে নিতে?

ভূষণের কি মনে হল, বলল ঃ পারব, পারব আসমান।

আসমান স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে ভূষণের দিকে তাকাল।

দুয়ের চোখে চোখে মিলে গেল।

কিছুকাল এইভাবে তকিয়ে থাকবার পর আসামান তার চোখ নামিযে নিল। আস্তে আস্তে বলল ঃ কই, আপনার কবিতা?

ভূষণ বলল ঃ এনেছি। সেই জন্য তো ছুটে চলে এলাম সকাল বেলাই। সে কাগজ খুলে পড়তে আরম্ভ করল ঃ

বড় বিশেয়োসে তুয়া পন্থ নেহারী
যমুনা কুঞ্জ রহল বনযারী।
সুন্দরী মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ।
অহ-অভিসারে দ্বিগুণাধিক রঙ্গ।

আসমান হেসে বলল ঃ একটু ভুল হল।

ভূষণ কৌতূহলে তার দিকে তাকাল ঃ কি?

আসমান বলল ঃ সুন্দরী মা কুরু, না লিখে 'সুন্দর মা কুরু' লেখা উচিত ছিল। দিবা অভিসারে দ্বিগুণ আনন্দ পাই বলেই তো আপনাকে আসতে বলেছি কবি।

প্রত্যুত্তরে ভূষণ শুধু একটুখানি হাসল মাত্র।

আসমান বলল ঃ বড় ভাল লাগল কবি।

ভূষণ বললঃ সত্যি ?

আসমান বলল ঃ কবির কাছে কখনো মিথ্যে বলতে নেই জানেন না ?

ভূষণ বললঃ কিন্তু জান ?

—কি ?

—কাল চমনলাল আমার কবিতা শুনে বলল....

আসমান ভূষণকে কথা শেষ করতে দিল না....হো হো করে হেসে উঠল।

ভূষণ বললঃ হাসলে কেন ?

চামারলাল ঐ নামটা শুনে। নামটা ভারি সুন্দর। তা চামারলাল কি বলল ?

ভূষণ বলল ঃ চামার নয়, চমন।

আসমান বল্‌ল ঃ চরিত্রটা বিচার করলে চমার বললেও বুঝি অত্যুক্তি হবে না।

ভূষণ তাকাল আসমানের মুখের দিকে ঃ সে কি ! তুমি তাকে চেন নাকি ?

সত্যি কথাটা বলল না আসমান। কেন সেই জানে। বলল ঃ না জনাব। অমরা না জেনেও চিনতে পারি তাই। তা কি বলল আপনার চমনলাল ?

ভূষণ বলল ঃ চমন আমার কবিতা শুনে রেগেই অস্থির।

—রাগের কারণ ?

—রাগের কারণ এই যে, তার মতে কবিতা লেখে তারা যারা অক্ষম।

আসমান বলল ঃ কবিত লিখলেই একজন অক্ষম হবে এ ধারণা কেন ?

ভূষণ বললঃ চমনলালের বিশ্বাস, কবিতার মূল প্রেরণা নারী। কবিরা নারীর দেহটাকে উপভোগ করতে পারে না বলে মনের মধ্যেই রস সৃষ্টি করে পান করে তুষ্ট। দন্তহীন বৃদ্ধ যেমন মাংসের রস খেয়েই মাংসের স্বাদ উপভোগ করতে চায়, এও কতকটা তেমনই।

আসমানতারা বলল ঃ আপনি তার কি উত্তর দিলেন ?

ভূষণ বলল ঃ আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

বুরহান বলল ঃ এ অনন্দ অপার্থিব। এ রস কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং নারীর দেহমাংসের সঙ্গে এর তুলনা করা বৃথা।

আসমানতারা বলল ঃ দুর, আপনারা সবাই বোকা। একটা অপদার্থকে অপার্থিব আনন্দের কথা বলে লাভ আছে ? তাকে অপদার্থ দিয়েই বোঝাতে হয়।

ভূষণ আসমানতারার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ তুমি হলে বুঝি তেমনি বোঝাতে ?

—নিশ্চয়ই।

—কি বোঝাতে তুমি ?

—আমি বলতুম, শেঠজী, আপনার কথা খুবই সত্যি।

—সত্যি !

—নিশ্চয়ই !

—সেকি !

—তারপর শুনুনই না। আসমান বলতে লাগল ঃ আমি বলতুম শেঠজী রসের চেয়ে ছিবড়ের মূল্য যদি বেশী, তাহলে খাদ্যদ্রবের রসটুকু আহরণ করে পদার্থের বাকীটুকু মলাকারে মানুষ পরিত্যাগ করে কেন? সেই মল ক্রিমিকীটের খাদ্য। রসের মূল্য রসিক জন ছাড়া দিতে জানে না। মলের মূল্য দেয় ক্রিমিকীট।

আসমানতারার তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি দেখে আরও আশ্চর্য্য হল ভূষণ। সে বলল ঃ আসমান তুমি অসাধ্য সাধন করেছ।

—যেমন?

—শিল্পবৃত্তি আর বুদ্ধিবৃত্তি দুয়েরই সংমিশ্রণ ঘটিয়েছ নিজের মধ্যে।

আসমান বলল ঃ কবি, হৃদয় নিয়েই যে জন্মেছিলুম আমি। কিন্তু ভাগ্যবিপাকে নর্তকী হলুম। আর পরিবেশে পড়ে হৃদয়ের চেয়ে বেশী বুদ্ধিবৃত্তিকেই আশ্রয় করতে বাধ্য হলুম। বুদ্ধিটা নর্তকী আসমানতারার। কিন্তু হৃদয়টা নারীর—মঞ্জুলিকার।

—মঞ্জুলিকা! সে কি! ভূষণ আশ্চর্য্য হয়ে তাকাল আসমানের দিকে। আসমান বুঝতে পারল, হঠাৎ আবেগের মুহূর্তে সে নিজের অতীত জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে ফেলেছে। সে বলল ঃ না, না ও কিছু নয়।

ভূষণ বলল ঃ আসমান, তোমার একটি রহস্যময় অতীতের কাহিনী আছে। সে কাহিনীটি লুকিয়ে রাখছ তুমি।

আসমানতারা বলল ঃ নর্তকীর অতিতের কাহিনী শুনেই বা কি লাভ?

ভূষণ বলল ঃ কিন্তু তুমি তো আমার কাছে নর্তকী নও অ সমান।

আসমান ভূষণের মুখর দিকে তাকিয়ে থাকল।

ভূষণ বলল ঃ হ্যাঁ, তুমি তো সে কথা বলেছ।

আসমান বলল ঃ 'হয় তো তাই।' কেমন একটু উদাসীন হল সে।

ভূষণ বলল ঃ বল তোমার অতীতের কথা বল আমাকে। আমি কাল সারারাত ভেবেছি, তোমার একটি অতি মধুর অতীত আছে!

আসমান চমকে ভূষণের দিকে তাকাল ঃ মধুর! হ্যাঁ তা মধুরই।

—বল তবে আমাকে সে কাহিনী।

—না কবি, আজ নয়, বলব, তবে আর একদিন।

ভূষণ আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখল যে একটা বেদনার মলিনতা ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। সে আর বলবার জন্য পেড়াপীড়ি করল না। আসমান নীরবে একটু ভাবছিল। সে তাকে ভাবতে দিল।

একটু ভাবল আসমান খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ কবি, আজ এখানে আহার করে যাবেন নিশ্চয়ই?

ভূষণ বলল ঃ খাব।

—তাহাকে পাচককে বলে আসি?

ভূষণ বলল ঃ না, তুমি নিজে হাতে খাওয়াবে আমাকে।

—আমি!

—হ্যাঁ।—

—বেশ তাই হবে।

ভূষণ একটু নিচু কণ্ঠে বলল ঃ মনে রেখ আমরা দু'জন।

—দু'জন!

—হ্যাঁ, বাড়ীতে আর একজন আছে।

মনে পড়ল আসমানের। সে হেসে উঠল ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ তার কথা মনে আছে। তার খাবারটা বেঁধে দেব ব্রাহ্মণের দক্ষিণা হিসাবে।

আট

"What if we still ride on, we two
With life forever old yet new—"

——*Browning*

আজ যেন ভূষণ খাঁর আরো ভালো লাগল। ভূগর্ভের অন্ধকারে একখণ্ড স্ফটিক লুকিয়ে ছিল—সে তার সন্ধান পেয়েছে। সেই স্ফটিকখণ্ড এত স্বচ্ছ যে, আয়নার মত তার মধ্যে নিজের মুখখানি দেখা যায়। ভূষণ সেই দর্পণে নিজেকে যেন আরো বেশী করে চিনতে পেরেছে। সেই আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দে ভূষণ আজ আনন্দে উদ্বেল। সে এতদিন একটা স্রোত ছিল মাত্র। কূলে তার আবেগের স্পর্শ লাগেনি। স্রোতের মধ্যে একটা কলতান আছে, সে তা আগে জানতে পারেনি। ভাদ্রের নদীতে আজকে সেই কলতান ফুটে উঠেছে। আসমানতাবা তার ভাদ্রের নদী। আজ সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি, সব যেন ভাল লাগছে। তাই শুধুমাত্র নিজের মধ্যে না থেকে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে উপভোগ করবার ইচ্ছে হয়েছে ভূষণ খাঁর। সে বুঝতে পেরেছে যে নিজেকে চেনা যায় না, যদি না অপরের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করে দিয়ে দেখা যায়। নিজের বিরাট রূপকে বোঝা যায় না যদি না বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে মাপা যায়।

গৌড়ের মাটীর দেওয়ালের বন্ধনেব মধ্যে শুধু ভীড়, ভীড় আর ভীড়। মানুষগুলো সেখানে যেন সীমাবদ্ধ। বহুদিন পরে সেই ভীড় কাটিয়ে আবার বিরাটের মধ্যে যাবার ইচ্ছা হল ভূষণ খাঁর। বহুদিন পূবের দিগন্তব্যাপী ঘন শ্রেণীবদ্ধ আম্রকাননের শীর্ষদেশ দেখেনি সে। বহুদিন মুক্তবিহঙ্গের কণ্ঠ শোনেনি। পশ্চিমগড় থেকে ফিরতে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল তার। বিকেলই হয়ে গিয়েছিল। সে আর ঘরে ফিরে দেরী করেনি। প্রিয় সারমেয়-নন্দনের জন্য ভোজ্য দ্রব্যগুলি রেখেই বেরিয়ে পড়েছিল দক্ষল দরওয়াজার উদ্দেশে। দূরে মহানন্দা বয়ে গিয়েছে। প্রকৃতি বড় সুন্দর দক্ষল দরওয়াজার কাছে। বহুদিন পরে উদার বিস্তৃত পরিবেশের মধ্যে নিজের মনটাকে খুলে দিয়ে বসতে ইচ্ছে হল ভূষণের। মনটা যেন কি এক ভার থেকে মুক্তি পেয়েছে, তাই ঘরে না গিয়ে মুক্তির মধ্যে হারিয়ে

যেতে ইচ্ছে করল। তখনও খুব লোকের ভীড় হয়নি। সে একা গিয়ে বসল দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়ির উপর। দুইটি সুলতানী সেপাই শূল হাতে স্থানুর মত দরওয়াজার দুইধারে দাঁড়িয়ে আছে। ভূষণের দুঃখ হল তাদের জন্য, আহা, বেচারীরা মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থেকেও বন্দী হয়ে আছে। ভূষণের মনে প্রশ্ন জাগল, এখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে কেন? সুলতানের জন্য। সুলতানই বা ফৌজ নিযুক্ত করেছেন কেন? তার গৃহের জন্য। এই গৌড় নগরীকে মাটীর দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কেন? গৃহ রক্ষার জন্য। মানুষ এই গৃহ তৈরি করেছে কেন? বাসের জন্য। মুক্ত মানুষ গণ্ডীর মধ্যে বাস করতে চায় কেন? মনের বিস্তৃতির অভাবের জন্য। এই অভাববোধ কেন? অহংবোধের জন্য। অহংবোধ কেন? ভূষণের মনে হ'ল প্রেমের অভাবের জন্য। প্রেমের অভাবই মানুষের কেন? নারীর জন্য। সব নারী নারী নয়, আসমানের মত নারীর সন্ধান পেলে গণ্ডীর সীমাবদ্ধতা আর থাকে না। ভূষণ সেই আসমানের স্পর্শ লাভ করেছে—তাই আসমানেরই মত উদার বিস্তৃত সে। যেন তার মনের মোহবন্ধনই ঘুচে গেছে। তাই বিশ্বপ্রকৃতি আবার নতুন এক রূপে ভূষণের কাছে ধরা দিয়েছে। আকাশে আজ নতুন রঙ, বাতাসে আজ নতুন স্পর্শ।

ভূষণ গিয়ে সিঁড়িটার উপর বসল—আর ভাবতে লাগল। সে ভাবতে লাগল প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে, আর সেই দিকে তাকিয়ে তন্ময় হযে গেল। ধীরে ধীরে দক্ষল দরওয়াজাতে নিত্যকার মত মানুষ জড় হতে লাগল। প্রকৃতির অসীম হাতছানী যাদের মনের মধ্যে এতটুকু লেগেছে, তারা কেউ আর অপরাহ্নে ঘরে থাকতে পারে না। সন্ধ্যাবেলায় আকাশে এক দুই তিন করে ধীরে ধীরে যেমন নক্ষত্র ফুটে উঠতে উঠতে ভীড়ের সৃষ্টি হয়, তেমনি এক দুই তিন করে গৌড়ের নাগরিকরা দক্ষল দবওয়াজাতে জমা হতে হতে ভীড়ের সৃষ্টি করে ফেলল। কেউ গিয়ে বসল পরিখার ধারে। কেউ বা খাদের বদ্ধ জলে রক্তকুমুদ-গুলিকে দেখতে লাগল। কেউ সবুজ মৃত্তিকার উপর বসে স্নিগ্ধ মাটির গন্ধ নিতে লাগল। ধীরে ধীরে সেখানে বুরহান আর রিহান এল। অভ্যস্ত চোখে তারা তাকালো দক্ষল দরওযাজার সিঁড়িতে।

বুরহান বলল: এ কি! আজ যে ভূষণ!

রিহান বলল: তাই তো! পূব দিকে কেমন নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছে দেখ?

বুরহান একটু হেসে বলল: কি ভাবছে ও?

রিহান বলল: কে জানে! খেয়ালী মানুষ খেয়াল নিয়েই আছে।

বুরহান বলল: কিন্তু চমনলাল আসেনি লক্ষ্য করেছ?

—হ্যাঁ। চমনলালটারও কি পাগলামী রোগে পেল নাকি?

বুরহান বলল: একটু মতিভ্রম হয়েছে। তুর্কী আসমানতারার অপমানটা বোধহয় ও ভুলতে পাচ্ছে না। আবার ওখানেই যাবে কিনা কে জানে।

রিহান বলল: সত্যি, ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে। গুজরাটে যে চমনলাল এতটা সংযমের পরিচয় দিল, গৌড়ে এসেই সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না! যে পদ্মাবতী দুলারী বাঈয়ের হাত থেকে ওকে রক্ষা করল, সে কি ওকে গৌড়ের বারনারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না?

বুরহান বলল : মজাটা তাই এখানেই। প্রেমটাকে ঠিক কাছে থাকলে বোঝা যায় না। অর্থের প্রকৃত মূল্য কি প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়? অর্থের প্রতি দরদ কার? দরিদ্রের।

রিহান বলল : তাই! শুধু দরিদ্রের নয়, কৃপণেরও আছে।

বুরহান বলল : কেন আছে জান?

—ব'ল।

—অর্থটা হারিয়ে যায়, সদা তার মনে এই ভয়। তাই অর্থটাকে সে আগ্‌লে আগ্‌লে রাখে। চমনলাল প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছে, হারাবার ভয় নেই, তাই সে উদাস। সে বাঁচতে পারতো, যদি...

রিহান তাকাল বুরহানের দিকে : কি?

বুরহান বলল : যদি পদ্মাবতী একটু হারিয়ে যাবার অভিনয় করতে পারতো।

রিহান বলল : নারে ভাই, পদ্মাবতীর দ্বারা ও হবে না, ও হিন্দুর ঘরের মেয়ে।

বুরহান বলল : তোমার ঘরের ভাবিজানকে দিয়েও হবে না, কারণ সে বাঙালীর ঘরের মেয়ে। এটা বাঙলা দেশের মেয়েদের স্বভাব।

—তাহলে?

—চমনলাল ডুববে।

—আমরা থাকতে?

—কি আর হবে বল? বাঁচতো, যদি মনের মধ্যে জট্ না পাঁকাতো। সব খোলা যায, কিন্তু ঐ জট্ খুলব কি করে বল?

রিহান বলল : জালাল থাকলে হয়তো কিছুটা সম্ভব হোত।

বুরহান বলল : হয়তো। কিন্তু কি করব বল, সে এখনো অনেক দূরে।

রিহান বলল : ও কথা থাক এখন। চল ওখানে গিয়ে বসি। দেখি আমাদের কবি আবার কি ভাবছেন।

ওরা দুজন এগিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হল।

ভূষণ তখনো তন্ময় দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে মিশে আছে।

বুরহান ডাকল : দোস্ত্, কবি—

চমক ভাঙল ভূষণের : ফিরে তাকাল সে : কে! আরে বুরহান ভাই! এস, এস। রিহান!

ওরা দুই বন্ধুতে গিয়ে সিঁড়ির উপর বসল।

বুরহান বলল : কি ব্যাপার? দক্ষল দরওয়াজার আজ বহু ভাগ্য!

ভূষণ বলল : ভাল লাগছে এই আকাশ।

বুরহান বলল: কিন্তু কবিতা?

ভূষণ বলল : কবিতা! এই তো কবিতা। দক্ষল দরওয়াজার এই আকাশে তাকিয়ে দেখ, আম্রকাননের শীর্ষে তাকাও, পাখীর কলকণ্ঠ শোন। কোথাও সঙ্গীতের অভাব আছে?

—হয়তো নেই।

—৬

—তাহলে এইতো কবিতা। সঙ্গতিই কবিতা, অসঙ্গতিই অ-কবিতা।

রিহান বলল : দোস্ত্ তোর ঐ মনটা আমায় দিতে পারিস। বিশ্বজোড়া অসঙ্গতি ভিন্ন আর কিছুই যেন আমার নজরে পড়ে না। জীবনটা তাই তিক্ত হয়ে গেল। আমার ধন-দৌলত যা আছে সব তোকে দেব, তোর মনটা শুধু আমাকে দে তো।

বুরহান ঠাট্টা করে বলল : আমার ভাবিজানের কথাতো বললে না? তাকেও দিতে হবে কিন্তু।

রিহান বলল : এমন অন্তরের বন্ধু আমার কে আছেরে দোস্ত্? তোর মনটাও চাইনে, আমার বিবির হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারিস?

লজ্জায় একটু লাল হল ভূষণ।

রিহান বলল : বুঝলে বুরহান, দোস্তের আমার কাব্য-রোগ যাবে ঘরে যদি বিবি আসে, সেই বিবির সন্ধানই করতে হবে।

বুরহান ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলল : তা ভাই দক্ষুল দরওয়াজার আকাশে কি শুধু কবিতার সঙ্গতিই লক্ষ্য করেছিলে, না আরো কিছু দেখছিলে আসমানে তাকিয়ে?

ভূষণ তাকাল বুরহানের দিকে : হ্যাঁ দেখছিলুম।

—কি?

—আসমান।

বুরহান উচ্চ শব্দে হেসে উঠল : এই সেরেছে, দোস্তও কি আসমানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ নাকি?

ভূষণ একটু কাব্য করল : সেটা মন্দ কি। আসমানের প্রেম কোনো দিন শেষ হয় না জান?

কেন?

—ধরাছোঁয়ার মধ্যে এলেই তার প্রতি আর মানুষের আগ্রহ থাকেনা। প্রেমটা তখন জলের বুকে বুদ্বুদের মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। আর ধরা না দিলে ধরবার আগ্রহটা চিরদিনই থেকে যায়। তখন মনে হয়, এর চেয়ে বড় প্রেম আর নেই। আসমানকে ধরা যায় না।

রিহান বলল : তা আসমানের এ গুণ আছে বটে। আসমানটাকে ধরা যায় না। চমনলাল সেই আসমানের পিছনেই ছুটছে। বুঝলে বুরহান, এ প্রেমের বুঝি আর শেষ হবে না।

বুরহান বলল : তার ফলটাও বুঝতে পাচ্ছ?

—কি?

—আসমানটা আসলে শূন্য। যে রঙটা দেখি তা কোন বস্তু নয়, শূন্য। যা সত্য নয় অথচ সত্য হয়ে দেখা দেয় তাই কৃত্রিম। কৃত্রিমের পেছনে ধাওয়া করা মানে মৃত্যু। দোস্তদের রামায়ণে রামচন্দ্রের স্বর্ণ মৃগের পেছনে ছোটা। অসত্য জিনিষটার টানবার ক্ষমতা বড় বেশী কিনা। তাই সোনার হরিণের টানে পড়েছে চমনলাল। ফলটা কি হবে এবার বোঝ।

ভূষণ শুধু একটু গম্ভীর হয়ে শুনল।

বিহান ভূষণকে বলল : দোস্ত্ তোমাদের শাস্ত্রবাক্যে আছে বিষে বিষক্ষয়। আমি বুরহানকে বলি কি, চমনলালও তো সোনার হরিণের পেছনে সোনার অস্ত্র নিয়ে ছুটছে, বিষ নাশ হবে না?

বুরহান হো হো করে হেসে উঠল : জব্বর কথা বলেছ বিহান।

ধীরে ধীরে ভূষণ উত্তর দিল : কিন্তু এরও জবাব আছে দোস্ত্।

ওরা দুজনেই ভূষণের দিকে তাকাল।

ভূষণ বলল : সোনার হরিণের পেছনে রামচন্দ্র না হয় তার লোহার বাণ নিয়ে ছুটেছিল, কিন্তু সীতাদেবী তো তাঁর সোনার হৃদয় ছুটিয়ে দিয়েছিলেন। তাহলে বিষক্ষয় না হয়ে বিষবৃদ্ধি হল কেন? রাবণের খপ্পরে সীতাদেবীই বা পড়লেন কেন?

বুরহান বলল : হক্ কথা দোস্ত্, কিন্তু তোমার অভিমতটা কি?

ভূষণ বলল : বিষে বিষক্ষয় হয় কিনা জানিনা, তবে বিষে বিষে মিশ খায় তা জানি। কিন্তু তেলেজলে মেশেনা। এখানে যদি দুটোই বিষ হত, মিশে যেত। কিন্তু একটি, অর্থাৎ গৌড়ের আসমান বিষ নয় অমৃত। কিন্তু চমনলাল বিষ্।

রিহান বলল : এ সিদ্ধান্তটা তুমি কোথা থেকে করলে দোস্ত? চমনলালকে দুধ বলেই জানতুম আগে।

ভূষণ খাঁ বলল : ছিল, কিন্তু কামনার এক ফোঁটা বিষ পড়ে বিষময় হয়ে গেছে।

বুরহান বলল : বুঝলাম সত্য। কিন্তু আমাদের বাঈজী যে অমৃত তা তুমি জানলে কি করে?

ভূষণ বলল : দেখেছি তার একটি চোখের চাহনিতে। দেখে নিও, চমনলাল নিজের বিষে নিজেই জর্জরিত হবে।

বুরহান জড়িয়ে ধরল ভূষণকে : সেকি দোস্ত্, ডুবে ডুবে তুমি পানি খাচ্ছ নাকি?

বিহান বলল : তাই কি কথায় বলে ভিজে বেড়াল নিজামুদ্দিন? কি করছ বলতো বন্ধু?

ভূষণ শুধু হাসতে লাগল।

সূর্যের আলো নিভে গিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ফুটে উঠতে চাইল। বুরহান ভূষণকে বলল : একটু বোস। সন্ধ্যার নামাজটা সেরে নিই।

ওরা দুজনে একটু দূরে গিয়ে নামাজ পড়ে নিল। তারপর নামাজ শেষে আবার এসে দাঁড়াল ভূষণের পাশে।

বিহান বলল : দেখলে, সত্য সত্য চমনলাল এল না।

বুরহান বলল : এবার মনে হচ্ছে সত্যি চমনলাল প্রেমে পড়েছে। একমাত্র প্রেমে পড়লেই মানুষ ভীড় এড়িয়ে চলতে চায়, বন্ধুবান্ধব এড়িয়ে চলে, শুধু নির্জনতা খোঁজে, আর মনের মানুষটির কথা নিজের মনের মধ্যেই লুকিয়ে রাখে।

রিহান বলল : তবে কি চমনলাল আসমানতারার কাছেই গিয়েছে?

বুরহান বলল : খুব সম্ভব।

রিহান বলল : চল তবে আমরাও ওখানে যাব। চমনলাল ভুল করেছে, তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। নাচের আসর একা জমে না একথাটা ও জানেনা? চল, চল।

বুরহান বলল : চল।

ভূষণ বলল : কিন্তু আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

রিহান বলল : সে কি হে, এইমাত্র না তুমি বললে আসমানের প্রেমে পড়েছ?

ভূষণ বলল : এতক্ষণ আসমান ছিল, এবার তারাও হল। ঐ দেখ আকাশে তারা ফুটেছে, আমি আসমানতারার প্রেমে পড়েছি। তোমরা যাও, আমিও আমার প্রেয়সীর সাধনা করি।

রিহান বলল : থাকো তবে। চল বুরহান আমরা দুজনেই যাই।

ওরা এগুলো।

বুরহান ভূষণকে বলল : চলি বন্ধু। তুমি বিবির আরাধনা কর।

ভূষণ বলল : সেই ভালো। আর তা ছাড়া তিনজনে যাত্রা শুভ নয়, ত্রয়োস্পর্শ।

ওরা দুজন চলে গেল।

ভূষণ একা বসে থাকল। আকাশে একে একে তারা ফুটছে। ভূষণ সেই দিকে তাকাল। ওরা রোজ ফোটে, রোজই পৃথিবীর দিকে তাকায়। এত তাকিয়ে তাকিয়ে ওরা কি দেখে? স্মরণাতীত কাল থেকেই তো এমন করে দেখে আসছে, দেখছে। দেখে কি ওদের সাধ মেটে না? ওরা বোধ হয় প্রেমে পড়েছে। দুয়ের মধ্যে এমন দুস্তর ব্যবধান বলেই এমন পরমাগ্রহ দৃষ্টি নিয়ে আজো তাকিয়ে থাকতে পারে। সত্যিকারের প্রেম আছে কি না, জানা নেই। প্রেমের সংজ্ঞা যদি হয় প্রণয়িনী বা প্রণয়াস্পদকে পাওয়া, তার জন্য আকাঙ্ক্ষা, তবে তাকে পেলে কি করে চলবে? পেলেই তো আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি। তাই সত্যিকারের যে প্রেম তাতে কোনদিন প্রাপ্তি নেই, আছে শুধু তাকিয়ে থাকা। মৈথিলী কবি সত্যই লিখেছেন :

> "জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
> নয়ন বা তিরপিত ভেল,
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলু
> তবু হিয়া জুড়ানো না গেল।"

প্রেমের পরম প্রাপ্তি প্রেম বিষয়ে ভাবতে ভাবতে প্রেমময় হয়ে যাওয়া। তাহলে ঐ গ্রহনক্ষত্র কি একদিন পৃথিবীর প্রেমে প্রেমময় হয়ে যাবে? তবে? কথাটা মনে পড়তেই হাসি পেল ভূষণ খাঁর। কি ভাবছে সে পাগলের মত? তার চেয়ে মন্দমধুর হাওয়া দিয়েছে, ভাল লাগছে। মনের মধ্যে একটা সৃষ্টির আকুল আগ্রহ জেগে উঠেছে। ঘরে গিয়ে কিছু লেখা যাক।

বুরহান আর রিহান গিয়ে আসমানতারার ঘরে উপস্থিত হল। আজ আর তুর্কী আসমানতারার সন্ধানে নয়, বরাবর গৌড়ের আসমানতারা—গৌড়কন্যা। কিন্তু গিয়ে দেখল খাসনবিস বাইরে বসে আছে।

বুরহান বলল : আজকের সন্ধ্যার আসর পাওয়া যাবে কি?

খাসনবিস বলল : না।

—কে নিয়েছেন?

খাসনবিস বলল : নাম তো বলা চলবে না।

বুরহান বলল : শুনুন, আজকের আসর বোধ হয় একজন শেঠজীর, শেঠ চমনলাল।

খাসনবিস বলল : মাপ করবেন, কিছুই জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রিহান বলল : আমাদের বলবার উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু খাসনবিসের মুখের রেখাতে কোনরকম পরিবর্তনের ভাব ফুটে উঠল না।

রিহান বলল : শেঠ চমনলাল আমাদের দোস্ত্।

খাসনবিস আবার বলল : মাপ করবেন, আমার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

বুরহান বলল : বেশ, আপনি গিয়ে শেঠজীকে সংবাদ দিন যে, বুরহান আর রিহান তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

খাসনবিস বলল : নৃত্যের আসরে যাবার অনুমতি নেই আমার। আজকে যিনি এ আসর কিনে নিয়েছেন তিনিই মানা করে দিয়েছেন।

—চমনলাল !

—জানি না।

বুরহান রিহানকে বলল : চল আমরা এ পথের মুখে সরাইখানাতে অপেক্ষা করি। চমনলাল ফিরতে পারে, ফেরার পথে ধরব তাকে।

রিহান বলল : তাই চল।

যেতে যেতে হঠাৎ রিহানের মনের মধ্যে কি প্রশ্ন উঁকি দিল সেই জানে। ফিরে দাঁড়ালো সে।

বুরহান বলল : কি হোল তোমার ?

রিহান বলল : দাঁড়াও, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আসি ওকে। রিহান এগিয়ে গেল খাসনবিসের কাছে।

বুরহান অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল, কি জিজ্ঞাসা করবে সে !

রিহান বলল : কালকের বাঈজীর আসর আমি কিনলুম, এই নিন্ টাকা।

খাসনবিস নির্বিকার উত্তর দিল : কালের আসর আগেই কিনে নেওয়া হয়েছে।

—কে নিয়েছেন ?

খাসনবিস বলল : বলেছি তো নাম বলতে পারবো না।

রিহান বলল : বেশ পরশু ?

—সেও নেই।

—তার পরদিন ?

—তাও নয়।

—তাও নয় !

খাসনবিস বলল : একমাসের আসর আগেই কিনে নিয়েছেন একজন।

রিহান বলল : ওহ্ বুঝলুম, আচ্ছা, আদাব।

—আদাব।

রিহান ফিরে এল বুরহানের কাছে।

বুরহান জিজ্ঞেস করল : কি হল দোস্ত্ ?

রিহান বলল ঃ নিশ্চয়ই চমনলাল। চল ঐ সাবাইখানাটায় গিয়ে বসি। সে এ পথেই ফিরবে। দেখতেই হবে এ কে। যদি চমনলাল হয় এ অপমানের প্রতিশোধ চাইই।

বুরহান বলল ঃ প্রতিশোধের প্রশ্ন ওঠে না। পাগলের ব্যবহারে আবার মান অপমান কি ? কামনার তাড়নায় চমনলাল পাগল হয়েছে! সে সর্বস্বান্ত হবে। চল, আমরা বসি। ওকে ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে।

আসমানের গৃহের অভ্যন্তরে চমনলালের তখন অন্য অবস্থা। সে উন্মাদ, অবেগে অধীর, কামনায় বেপথু। এই অবস্থায় আসমান যখন ভুবনমোহিনী সজ্জা করে এসে তার দিকে কটাক্ষপাত করে দাঁড়ালো—পাগলের মত উঠে তাকে ধরতে গেল চমনলাল। এই দুটি দিন এক ব্যাকুল বাসনাকে সে মনের মধ্যে পুষে রেখেছে।

তাকে উঠে আসতে দেখে একটা দৃঢ় হাতের কঠিন ইঙ্গিতে আসমান বসতে বলল। বলল ঃ শেঠজী, আমি বাঈজী, বারবনিতা নই। এখানে দেহ-চর্চা হয়। আপনি গান শুনবেন ? নাচ দেখবেন ? কোনটা ? কিম্বা দুটোই ? বলুন আপনাব হুকুম তামিল করছি।

চমনলালের দেহ কাঁপতে লাগল, কণ্ঠ কাঁপতে লাগল। সে ডাকল ঃ আসমান ঃ

—হুকুম করুন।

—তোমাকে কিছু করতে হবে না, শুধু বসে থাক, আমি তোমাকে দেখব।

আসমান বলল ঃ জনাবের অসীম করুণা। কিন্তু প্রশ্নটা কি জানেন শেঠজী—আমরা রাতের মোহিনী। আর দিনের যে কি তা জানিনা। দিনের নিদ্রাদেবী বলতে পাবেন। সাবাটা দিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শবীরটা এমন ভার হযে থাকে যে, রাতে একটুখানি না নাচতে পারলে সুস্থ বোধ করিনে। তবে জনাবের যেমন মর্জি। যদি বলেন বসে থাক, তাই হবে।

চমনলাল বলল ঃ না আসমান তুমি বসেই থাক। নৃত্যের ভঙ্গীতে তোমাব দেহ নড়ে উঠলে তোমাকে ঠিকমত দেখতে পাওয়া যায না।

আসমান বলল ঃ বেশ, বসেই থাকি। তবে একটি গান গাইতে পাবব তো ?

—হ্যাঁ, তা পার।

—তবে একটা গান গাই।

—গাও।

আসমান নতুন একটি পদ গাইল ;

"বড় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি
যমুনা কুঞ্জ রহল বনয়ারী।"

পদ শুনে যেন চমকে উঠল চমনলাল, যেন ক্ষিপ্ত হযেও উঠল ঃ এ পদ কোথায় পেলে তুমি আসমান ?

আসমান বলল ঃ আমি বাঈজী, ভাল গানের কলি পেলেই কিনি। নিত্য নতুন গান গাইতে হয় তো।

—এ গান তোমায় কে বিক্রী করল ?

আসমান বলল ঃ জনাব, একটি মেয়ে। মাঝে মাঝেই গান ফিরি করে। আমি তার কাছ থেকেই কিনি।

চমন বলল ঃ এ যে ভূষণের গান!

চোখে একটা অবাক বিস্ময় টেনে আসমান বলল ঃ সে কে শেঠজী?

—কেন মনে নেই? বুরহানের নাচের আসরের সেই গরীব লোকটি! ক্ষমতা নেই অথচ বাঈজীর আসরে যাবে। তোমাকে বকশীস্ দিতে না পেরে একটা কবিতা দিয়েছিল।

আসমান বলল ঃ ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই ক্যাবলা মত বামুনটি?

চমনলালের মুখে হাসি ফুটল। বলল ঃ ঠিক বলেছ।

আসমান বলল ঃ দেখতে বিশ্রী, বমি করতে ইচ্ছে হয়।

আগ্রহ ফুটে উঠল চমনলালের মুখে ঃ সত্যি?

—সত্যি শেঠজী। কিন্তু লেখাগুলি তো মন্দ নয়! গাইতে বেশ সুবিধে। আমাকে কয়টি পদ এনে দিতে পারেন?

চমনলাল বলল ঃ পারিনে আবার! বললে তোমার পায়ে এসে ভৃত্য হয়ে পড়বে।

আসমান বলল ঃ ভৃত্যের আমার প্রয়োজন নেই জনাব। অমন কুৎসিত ভৃত্য এলে আমি ঘেন্নায় মরে যাব।

চমনলাল বলল ঃ বেশ তবে আমি তার 'পদই' এনে দেব তোমায়। তোমার নাম শুনলে কেনা গোলামের মত লিখে দেবে।

আসমান বলল ঃ ছি ছি। একে কুৎসিৎ তায় আবার গরীব, এ লোকের দান গ্রহণ করে আমি জাহান্নামে যাব নাকি? আর এমন শেঠজী থাকতে আমি দানই বা নেব কেন।

চমনলাল বলল ঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি তোমায় দাম দিয়েই কিনে এনে দেব।

আসমান বলল ঃ একটু বেশী দাম দিয়ে এনে দেবেন। জানেন তো, জিনিস যা-ই হোক একটু বেশী দামের হলে তার বিশেষ মর্য্যাদা। মূল্যটাতো টাকার, জিনিষের কি? কাকের ছনাও হাজার সোনার মোহর দিয়ে কিনে দিলে সমস্ত গৌড়ের লোক এসে দেখে যাবে। আমার আবার নর্তকীদের দেখিয়ে চলতে হয় কি না। গানের পদটা বেশী দিয়ে কিনলে তখন আমার গৌরবই আলাদা।

চমনলাল বলল ঃ বেশ আসমান, আমি তোমার জন্য মূল্য দিয়েই গান এনে দেব।

—সব চেয়ে বেশী দাম দিয়ে কিন্তু?

—তাই হবে আসমান। আমি তোমার...

আবেগের তাড়নায় আর শেষ করতে পারল না চমনলাল কথাটি। সে একটি লোভাতুর কুকুরের মত যেন খাদ্যদ্রব্যের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আসমানের আসর সারা রাতের জন্য কিনতে পারেনি চমন। তাই এক সময় তাকে বেরুতে হল। রিহান আর বুরহান সরাইখানায় তার জন্য অপেক্ষা করছিল। চমনলাল সেখানে গিয়েই উঠল। তার মনে এতটুকু তৃপ্তির স্পর্শ এসেছিল বোধহয়, কারণ, আসমান আজ যা হোক একটু আব্দার করে তার সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু দেহের মধ্যে তার ছিল প্রচুর জ্বালা। আসমান যে ধরা দেয়নি! সেই জ্বালাটুকু জুড়াবার জন্য মনটাকে ভুলিয়ে

দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই সে একটা রিপুর তাড়নায় তাড়িত বন্য বরাহের মত এসে সরাইখানায় উঠল। ঢুকতেই মুখোমুখী পড়ে গেল রিহান আর বুরহনের। দুই বন্ধু বসে আছে। ওরা স্পষ্ট চমনলালের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন একটা মস্ত অপরাধ ধরা পড়ে গেছে চমনলালের। মুখখানা তার পাংশু হয়ে গেল।

রিহান একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই বলল : দোস্ত্ তাহলে এতক্ষণ এখানেই ছিলে ?

চমনলালের মুখে যেন একটা অপরাধের ছায়া নেমে এল।

রিহান বলল : আমরা কি কসুর করেছিলুম ?

বুরহান আস্তে আস্তে রিহানকে বলল : অতটা নয়। এখনো ওর শুভ বুদ্ধি সবটা ওকে ছেড়ে যায়নি। দেখছ না কেমন সরম পেয়েছে। ওকে ফিরিয়ে আনা যাবে।" সে চমনলালকে বলল : এস দোস্ত, কি খাবে বল।

চমনলাল একটা অপরাধী ব্যক্তির মত ওদের পাশে গিয়ে বসল।

বুরহান সরাইখানার বান্দাকে ডাকল : সিরাজী নিয়ে এস।

বান্দা তৎপরতার সঙ্গে সিরাজী সরবরাহ্ করল ওদের।

মরুভূমিতে তৃষার্ত ব্যক্তির মত যেন তৃষ্ণাতে আকুল হয়ে ছিল চমনলাল। সে এক নিঃশ্বাসে পেয়ালাটা শেষ করে দিয়ে আবার বান্দার দিকে তাকাল।

পেয়ালা পূর্ণ করে আবার পানীয় ঢেলে দিল সে। তাও মুহূর্তে নিঃশেষিত করে দিয়ে পাত্রটা আবার বাড়িয়ে ধরল চমনলাল। বাধা দিল বুরহান : একি করছ দোস্ত্—নেশা হবে যে ?

চমনলাল ঘামছিল তখন। একটা ক্লান্ত মানুষের মত সে বলল : আমি নেশা করতেই চাই বুরহান।

—কেন ?

—আমার অন্তরে বড় যন্ত্রণা।

—কিসের যন্ত্রণা ?

—তা জানি না, বড় যন্ত্রণা।

বুরহান বলল : চমন শোন, তুমি ভুল করছ। এ যন্ত্রণা তোমার মনের, নিতান্তই কল্পিত। একটু বিচার করে দেখ, দেখবে কারণটা সম্পূর্ণ অমূলক।

চমনলাল বলল : ন, না, তুমি জান না বুরহান, আমার বড় যন্ত্রণা, আমি পাগল হয়ে গেছি।

রিহান বলল : তুমি একি করছ চমন ভাই। গুজরাটেও তো তুমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ ছিলে, গৌড়ে ফিরেই তোমার এমন হল কেন ?

চমনলাল কপাল দেখিয়ে বলল : আমার ভাগ্য।

বুরহান বলল : ভাগ্যটা মানুষের সৃষ্টি, তুমি একটু বিচার করে দেখ।

যেন কেঁদে ফেলল চমন, আমি যে বিচার করতে পারছি না বুরহান।

—'পারবে দোস্ত্, এস।' বুরহান হাত ধরে চমনকে উঠালো। বাইরে এক্কা গাড়ী অপেক্ষা করছিল—সেই একটি গাড়ীতেই তারা গাদাগাদি করে উঠল। গাড়ী ছুটে চলল দক্ষল দরওয়াজার দিকে।

নয়

"সীমাব মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমাব প্রকাশ তাই এত মধুর।"
—ববীন্দ্রনাথ।

বাতে একটি মাত্র কবিতা লিখেছিল ভূষণ। কাল জীবনে সে ভিন্ন স্বাদ পেয়েছে। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রেমের পাশাপাশি সে দেখেছে একটা বিরাট মুক্তি। সে তাই লিখল:

কি কহব মাধব, প্রেমময় যাদব
বন্ধনে দিলা মন খুলি
তব নটবর রূপ শ্যাম শোভা অপরূপ
হৃদযে উঠত আকুলি।
নিরখি নব ঘন নীল নীলাম্বর
ভুলল মন কাহ্ন বলি
সঁপি চিত তব পায় বন্ধন টুটি যায়
আপন নেহারি সকলি।

নিজের মনের মধ্যে যে অসীম প্রকাশ রয়েছে, বন্ধনে ধরা না পড়লে তা বোঝা যায় না। একটি চিত্তে নিজের মন সমর্পণ করলে তবেই মুক্তি। প্রেম বন্ধন হিসাবেই তো দেখা দেয়, কিন্তু তার নিজের স্বরূপ যখন সে মেলে ধরে তখন প্রেমময় এক অপার্থিব অনুভব ঘটে। সীমা অতিক্রম করে মানুষ তখনই অসীমের মধ্যে চলে যায়। কৃষ্ণপ্রেমেই বিরহিনী রাধা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণরূপ দর্শন করেছেন। চতুর্দিকে যখন তিনি কৃষ্ণরূপ দর্শন করেছেন তখনই তো সে সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন। দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়িতে বসে কাল ভূষণ খাঁর সেই অপূর্ব অনুভূতি ঘটেছে। সে অনুভব করেছে, প্রেমের জন্য এই মহাবিশ্ব সঙ্গীতপূর্ণ। প্রেম আছে বলেই একে অপরকে আকর্ষণ করে চিরন্তন আকাঙক্ষার দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। কোনদিন কেউ কাউকে পাবে না—কিন্তু প্রেমের অনন্ত স্রোত একদিন এত ব্যাপক করে দেবে তাদের যে, স্বকীয়তার গণ্ডী তারা মুহূর্তে হারিয়ে ফেলবে। সেই দিনই হবে প্রণয়াস্পদের মুক্তি। মিলবে বন্ধনের আকাঙক্ষার মধ্য দিয়ে মুক্তির অসীম অনন্ত স্বাদ। শ্রীরাধিকা তো তারই প্রতীক।

পদটি যেন বেশ মনের মত হয়েছিল ভূষণের। ভাল লেগেছিল, কিন্তু স্বকীয়তার গণ্ডীর মধ্যে যতক্ষণ ভাল লাগা আবদ্ধ ততক্ষণ তো তৃপ্তি নেই। তাকে পরকীয়া করতে হবে। তাই সে ভাবছিল—আসমানতারার কাছে যাবে কি না। আবার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল—কিন্তু? ভূষণ দেখল সংস্কারকে তখনো সে এড়াতে পারেনি। তার অবচেতন মনের স্তরে লোকভয়ের ভীতি রয়েছে। সে বলছে: থাম, থাম, আর নয়, লোকে কি বলবে!

এ কয়দিন ভূষণের খেয়াল হয়নি, কিন্তু আজ মনে হল লোকে কি কিছু বলবে?

এই ভয়টা তার মনে কেন?

ভূষণ ভাববার চেষ্টা করল। ভেবে দেখল তার কারণ এই যে, আসমানতারা বাঈজী। কিন্তু প্রশ্ন হল আসমানতারা সত্যিই কি বাঈজী ভূষণের কাছে? তবে সে কি? প্রেয়সী?

অনেক খুঁজে নিজের মধ্যে উত্তর খুঁজল ভূষণ। দেখল, না, না, তাও নয়।

তবে?

সে নারী নয়, সে পুরুষ নয়, প্রিয় নয়, প্রিয়া নয়, শুধু বন্ধু। বন্ধুই কি? না, তাও নয়। সে এক বিরাট সত্তা, তার আত্মার অত্যন্ত নিকটে। তাকে আত্মীয় বললেই চলে। তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে জীবনে অসঙ্গতি। তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে সত্যের মৃত্যু। মুহূর্তে ভূষণ তার সমস্ত দুর্বলতাকে মুছে ফেলল। সে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তার জীবনের দুইটি সত্তা যেন দুই দিকে রয়েছে—এক পূবে গৌড়ের দক্ষল দরওয়াজায়—আর পশ্চিম গড়ে। একদিকে তার সত্তা স্রষ্টা, আর একদিকে তার সত্তা বিচারক। একদিকে তার শ্রম, আর একদিকে তাব অনুপ্রেরণা।

না, সে যাবেই।

ভূষণ পথে বের হবার জন্য প্রস্তুত হল।

হঠাৎ দেখল চমনলাল তার ঘরেব দিকে আসছে। একটু আশ্চর্য্য হয়ে সে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। ব্যবসায়ী চমনলাল, বাস্তব পৃথিবীর মানুষ চমনলাল—সে কেন অক্ষম কবির গৃহে? সে তো রসেব পূজারী নয়, দেহের পূজারী। কবিতা তার কাছে কিছু নয়, কবিতার যে প্রেবণা তাই তার ভোগ্য। একটু আশ্চর্য্য হয়ে সে চমনলালের দিকে তাকিযে থাকল। চমনলাল যেন তাকে দেখে মুখে একটা হাসি টানবার চেষ্টা করল—এই যে কবি কোথায় যাচ্ছ?

ভূষণ স্বাভাবিক হয়ে বলল: কোথাও নয়। কি খবর চমন ভাই?

চমনলাল বলল: তোমার কাছেই এলুম একটু ভূষণ।

— এস, বোস।

ঘরে গিযে বসল ওরা দুজন।

দারিদ্র্যের বিশাল প্রসার এই গৃহের চতুর্দিকে। তা দেখে চমনলাল মনে মনে একটু খুশি হল কি?

ভূষণ জিজ্ঞাসা করল: কি খবর বল?

চমনলাল বলল: ভূষণ, আমার একটা উপকার করতে হবে ভাই।

একটু হাসল ভূষণ: উপকার! শেঠ চমনলালের উপকার করব আমি!

চমনলাল বলল: ভাই, কে কখন কি উপকারে লাগে একমাত্র ভগবান ছাড়া সে কথা কেউ বলতে পারে?

ভূষণ খাঁ বলল: বল আমার মত অধম ব্যক্তি তোমার জন্য কি করতে পারে?

চমনলাল বলল: তুমি অধম নও ভূষণ। তোমার বিরাট গুণ আছে, তুমি একটু চেষ্টা করলেই উত্তম হতে পার।

একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল ভূষণ ঃ কি সে গুণ চমন ভাই ?

চমনলাল বলল ঃ তুমি কবিতা লিখতে পার।

শুনে ভূষণ হো হো করে হেসে উঠল ঃ কি বলছ হে! এই না তুমি কাল কাব্যকে দুর্বলের বিষয় বলে ন্যস্যাৎ করে দিয়ে গেলে ?

চমনলাল বলল ঃ না ভূষণ, সেটা আমার সত্যিকারের কথা নয়। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

ভূষণ বুঝতে পারল না যে, তা নিয়ে এত ব্যস্ত হবার কি আছে চমনলালের। বলল ঃ কিন্তু সে তো অতি সামান্য ব্যাপার, তা নিয়ে তুমি এত ভাবছ কেন ?

চমনলাল বলল ঃ না, না, সামান্য নয়, আমার ভয়ানক প্রয়োজন আছে।

একটু হেসে ভূষণ বলল ঃ কি ভয়ানক প্রযোজন ?

চমনলাল বলল ঃ আমাকে একটি কবিতা দিতে হবে।

ভ্রূ দুটো কপালে টেনে ভূষণ বলল ঃ তর জন্য এত ভণিতা! নিশ্চয়ই নেবে। বল কি কবিতা চাই।

—চাই তোমার গানের পদ।

—বেশ, দেব তোমাকে, লিখেই দেব।

চমনলাল বলল ঃ শোন তার মধ্যে একটি শর্ত আছে। শুধুমাত্র একটি নয়, অনেকগুলি দিতে হবে। রোজ দিতে হবে আমকে।

আশ্চর্য্য হয়ে ভূষণ বলল ঃ কেন বলতো ?

—প্রয়োজন আছে। বল দেবে ?

—কিন্তু রোজ কি করে দেব ?

চমনলাল উঠে গিয়ে ভূষণের হাত ধরল ঃ দিতেই হবে তোমাকে ভাই।

ভূষণ বলল ঃ সে কি সম্ভব ভাই ?

—আমি তোমাকে সে জন্য রোজ টাকা দেব।

ভূষণ বলল ঃ ভাই আমি গরীব, তাই বুঝি বিদ্রূপ করতে এসেছ ?

চমনলাল জিব কাটল। বলল ঃ ছি ছি! এই আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

—তবে টাকার কথা বললে কেন ?

চমনলাল একটু ভাবল। সত্য কথা সে বলতে পারবে না। কিন্তু কিছু একটা বলতে হবে। কি বলবে ? অবশেষে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বলল ঃ দেখ ভাই তোমায় সত্য কথাটি বলছি। আমি ব্যবসায়ী লোক, লাভ লোকসান বিচার না করে কথা বলি না। শোন আমি তোমার কবিতা নিয়ে ব্যবসা করব। হ্যাঁ, কবিতাতে তোমারই নাম থাকবে। রাজা রাজড়ার দরবারে আজ বাঙলা পদাবলীর দারুণ চাহিদা। প্রচুর দরে বিকোয়। আমিতো তোমাকে দান করছি না, ব্যবসা করছি। তুমিই বা কেন তোমর শ্রমের মূল্য নেবে না ?

ভূষণ বলল ঃ কিন্তু শিল্পকে টাকার মূল্যে বিক্রী করব ?

চমনলাল বলল ঃ কেনই বা করবেনা বল ? এই যে সুলতানের দরবারে কবিরা আছেন, তারা কি সে জন্য সুলতানের কাছ থেকে মোহর পাচ্ছেন না ?

ভূষণ বলল ঃ কিন্তু মোহরের প্রশ্নটা সেখানে বড় নয়। সেখানে হৃদয়ের একটি প্রশ্ন আছে, সেখানে কাব্যের বিশেষ মূল্যবোধের একটি প্রশ্ন আছে। রসিকজন যেখানে কাব্যরসের মূল্য দিচ্ছেন। কবিরা সেখানেই সার্থক।

চমনলাল বলল ঃ এ কবিতাও তো তেমনি রাজদরবারে যাবে। তেমনি রসিকজন এর সমাদর করবেন—তবে?

ভূষণ বলল ঃ হ্যাঁ, সেটা একটা প্রাশ্ন বটে।

—তাহলে তুমি প্রশ্ন করছ কেন? চমনলালের চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করতে লাগল। সে ভূষণ খাঁর হাত দুটি জড়িয়ে ধরল।

টাকার মোহ যে ভূষণ খাঁকে লুব্ধ করতে পারেনি, প্রচারের মোহে সেই ভূষণ খাঁ মুগ্ধ হল। কবির সার্থকতা তো বহু জনের মধ্যে তার প্রচারের মধ্যে। অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারলেই তো কবি সার্থক, কাব্য সার্থক। ভূষণ বলল ঃ আমি তোমাকে দেব কবিতা, দেব গান।

চমনলাল মুক্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল ঃ ওহঃ! আমাকে তুমি বাঁচালে বন্ধু। তোমার প্রতিটি পদের জন্য আমি তোমাকে পাঁচটি করে সোনার মোহর দেব।

কিন্তু সোনার মোহরের প্রলোভন ভূষণের মনের মধ্যে কোন দাগ কাটল বলে মনে হল না। ভূষণ খাঁ একটু চুপ করে ভাবতে লাগল। সাগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল চমনলাল। হঠাৎ এমন সময় বাইরে কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল। চমনলাল আর ভূষণ দুজনেই চমকে উঠল ঃ ওকি! বাইরের দিকে তারা উৎকর্ণ হল। ঘোষণা শোনা গেল ঃ "প্রবল প্রতাপান্বিত গৌড়েশ্বর বঙ্গ সুলতান ঘোষণা করিতেছেন যে, গৌড় হইতে যে সকল ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বাহিরে চলিয়া যাইবে, তাহাদের প্রত্যেককে গৌড়েশ্বর একশত করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিবেন"

শুনে চমকে উঠল যেন দুজনেই। ভূষণ বলল ঃ একি! একি আশ্চর্য্য ঘোষণা!

চমনলালও বলল ঃ তাই তো! তুমি কিছু বুঝলে কবি?

ভূষণ বলল ঃ না। দেখি বাইরে গিয়ে। সে ছুটে বাইরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চমনলালও ছুটে বাইরে এল। ঘোষকরা তখন রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে।

চমনলাল বলল ঃ ব্যপারটি কি বুঝলুম না তো?

ভূষণ বলল ঃ দেখি, বুরহানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। সে যাবার জন্য প্রস্তুত হো।

চমনলা ডাকল ঃ আমার কবিতা?

'আমি রাখব, তুমি নিয়ে যেও দুপুরে এসে।' ভূষণ ছুটে গেল বুরহানের ঘরের দিকে।

বৈঠকখানাতেই বসে ছিল বুরহান। রিহান সেখানে ছিল না। একান্ত যেন ব্যস্ত হয়েই সেখানে গিয়ে প্রবেশ করল ভূষণ। তার সেই ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখে বুরহান জিজ্ঞেস করল ঃ কি গো কবি তুমি হঠাৎ?

একটা ত্রস্তভাবে ভূষণ বলল ঃ দোস্ত তুমি শুনেছ?

বুরহান আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল ঃ কি?

—শোননি?

—কি? বল তো কি ব্যাপার?

—সুলতানের ঘোষণা শোননি?

—কি ঘোষণা? বুরহান ভূষণের দিকে তাকাল। এমন সময় কাড়ানাকাড়ার শব্দ আবার শোনা গেল।

ভূষণ বলল ঃ ঐ, ঐযে।

একটা শঙ্কার ভাব মুখে টেনে বুরহান সেই দিকে কান পাতল।

শব্দটা ক্রমে তাদের দিকে এগিয়ে এল। ধীরে ধীরে ঘোষক বুরহানের গৃহের সম্মুখেই এল। নাকাড়াটা আর একবার পিটিয়ে তারস্বরে ঘোষণা করল ঃ "প্রবল প্রতাপান্বিত গৌড়েশ্বর বঙ্গ সুলতান ঘোষণা করিতেছেন যে, গৌড হইতে যে সব ব্যক্তি সেচ্ছায় বাহিরে চলিয়া যাইবে, তাহাদের প্রত্যেককে গৌড়েশ্বর একশত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবেন।"

ভূষণ তাকাল বুরহানের দিকে ঃ একি! এর অর্থ কি?

বুরহান বলল ঃ তাই তো! ব্যাপারটা যেন কেমন ঘোরালো ঠেকছে!

ওরা দুজনেই বাইরে এল। ঘোষক তখনও চলে যায়নি। বুরহান তার কাছে এগিয়ে গেল ঃ কি ব্যাপার ভাই?

ঘোষক উত্তর দিল ঃ জানিনে জনাব। সুলতানের যেমন হুকুম তেমনি ঢোল পিটিয়ে জানাচ্ছি। সে এগিয়ে গেল।

ভূষণ বুরহানকে জিজ্ঞাসা করল ঃ কি দোস্ত্ খবর কিছু জানলে?

বুরহানের ততটা শঙ্কার ভাব আর নেই। সে বলল ঃ না—অন্য কিছু নয়। লোকসংখ্যা বেশী হয়েছে বলে সুলতান এই ঘোষণা দিয়েছেন।

ভূষণ বলল ঃ যাক তবু ভাল। কিন্তু কথা হোলো যে, লোকসংখ্যা বেশী হয়েছে বলেই তাদের তাড়াতে হবে?

বুরহান বলল ঃ তাড়ানো নয় সুলতান অনুরোধ করেছেন। জোর জবরদস্তির ইচ্ছে থাকলে আর স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখাবেন কেন?

ভূষণ বলল ঃ এ জবরদস্তির চেয়েও বেশী। লোভ দেখিয়ে মায়ের বুক থেকে সন্তান ছিনিয়ে নেবার মত।

বুরহান বলল ঃ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে কবি? গৌড় ছেড়ে যাচ্ছে কে?

ভূষণ বলল ঃ কেউ যাবেনা, কিন্তু সুলতানের হৃদয় বলে কোন জিনিষ থাকলে তিনি এমন নিষ্ঠুর ফতোয়া জারি করতে পারতেন কি?

বুরহান বলল ঃ তোমার কবির মন তো, তাই বেশী লাগছে।

ভূষণ দক্ষল দরওয়াজার কাছে সমবেত মানুষগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল ঃ ঐ মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ, ওরাও আজ বিমর্ষ।

এবার একটু না হেসে পারলনা বুরহান। বলল ঃ এ সবই তোমার মনের প্রতিফলন দোস্ত্। তুমি জান যে শুধু চোখের দেখাই দেখা নয়, মনের দেখাই দেখা। মনের অবস্থার উপর অনেক সময় চোখের দেখাটা নির্ভর করে।

ভূষণ বলল ঃ তুমি তাহলে বলছ আমার দেখাটা তাই ?

বুরহান বলল ঃ সবটা না হলেও কিছুটা তো নিশ্চয়ই।

তার কথা শেষ হতে না হতেই দূরে রিহানকে দেখা গেল। সে প্রায় যেন ছুটেই আসছে। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, কোন আনন্দের সংবাদ আছে তার কাছে। সে বরাবর বুরহানের গৃহের কাছে এসে থামল। উত্তেজনায় একটু হাঁফাচ্ছিল সে। কাউকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে সে-ই কথা বলল প্রথম ঃ শুনেছো তো!

--কি ?

আশ্চর্য্য হল রিহান। ওরা যে শোনেনি এটা যেন ওদের বিরাট একটি অজ্ঞতা।

সে বলল ঃ কাজি সাহেব গৌড়ের সব ভিক্ষুদের ডেকেছিলেন।

—কেন ?

--তিনি ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, একশত করে সোনার মোহর দিলে তারা গৌড় ছেড়ে যাবে কি না।

বুরহান বলল ঃ কি হল ? ওরা রাজী হল তো ?

একটা রহস্যের আনন্দে উদ্বেল হয়ে রিহান তাকাল ওদের দিকে ঃ কি মনে হয় তোমাদের ?

বুরহান বলল ঃ রাজী হয়ে গেল ওরা।

আনন্দে টগ্‌বগ্ করে ফুটতে ফুটতে রিহান বলল ঃ তুমি কিছু জানো না। ওরা বলল—"একশত সোনার মোহরের বিনিময়ে গৌড় ছাড়ব কাজি সাব ? কেন, গৌড়ে এতদিন থেকে কি একশত সোনার মোহরের বেশী আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি ? তাহলে আর গৌড়ের ভিক্ষুক হলাম কেন।" উত্তর শুনে তো কাজি সাহেব থ। "সুলতানী ঘোষণা বরবাদ হয়ে গেল।"

মানুষের জয় হয়েছে, ভূষণেরও তাই আনন্দের সীমা নেই। সে বলল ঃ যাক গৌড়ের মানুষ আজো তবে মরেনি। অর্থের লোভে যদি গৌড় ছেড়ে দিতে চাইতো, তবে বুঝতুম ওরা গৌড়ের কুসন্তান।

বুরহান ভূষণকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ না গো না কবি, সবাই তোমার মত গৌড়ের সুসন্তান, এবার খুশি তো।

ভূষণ বলল ঃ হ্যাঁ, আমি খুশি।

বুরহান বলল ঃ চল তবে আজ আনন্দ করা যাক।

ভূষণ বলল ঃ চল, কি করবে ?

রিহান বলল ঃ চল প্রথমে সরাইখানায় যাই, তারপর সব ঠিক করব।

তিন বন্ধুতে তৎক্ষণাৎ গলাগলি করে নগরীর বিলাসের অরণ্যে হারিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে চলল।

বুরহান বলল ঃ শুধু চমনলালটাই আমাদের সঙ্গে থাকল না।

রিহান বলল ঃ ওকে আর এখন পাওয়া যাবে না। ফিরবে একদিন যে দিন সর্বস্বান্ত হবে।

বুরহান বলল ঃ আল্লা করুন ও সর্বস্বান্ত না হোক। ওর শুভবুদ্ধি ফিরে আসুক!

রিহান বলল ঃ ওর শুভবুদ্ধি আর ফিরবে না—জান ও কি করেছে?

—কি করেছে? বুরহান আর ভূষণ রিহানের দিকে তাকালো।

রিহান বলল ঃ আসমানের প্রতিটি আসর সে এক মাসের জন্য কিনে নিয়েছে। ওতে যা খরচা, এবার বাণিজ্যের সমস্ত লাভটুকু তো ওর যাবেই—মূলধনেও টান পড়বে।

চমনলালের এতটা কাহিনী ভূষণের জানা ছিল না। শুনে একটুখানি যেন মনটা খারাপ হল। অন্ধ কামরিপুর বশে সে এগিয়ে যাচ্ছে। আসমানের জন্য তার একটু ভয় হোল, আবার তৎক্ষণাৎ ভয়টা কেটেও গেল। আসমানের শক্তি অসীম। নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তার আছে।

দুই বন্ধুর সঙ্গে সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক ভাবেই সরাইখানার দিকে এগিয়ে চলল।

দশ

"বোলো অর্মজ তাবে—
চিনিলাম তোমারে আমারে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

কেন যেন আসমানতাবার জন্য সকালবেলা উঠে মনটা আবার ব্যকুল হল ভূষণ খাঁর। সে কি চমনলালের মত কোন রিপুর তাড়নায়? হতে পারে, তবে তা কামরিপু নয় নিশ্চয়ই। কারণ আসমানকে দেখলে সে রকম আকাঙ্ক্ষাই জাগে না ভূষণের মনে। শুধু অন্তরটা ভরে উঠে, শুধু ভাল লাগে এই পর্য্যন্ত। মনে হয় যেন বহুতদিনের পরিচিত এক আত্মীয় সে। বহুকাল প্রবাসের পর সবাসে ফিরলে পরিচিতের স্পর্শে যেমন লাগে, ঠিক তেমনি মনে হয়। কে জানে কি সম্পর্ক আছে এই আসমানের সঙ্গে তার। বহু যুগ হতে কি তার সঙ্গে পরিচয় ছিল? অনাদিকালের স্রোতের সঙ্গে কি তারা দুটি যুগল আত্মা ভেসে আসছে? হঠাৎ কি মাঝখানে কোন বিপর্য্যযের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল—আবার তাদের দেখা হোল? কে জানে! যাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, জানা যায় না, কল্পনা দিয়ে তার কতটুকুই বা জানা যায়! কল্পনা করে অজ্ঞাত রহস্যের মর্মোদ্ধারের চেষ্টা শুধু নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এ কল্পনা না করলেও নয়। কল্পন করাটা মানুষের স্বভাব। এটি না থাকলে হয়তো মানুষ মানুষই হতে পারতো না। ভূষণও তাই কল্পনা না করে পারে না। পূর্ববর্তী জীবনের পরিচয় যদি নাই থাকে তবে কি আছে তাদের দুজনের মধ্যে, যা প্রথম দেখাতেই হঠাৎ তাদের টেনে নিল? এই টানবার মধ্যে কোন কারণ থাকা চাই।

চুম্বক লোহাকে টেনে আনে, টানার কারণ চুম্বকত্ব। এখানে কারণটা কি? যদি চুম্বকত্বই

হয়, তবে চুম্বক কে, আর লোহাই কে তাদের মধ্যে? না, না, এ চুম্বক নয়। দুয়েরই আকর্ষণে দুই দুইয়ের নিকট চলে এসেছে। এই আকর্ষণ এসেছে স্বভাব থেকে। তাদের দুয়েরই মধ্যে এমন একটি সম-চরিত্রের ভাব আছে যা মুহূর্তে তাদের কাছে টেনে আনতে পেরেছে। সেই স্বভাবটা কিসের? বোধ হয় শিল্পের। আসমান অবশ্য বলেছে সে শিল্পী নয়, শিল্পের আধার। কিন্তু সে কথাটা সত্য নয়। সেও শিল্পী। তার মনটা শিল্পীর, তাই শিল্পের জন্য তার সমবেদনা। অনায়াসে শিল্পীর মত সেও মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে যেতে পারে। তাই বহু দর্শক তাকে দেখে মুগ্ধ। কিন্তু ভূষণ আর আসমানের মধ্যে সম্পর্কটা হয়েছে একটু ভিন্ন রকম। দুইই দুয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে হয় তো, কিংবা দুইই দুয়ের মধ্যে অপরিচিত কিছু দেখতে পায়নি। যা দেখেছে তা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। তাই আসমানের মধ্যে ভূষণ দেখেছে তার নিজেরই প্রতিবিম্ব। আর আসমান? কথাটা মনে আসতেই একটা প্রশ্ন জাগে মনে। আসমানও কি তার নিজের স্বরূপকেই দেখেছে ভূষণের মধ্য? কে জানে! এ প্রশ্নের উত্তর আসমানই জানে ভাল। তবে সম্ভবতঃ আসমান তার নিজের ছবিই দেখে থাকবে, কারণ, ভূষণের বুকের মধ্যে যে ছায়া পড়েছে, একটু নীরব অবসরে নিজের অন্তরের মধ্যে তাকালেই যে ছায়ার স্বরূপ ধরা পড়ে তা আসমানের ছাড়া আর কারো বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রতিবিম্ব তো মূর্তি কাছে না থাকলে ধরা পড়ে না—এ তবে কেমন মনের দর্পণ? এ দর্পণ ব্যাখ্যাতীত। এর রহস্যের কথা জানলে আর কোন সমস্যাই থাকতো না। সে সমস্য নিয়ে ভূষণ আর ততটা মাথা ঘামাতে রাজিও নয়। তাই সে কল্পনার আশ্রয়কে ত্যাগ করে বাস্তবের মধ্যে নেমে আসতে চাইল। সে রওনা হল পশ্চিম গড়ের দিকে।

আজ আর হেঁটে নয়, এক্কা করেই চলল সে, কারণ সচেতন মনেই সে চলল। আর এক দিনের মত একটা মগ্ন-কল্পনায় হতচেতন অবস্থায় চলল না। এক্কা চলল পাথরের পথের উপর দিয়ে। দুধারে সমস্ত নয়নমুগ্ধকর অট্টালিকা। পথে পথে অজস্র পথচারী পথিক। শুধু যে সব বাঙালার, তা নয়, দেশ বিদেশের। ভারতীয়, ইরাণী, তুরাণী, আফগান, এমন কি খুঁজলে বোধ সেই দূর সাগরপারের লোকেদেরও পাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে তরাও নাকি আসে এখানে। মাঝে মাঝে এই ভীড়টা একঘেয়ে লাগে বটে, আবার এই ভীড়টাই যেন এ নগরীর জীবন স্পন্দন। সেটা গৌড়ের সুলতান বুঝতে পারছেন না। তাই নির্বিচারে কল্পনা করতে পারলেন যে, গৌড় থেকে কিছু মানুষ কমাতে হবে। এই ভীড়টা গৌড়ের পক্ষে অসঙ্গত নয়, অসমঞ্জস্যও নয়। গৌড়ের এই ভীড়ের মূল্যটা সুলতান বুঝতে পারবেন, যদি তিনি কখনো নির্জনে দূরে কোথাও গিয়ে বাস করেন। ভীড়েরও একটা আকর্ষণ আছে, ভীড়ের বাইরে না গেলে তা বোঝা যায় না ভীড়ের সেই আকর্ষণ দুই পাশে চলমান মানবস্রোতের আকারে টানতে লাগল ভূষণকে। সে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগল।

সুলতানের সেই ঘোষণার পর যেন এদের দেখতে আরো বেশী ভাল লাগছে। তাই তাকিয়ে তাকিয়ে, দেখতে দেখতে চলল ভূষণ খাঁ। তারপর একসময় ভীড়টা কমতে কমতে পাতলা হয়ে এল। পশ্চিম গড়ের বাঈজী-তল্লাটে এসে উপস্থিত হল এক্কা। আসমান

ছিল । দরজার পাশে পথের দিকে আকুল হয়ে তাকিয়ে ছিল যেন। ভূষণ এক্কা থেকে নামতেই চোখ দুটি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন রাত্রি শেষের অন্ধকারের পর সূর্য্যের প্রথম রশ্মি পড়ল পদ্মফুলের বুকে। ভূষণ আঁঙনায় উঠতেই তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে গিয়ে ঘরের ভিতর বসালো আসমান। বলা বাহুল্য এ ঘর তার নাচের মহল নয়। সে স্থান অন্যত্র। সে স্থান রাতের আসমানতারার, দিনের আসমানের নয়।

ভূষণ গিয়ে তার অভ্যাস মত মাটীর উপরেই বসে পড়ল। তবে আজ মাটীর উপর মাদুর বিছানো ছিল। বসল আসমানও। কিন্তু ভূষণ লক্ষ্য করে দেখল—একটু যেন অভিমান তার চোখে। কেন ?

আসমান বলল ঃ বুঝলুম, রাধাকে কেন বিরহিণী কল্পনা করেছিলেন কবিরা।

ভূষণ একটু হেসে তার মুখের দিকে তাকাল ঃ কেন ?

আসমান বলল ঃ পুরুষ নারীকে কাঁদাতে ভালবাসে বলে।

ভূষণ বলল ঃ হঠাৎ তোমার এ আবিষ্কারের কারণ কি ?

—কারণ কবি। কবিকে আকাঙক্ষা করেছিলুম বলেই বোধ হয় এই বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করলুম।

ভূষণ শুধু একটু হাসল মাত্র।

আসমান বলল ঃ একটি দিন না এলে কবির আনন্দ হতে পারে কিন্তু আমার যে হয় না। মেঘের আড়ালে লুকানো চাঁদের স্বভাব, তাতে হয়তো সে আনন্দও পায়, কিন্তু কৌমুদিনীর সুখ হয় কি ?

ভূষণ বলল ঃ অত কাব্য জানিনে।

আসমান বলল ঃ কাব্য যারা রচনা করে, তারা তাকে জানবে কি করে। স্রষ্টা সৃষ্টির খবর নেবেন, না সৃষ্টিই স্রষ্টার খবর নেবে ?

ভূষণ বলল ঃ দু'জনকে দু'জনের খবর রাখতে হয়।

আসমান বলল ঃ তা হলে কাব্য আপনি জানেন, একথা স্বীকার করতে হল।

—বেশ করলুম।

—তবে আর একটি কথা স্বীকার করুন।

—কি ?

—আপনি কথার খেলাপ করেছেন।

—যেমন ?

—রোজ একটি করে কবিতা আমার পাওনা ছিল, কাল পাইনি।

ভূষণ বলল ঃ আমার অন্যায় হয়েছে।

আসমান বলল ঃ বেশ অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করুন আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে।

—বল।

—আমি একটি পদ আবৃত্তি করব, আপনাকে বলতে হবে এর পদকর্তা কে ?

—বল।

—৭

আসমান আড়চোখে একবার ভূষণের দিকে তাকিয়ে নিয়ে পাঠ করতে লাগল ঃ

কি কহব মাধব প্রেমময় যাদব
বন্ধনে দিলা মন খুলি।
তব নটবররূপ শ্যাম শোভা অপরূপ
হৃদয় উঠত আকুলি।।

শুনবামাত্রই চমকে উঠল ভূষণ ঃ একি! এ পদ তুমি কোথায় পেলে?

আসমান কটাক্ষপাতে ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ যেখানেই পাই, বলুন এ পদের রচয়িতা কে?

ভূষণ ভাবতে লাগল, চমনলালের কাব্য-ব্যবসায়ের কথাটা কি তাহলে সম্পূর্ণ মিথ্যে! এই কারণেই সে পাঁচটি স্বর্ণমোহরের বিনিময়ে এই পদ কয়টি ক্রয় করেছে?

আসমান তাগাদা দিল ঃ কি চুপ করে রইলেন কেন, বলুন?

ভূষণ বলল ঃ যিনি তোমায় এ পদটি দিয়েছেন, তিনি কি বলেছেন?

আসমান বলল ঃ আমি এ পদ কিনেছি, কেউ দেয় নি।

ভূষণ অবাক হয়ে আসমানের দিকে তাকাল। বলল ঃ আসমান পাঁচটি স্বর্ণমোহর তবে তোমার?

আসমান বলল ঃ একটি স্বর্ণমোহরও আমার নয়, আমি কিনিয়েছি।

ভূষণ বলল ঃ একি করিয়েছ তুমি?

আসমান বলল ঃ কবির মূল্য দিয়েছি।

—কিন্তু কাব্য কি অর্থের বিনিময়ে বিক্রী করবার...?

আসমান বলল ঃ শুধু অর্থ কেন, হৃদয় দেখলেন না এর মধ্যে? হৃদয়ই তো তাকে পেয়েছে।

ভূষণ বলল ঃ সে বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই, তবে প্রশ্ন কি জান?

—বলুন?

—চমনলালটা সর্বস্বান্ত হবে।

আসমান বলল ঃ আমি তো তাই চাই।

—কেন?

—স্বভাব। আগুন কি না পুড়িয়ে পারে? পোড়ানোটাই যে তার স্বভাব। হয় তো তার অন্তরের মধ্যে কোন যন্ত্রণা আছে তাই না পুড়িয়ে সে পারে না। সুতরাং আগুন যে জ্বালে—আগুন তাকেও ক্ষমা করে না। চমনলালেরা আগুন জ্বেলেছে, ঐ আগুনে ওদের পুড়তে হবে।

ভূষণ বলল ঃ বিত্তশালীদের প্রতি তোমার একটা বিদ্বেষ আছে। কেন ?

আসমান বলল ঃ ঐ বিত্তশালীরা কামুক আর লম্পট, তাই। নিজেদের উপভোগের জন্য অপরের সর্বনাশ করতে ওদের একটুকু বাধে না। ওদের যে ক্ষমা করে সেও পাপী।

ভূষণ বলল : ওদের পাপের ফল এমনি আসে। শাস্তি দেবার আর প্রয়োজন হয় না।

আসমান বলল : এমনি নয় কবি, আসে কোন উপলক্ষ্যের মধ্য দিয়ে। আমি সেই উপলক্ষ্য।

ভুষণ বলল : একা তুমি কত জনের সর্বনাশ করবে?

আসমান বলল : যতজনের পারি। ওরা একটি ঘর ভেঙেছে, আমি যদি দশটি ঘর ভাঙতে পারি তবে তা বেশী হবে না কি?

ভূষণ বলল : আসমান, তোমার কথা শুনে আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, একটি বিরাট বেদনাদায়ক ইতিহাস তোমার পেছনে রয়েছে, কিন্তু সে ইতিহাস কি আমি শুনতে পাবি না?

আসমান এক মুহূর্ত কোন কথা বলল না। কেমন যেন উদাসীন হয়ে কোন্‌দিকে তাকালো। তারপর ভূষণের মুখের দিকে মুখ তুলে বললঃ হ্যাঁ, আমি বলব।

—বল।

আসমানের দৃষ্টিতে অতীতের একটা স্বপ্নের ভাব ফুটে উঠল। মনে হল তার সেই দুটি চর্মচক্ষেই সে যেন স্পষ্ট কি দেখতে পাচ্ছে এখন। ধীরে ধীরে ধীরে আসমান বলতে লাগল : আদিনাতে আমাদের ঘর ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষ প্রকৃতপক্ষে আদিনাথের মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। আজকে সে মন্দির আদিনা মসজিদ হয়েছে বটে, কিন্তু ওটা তো আর মসদিজ ছিল না। আজকে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি এসেছে বটে, গৌড়ে কিন্তু এক সময় মসলমানেরা হিন্দুবিধ্বংসী ভূমিকাই নিয়েছিল। মন্দির ভাঙলে তারা গৌরব বোধ করত। আদিনাথের মন্দির ভেঙে তাই তারা মসজিদ তৈরী করল। আমার পূর্বপুরুষ কর্মচ্যুত হলেন। নিষ্কর সম্পত্তি ভোগ করতেন— মুসলমানদের সময় কর দিতে হল। তাই নিয়ে কোন রকমে দিন চলত। আমবাগানে ঘেরা ছিল আমাদের বাড়ী। আমার মা ছিলেন তাণ্ডার মেয়ে। মায়ের রূপের অন্ত ছিল না! তল্লাটে তার সুন্দরী বলেই নাম ছিল। কিন্তু....” মুখখানা একটু গম্ভীর হল আসমানের।

ভূষণ বলল : তারপর?

—মা আমাকে বড় ভাল বাসতেন। আমিই তখন তার একমাত্র কন্যা। মুহূর্তের জন্যও আমাকে চোখের আড়াল করতে পারতেন না তিনি। আমার মনে আছে সেই দিন—আমি আর মা—আমবাগানের ছায়াতে দাঁড়িয়ে আম কুড়াচ্ছিলাম। এমন সময়...

—কি?

আসমানের মুখ আবার অন্ধকার হল, বেদনায় মলিন হল। তারপর তার একটা হিংস্রভাব ফুটে উঠতে চাইল। কিন্তু তবু সে বলল। বলল : এমন সময় গৌড়ের একজন মালিক যাচ্ছিলেন এ পথে। কেন, কিসের জন্য, কে জানে! নইলে গোপন পথেই বা তিনি চলবেন কেন। তিনি বারবার এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। ঘোড়ার উপর সেই 'শ্মশ্রুমণ্ডিত' বীভৎস চেহারা দেখে আমি চিৎকার করে উঠলুম। মাকে জড়িয়ে ধরলুম। মা মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে ভেতরবাড়ীর দিকে যেতে চাইলেন। কিন্তু সেই মালিক

নিজের হাতে মাকে ধরে ফেললেন। মা চিৎকার করে উঠলেন। ভয়ে আমিও চেঁচাতে লাগলুম। বাবা বোধহয় এলেন, কিন্তু সেই মালিকের সঙ্গে অনুচরেরা ছিল। বাধা দিতেই তারা বাবাকে কেটে ফেলল। উঃ কী রক্ত! আমার মনে আছে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম।

তারপর জ্ঞান ফিরলে দেখি আমরা এক বিরাট প্রাসাদে আছি। দাস-দাসী, চাকর-বাকর কারো অভাব নেই। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের বিলাসে মা কোনদিন ভোলেন নি। তিনি প্রকৃত হিন্দু নারীর মতই কাজ করলেন। একদিন সেই লম্পট আমীর যখন কামরিপুর তাড়নাতে মায়ের কাছে এসে উন্মত্ত অবস্থায় পড়ল, মা তারই কোমরের ছোরা বের করে তার পেটের মধ্যে আমূল বসিয়ে দিলেন। বান্দারা ছুটে এসে মাকেও মারতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন বিরাট এক তলোয়ার উঠিয়ে মায়ের মাথাতে মারতে গেল। আমি চিৎকার করে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

—তারপর ?

—জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি আর এক প্রাসাদে। দেখলুম একজন সুন্দরী রমণী আমাকে কোলে নিযে রয়েছেন। তিনিই আমাকে মানুষ করলেন। লেখা পড়া শেখালেন, গান শেখালেন, নাচ শেখালেন। কিন্তু যখনই আমার একটু বুদ্ধি হল তখনই আমি বুঝতে পারলুম, তিনি কে। আমাকে এত যত্ন করবার মধ্যে তার কি উদ্দেশ্য। তিনি বাঈজী বিদরুন্নিসা বিবি। তা হোক, বাঈজীরও হৃদয আছে। আমাকে স্নেহ দিয়ে তিনিই মানুষ করেছিলেন। আমি মানুষ হলুম তারই কাছে। সেইখানে আমি কাব্য পাঠ নিতুম কবির শেখের কাছে।

—কবির শেখ! আশ্চর্য্য হল ভূষণ। কবি কবির শেখ!

আসামান বলল ঃ হ্যাঁ। তিনিই আমাকে পড়াতে লাগলেন। আশ্চর্য্য স্বভাব ছিল তাঁর। যখন শিল্পের জগতে চলে যেতন তখন তাকে অন্য মানুষ মনে হত। আমি যেন দেখতুম, মুর্তিমান শিল্পদেবী তার মধ্যে অধিষ্ঠিতা হয়ে আমাকে মুগ্ধ করছেন। তিনিই আমাকে বোঝালেন, কাব্যচর্চা করতে হলে মাতৃভাষাই শ্রেয় ঃ অথচ প্রচলন ফার্সী কবিতা পাঠ, হিন্দী গান শেখা, গজল শেখা। তিনি আমাকে ওসব কিছুই শেখালেন না। শুধু শেখালেন বাঙলার পদ কীর্তন। কিছুদিনের মধ্যে আমি জানলুম, এ পদগুলির রচয়িতাও তিনি। তখন আমার কীই যে ভাল লাগল কি কবে বলব। আমি তাকে ভালবেসে ফেললুম। আরো বেশী করে ভালবাসলুম এই কারণে যে, তিনি আমাকে ভালবাসলেন কিনা বুঝতেই পারলুম না। আমি যে গৃহীব কন্যা তাই ব্যক্তিকে ভালবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। একদিন আবার, আবার সেই রক্তের সম্মুখীন হলুম আমি। এক্কা করে ফিরছিলুম নহবৎখানা থেকে, পথের মধ্যে কারা আক্রমণ কবল আমার এক্কা। পাশে ছিলেন কবির শেখ। তাকেই দুষমনেরা আক্রমণ করল। মুহূর্তে তার রক্তাক্ত দেহটা এক্কা থেকে গড়িয়ে পড়ল। আবার আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম। আমাকে নিযে এসে বিদরুন্নিসার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল এক্কাওয়ালা।

জ্ঞান ফিরলে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। বিদরুন্নিসা, আমার মালিকানের

মুখে আমি তখন যে স্বর্গীয় দীপ্তি দেখেছিলুম তার তুলনা নেই। মানুষ বাইরে থেকেই বাঈজীকে দেখে, কিন্তু তার ভেতরটা যদি দেখতো তা হলে বুঝতো বালুকাপ্রান্তরের ঝিক্‌মিকের আড়ালে একটি স্নিগ্ধ ফল্গুনদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিতে দিতে লাগলেন। আমি দেখলুম তার চোখে উদ্গত কয়েক ফোঁটা অশ্রু। আমি 'আম্মা' বলে তাকে জড়িয়ে ধরলুম।

তিনি বললেন ঃ আম্মা তুমি কেঁদোনা। তোমাদের জীবনে ভালবাসতে নেই।

আমি বললুম ঃ কিন্তু এ কাজ কে করল আম্মা ?

—শামসুদ্দিন যানি। তোমার উপর তার লোভ পড়েছে।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম ঃ সে এত নীচ ?

বিদরুন্নিসা মালিকান বললেন ঃ হায় মনের খোঁজ না নিয়ে রূপের মোহে যারা বিভ্রান্ত হয় তারা কেইবা মানুষ আম্মা ! এ জগতে তো মানুষের সন্ধান তুমি পাবে না, আমাদের এ জগতে যারা শঠ, লম্পট তারাই আসবে। তাদের কোনদিন বিশ্বাস কোরো না ; আর.....তিনি থামলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম ঃ কি আম্মা ?

আম্মার চোখে কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠল। তিনি বললেন ঃ আমাকে একটি কথা দিতে পারবে আসমান ?

—বল আম্মা।

—কাউকে তুমি ক্ষমা কোরোনা। যত জনের পারবে সর্বনাশ করবে। মনে রেখ আমাদের জীবনের সেখানেই একমাত্র সার্থকতা। আর, আর ভালবেসোনা কাউকে। কারণ, ভালবাসা আমাদের হাতের নাগালের বাইরে। আমি প্রতিজ্ঞা করলুম।

ভূষণ আর কোন কথা বলতে পারল না। চুপ করে মাটীর দিকে মাথা নীচু করে তাকিয়ে থাকল।

আসমান আবার বলতে লাগল ঃ "মালিকানের জীবদ্দশায় আমি তার প্রাসাদেই ছিলুম। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আমি এখানে চলে আসি। এ জীর্ণ কুটীরই আমার পছন্দ। এ আমার একদা স্বপ্ন ছিল কিন্তু সার্থক হোল না। দু'জনে থাকবার কথা ছিল, না হোক, একাই থাকলুম। তবু যেন আমার তৃপ্তি।" ভূষণের দিকে তাকাল সে। বলল ঃ আচ্ছা কবি, প্রাসাদের চেয়ে এ জীর্ণ কুটীর ভাল নয় ?

ভূষণ বলল ঃ সহস্র গুণ ভাল। এ অকৃত্রিম, তাই সুন্দর। এ যে মাটির কাছাকাছি আছে।

আসমান বলল ঃ তাই আপনি এলে আমি কোন আসন পেতে দিই না, মাটিতে বসলে বাধা দিই না। কারণ আমি জানি, কবিরা মাটীর কাছাকাছি থাকতে ভালবাসেন। যে কবি মাটী ছেড়ে দূরে আছেন তিনি কবি নন।

ভূষণ আসমানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আসমান বলল ঃ জানেন, ভেবেছিলুম ভালবাসব না আর কোদিন, স্নেহের সম্পর্কও স্থাপন করব না। কিন্তু হায়, অদৃশ্যে যে ঈশ্বর আছেন তাঁর খেয়াল কে জানে! মানুষ

যা ভাবে, তিনি ভাবেন তার বিপরীত। কিষে ইচ্ছা তাঁর মনে আছে, কে জানে। আবার দেখা হোল আপনার সঙ্গে।

প্রথমটাতো আমি ফিরে তাকাইনি আপনার দিকে। আমি শুধু খোঁজ করছিলুম ঐশ্বর্য্যের ঝলকানি কোথায় আছে তাই। কাবণ ওদেরই সর্বনাশ করতে হবে। সবার কাছ থেকে প্রচুর বকশীস পেয়ে মনে মনে ভাবছিলুম, আমার উদ্দেশ্য সফল—মুগ্ধ হয়েছে সবাই। রূপের আগুন, কামনার আগুন জ্বালিয়েছি ওদের মনে। এবার ঝাঁপিয়ে পডতে আরম্ভ করবে। যারা ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা দেখবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখব তাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা। কী ভালই লাগছিল, সেই মুহূর্তে চোখে পড়ল আপনাকে। ক্ষুব্ধ হলুম, ক্রোধ হল, দরিদ্রের আবার সখ কেন? মনে হল অপমান করি এ লোকটাকে। তাই গিয়ে হাত পেতে বকশীস্ চাইলুম। কিন্তু যে আঘাত দিতে চেয়েছিলুম, তার চেয়ে দ্বিগুণ আঘাত এসে লাগল আমার বুকে। আমি পেলুম ঃ

কি দিব তুযাবে ধনি।
আপনি অপরূপ রূপ রমণী মণি।।
স্বরগ জিনিযা মণি ধরল নযন বর।
রাই মুখ রূপ হেবি গরগর অন্তর।।

আমি দেখলুম আমার শেখ কবির দাঁড়িযে রয়েছেন। আবার আমার মনের মধ্যে অতীতের সেই দুঃসহ স্মৃতি ফিরে এল। আমি আপনার মুখের দিকে তাকালুম। সেই চোখ, সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই আপনভোলা স্বপ্ন। হেরে গেলুম, একে তো লুণ্ঠন কবে শেষ কবা যাবে না। এই যে লুণ্ঠন করে নেব সব! নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করলুম। বিদরুন্নিসা বিবি, আমাব আম্মার কথা মনে পড়ল—কিন্তু তবু পারলুম না, তাই শেষপর্যন্ত বিদায বেলা ডাকলুম আপনাকে। কবি, আপনি জানেন না আপনি আমার কত পরিচিত।' আসমানের চোখ দুটি একটু ভিজে উঠল বোধহয়।

ভূষণ বলল ঃ তুমিও জাননা আসমান, তুমিও আমার কত পরিচিত। প্রেমের কথা মনে পড়েনি, স্নেহের কতা মনে পড়েনি, তোমাকে দেখে হঠাৎ আমার যে কথা মনে পড়েছে—তা এ ঃ তুমি শুধু পরিচিত। তুমি শুধু আমার আপন।

তুমি না থাকলে আমার নিজেকে আমি দেখতে পাই না। তাই কোন কামনা নিযে নয়, কোন বাসনা নিয়ে নয়, শুধু নিজেকে জানার জন্য আমি তোমার কাছে আসি।

আসমান বলল ঃ কি জানি, জানি না। আমিও ভাবি, ভাল কি বেসিছি আমি আপনাকে? কি চাই আপনার কাছে? কি চাই, জানি না। শুধু সান্নিধ্য চাই। কৌমুদিনী কি চন্দ্রকে ধরতে পারে? পুষ্প কি সূর্য্যকে ছুঁতে পারে? পারেনা তবু তো চন্দ্র না হলে কৌমুদিনীর চলে না, সূর্য্য না হলে গোলাপের অধরোষ্ঠে হাসি ফোটে না। কেন? এ কথার উত্তর কে জানে কবি? এই কি প্রেম? শুধু চাওয়া, পাওয়া নয়?

ভূষণ বলল ঃ শুধু কি দেখা, আস্বাদন নয়?

—আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা কি জাগে কভু?

—না।

আসমান বলল ঃ আমিও তাই ভাবি, কেন নয়?

ভূষণ বলল ঃ নিজেকে আব নিজে কি আস্বাদ কববে। আপন দেহকে আলিঙ্গন কবে কি কেউ চুম্বন কবে? দর্পণে নিজেব প্রতিবিম্ব দেখে কি কেউ উন্মাদ হয়ে যায়? যায় না। শুধু একটা মন্ময় ভাবে নিজেবই মধ্যে হাবিযে যেতে চায়, উন্মাদ হয না। তুমি আমি যে এক। এক অনাদিকালেব স্রোতে ভেসে এসেছি অভিন্ন হযে—তাই উন্মাদনা নেই, কিন্তু মন্মথ এক রূপে নিজেকে দেখবাব আকাঙ্ক্ষা বযেছে।

আসমান বলল ঃ তবে ক্ষণিকেব অদর্শনে এত চঞ্চল হই কেন?

ভূষণ বলল ঃ ক্ষণিকেব অদর্শন কাব আসমান?

'আপনিব' ব্যবধান ছেড়ে দিযে 'তুমি'-তে নেমে এল আসমান বলল ঃ

—তোমাব।

ভূষণ বলল ঃ না, আসমান, তোমাব নয 'আমাব'। আমাব তোমাব মধ্যে 'তুমি' নেই, শুধু 'আমি' আছি 'আমি' আছি। সে আমিকে দেখতে পাই না বলে চঞ্চল হয়ে উঠি। তুমি একটি পদ্মফুল, আমি তোমাব জল। আমাব মধ্যেই তোমাব প্রাণবস, আবাব আমাব মধ্যেই তোমাব অভিব্যক্তিব স্ফুবণ। আমাব মধ্যেই ফুটে উঠে তুমি আমাতেই তোমাব নিজেব প্রতিবিম্ব দেখ। আব আমাবই জীবনবস তোমাব মধ্যে কমলিনী রূপে ফোটে। আমাবই জীবনসত্তা তোমাব মধ্যে নিজেকেই অবলোকন কবে। তাই তো এখানে আকাঙ্ক্ষা কামনাপঙ্কিল নয। তাই তো বাসনাতে মধুবতা আছে কিন্তু উন্মাদনা নেই। তাই বাধাব কল্পনা কবেছেন কবিবা। আকাঙ্ক্ষাকে দূব কবে দেখিযেছেন, পবকে চাওযাটা প্রেম ; পব কে আপনরূপে দেখা মহাপ্রেম। শ্রীবাধিকা যেদিন কৃষ্ণকে আব আপন সত্তাব বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন আব কিছুই দেখলেন না, সেই দিনই তো মহাপ্রেমেব স্তবে গিযে পৌঁছুলেন।

আসমান বলল ঃ কবি, তাহলে তুমি আমাকে সেই মহাপ্রেমেব স্বাদ অনুভব কবতে দাও। তোমাব ছাযাতে আমাকে আমাব প্রতিবিম্ব দেখতে দাও তুমি। কোনদিন আব দূবে যেও না।

ভূষণ বলল ঃ দূবে গেলে আমি যে আমাব নিজেকেই হাবাব আসমান। দূবে আমি আব যাব কি কবে?

আসমান বলল ঃ কিন্তু কবি, আমি ভাবি, আমবা দু'জন যদি অবিচ্ছেদ্য, আর যদি একই প্রাণ-স্রোতেব মধ্যে প্রবাহিত, তবে কবিব শেখ, আব ভূষণ খাঁ, দুই ব্যক্তি হল কেন?

ভূষণ বলল ঃ শিল্পচেতনার দুই সত্তা নেই, একই সত্তা, কিন্তু দুটি প্রকাশ। শেখ আব খাঁ দুজনে সেই একই স্রোত। কিন্তু পবিবেশে ভিন্ন আকার। গৌড়েব উপকণ্ঠ দিযে এইযে গঙ্গা প্রবাহিত, সে হিমালয় থেকে আবম্ভ কবে সর্বত্রই এক। কিন্তু হিমালয়েব পাদদেশে তার যে উচ্ছল স্রোত, গৌড়ে কি তাই আছে? নেই কেন? ও তো একই গঙ্গাব স্রোত। তবু লছমনঝুলার কাছে যে খবস্রোতা গঙ্গা, তার কাবণ সে হিমালয়েব কাছে বলে। সৃষ্টি থেকে দূরে যে তার বিস্তার বেশী, প্রসার বেশী, কিন্তু স্রোত কম। শেখ

কবির সৃষ্টির কাছাকাছি, তাই বেগবান, তোমাকে সে ছুটিয়ে আনছিল। আমি দূরে, বেগ কম, তোমাকে শুধু ভাসিয়ে রাখছি।

আসমান উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ভূষণ খাঁর মুখের দিকে তাকাল। বলল ঃ সত্যি বলেছ কবি। কবির শেখ সত্যি ছিল দুরন্ত স্রোত, আমি সেই প্রবাহে ভেসেই এসেছি। কখনো ঢেউয়ের দোলায় দোলায় চঞ্চল হয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। তোমাতে এসে আমি দাঁড়াতে পেরেছি। তোমার ছায়াতে আমি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছি। নিজেকেই যেন দেখছি শুধু, মুগ্ধ হয়ে দেখছি। তাই তুমি কাছে এলেও কোন গভীর আন্দোলন জাগে না মনে, শুধু এক মন্ময়তার ভবে থাকি। দূবে গেলে নিজেকে দেখতে পাই না, মনে হয় আমি নেই বুঝি।

ভূষণ বলল ঃ এও থাকবেনা যে দিন তোমার কমল-সত্তা জলের মধ্যে জল ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না, তোমার প্রাণ-চেতনা তুমি যেখান থেকে টানছ, তুমি যখন সেই উৎসে মিশে যাবে।

আসমান বলল ঃ তাই কর, কবি তাই কব, আমাকে তুমি উৎসে মিশিয়ে দাও।

ভূষণ বলল ঃ সাগরের পথে যাচ্ছি আমবা, সেখানে গিয়ে পৌঁছুলে আব আমাদের কোন পৃথক সত্তা থাকবে না আসমান।

অত্যন্ত বিমর্ষ অথচ শান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টিতে আসমান তাকালো ভূষণেব দিকে ঃ সাগব আর কত দূর ?

এগার

"তুমি কেমন কবে গান কবহে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি শুধু শুনি"
—রবীন্দ্রনাথ।

চমনলাল একেবারেই উধাও হয়ে গেছে বন্ধুবান্ধবের আসর থেকে। মোহে যখন মানুষকে পায় তখন কি আর তাকে ফেরানো যায়! যায় না। নদী যদি একবার সাগরের পথে ঝাঁপিয়ে নামে, বাঁধ দিয়েও তাকে রাখা যায় না। চমনলালকেও উপদেশের বাঁধ দিয়ে রাখতে পারল না আর কেউ। সাগরের সন্ধান সে পেয়েছে কি না কে জানে। পায় নি নিশ্চয়ই। সাগরের গন্ধ পেয়েই নদী মোহনাতে কত স্থির হয়ে যায়। কোন কিছুর তাড়নাতে খরস্রোতা নদীর ছুটে পালিয়ে বেড়ানোর ভাবখানা আর থাকে না। কিন্তু আজো চঞ্চল, আজো উদ্‌ভ্রান্ত সে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আজো। কে জানে সাগরের পথে সে গিয়েছে না মরুভূমির পথে গিয়েছে। মরুভূমির পথে যে নদী গিয়েছে সে তো ধারা হারিয়ে ফেলবে। চমনলাল শেষপর্যন্ত নিজেকেই আর রক্ষা করতে পারবে কিনা কে বলবে!

সেই চমনলালের জন্য বন্ধুদের মনে একটু দুঃখ হয় বৈকি। ছোটবেলা থেকে যে

তারা একজায়গায় বেড়ে উঠেছে! গৌড়ের পূর্বদিকটা তাদের কাছে সম্মিলিত রূপের মধ্যে পরিচিত। দক্ষল দরওয়াজাতে তারা সবাই এক সঙ্গে বসে। একটা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত তারা সবাই যেন অবিচ্ছেদ্য। হঠাৎ সেই ঐক্যবদ্ধ দেহ থেকে কারো বিয়োগ ঘটলে দুঃখ হয় বৈকি। কিন্তু পৃথিবীর গতি এই বিচ্ছেদের উপর। জীবনের স্রোতে এক সঙ্গে থাকা দায়। জীবন সংগ্রাম আরম্ভ হতেই ঐক্যের মধ্যে ভাঙন লক্ষ্য করা যায়। তবু গৌড়ের কয়টি যুবক অন্ততঃ জীবনের তিনটি দশক পরস্পর কাছাকাছি ছিল। কখনো তারা বাইরে গিয়েছে বটে, কিন্তু অন্তরের স্রোতে কোনদিন বাধা পড়েনি। তারা মনের কাছে পাপাপাশি থেকেছে। সাময়িক বিরহ হয়েছে আবার মিলন দেখা দিয়েছে। তখন মিলনের আনন্দকে আরো বেশী ভাল লেগেছে। রিহান আর চমনলাল যেদিন দূর দেশে গিয়েছিল বাণিজ্যের জন্য গৌড়ের দক্ষল দবওয়াজা নিশ্চয়ই সেদিন তাদের অভাব বোধ করেছে। যারা বাইরে গিয়েছিল তারাও তাদের অদর্শনে বেদনা বোধ করেছে। কিন্তু মজা এই যে, শুধু চোখের দেখার অভাব ঘটেছিল—মনের মধ্যে ব্যবধানের দূরত্ব সৃষ্টি হযনি কোন দিন। প্রথম দীর্ঘ বিচ্ছেদের পালা শুরু হল জালালকে দিয়ে। সুলতানের কাজে সে গেল বাইরে। সময় বাধা নয, কবে সে ফিরবে তাও জানা নেই। কিন্তু সে বিরহ সহ্যের অতীত নয়। কারণ কাজের জন্য চোখের যে অড়ালে যাওয়া, সম্মানের প্রাপ্তিতে তা গৌরবে ভরে থাকে। তাই জালালের জন্য ব্যথাবোধ হলেও সান্ত্বনার একটি ঠাঁই আছে সেখানে। কোনদিন নিশ্চয়ই জালাল ফিরবে, আর ফিরবে এই যে আকাঙ্ক্ষা, তা মনে মনে থাকার জন্য দূরত্বটা কাছাকাছি হযে গেছে। কিন্তু চমনলালের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্য রকম। সে কাছে থেকেও এখন দূরে। যে দূরে আছে তার অদর্শন বিচার দিয়ে বিবেচনা করে সহ্য করা যায়। দূরে গিয়েও সে বেঁচে থাকে। কিন্তু কাছে থেকেও যাকে দেখা যায় না তাকে যে মৃত কল্পনা কবা ছাড়া আব উপায নেই! মৃত্যুর অন্ধকারলোকে হারিয়ে যাওয়ার চাইতেও এ বেদনা নিষ্ঠুর। হারিযে যাওয়া ভাল। কিন্তু কাছে থেকেও অন্তরের সংযোগ হারানো আরো ব্যথার। চমন সেই অন্তরের যোগসূত্র কেটে দিয়েছে। শুধু সেই কারণে তার জন্য বেদনাটা একটু বেশী।

বেদনাটা বেশী কিন্তু অসহ্য নয়। কারণ কোন বেদনাই মানুষের সহ্যের অতীত নয়। যদি সহ্যের অতীত হয়, সে বেদনা থাকে না, অর্থাৎ সহ্য করতে হয় না। যে আধার বেদনাকে ধরে রাখবে তা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কিন্তু যে বেদনা সহ্য করা যায়, তার তীব্রতা চিরস্থায়ী নয়। দুঃখের স্বভাব কিছুটা জলের মত। পাত্রে রাখো থাকবে, কিন্তু ধীরে ধীরে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। একদিন শেষপর্য্যন্ত তার চিহ্নমাত্র থাকবে না। শুধুমাত্র আধারের রাসায়নিক ক্রিয়াতে কোথাও একটু দাগ লেগে থাকতে পারে। সে কথা লক্ষ্য করলে কখনো কখনো ধরা দেয়, নয়তো অদৃশ্যই থাকে।

চমনলালে বিরহটা বেশ একটু বেশীই বেজেছিল বন্ধুদের মনে। কারণ লোকটা হাসিখুসি ছিল, দিলদরিয়াও ছিল। শিল্পচেতনাটা তার প্রখর না হলেও অন্তরটা সাদা ছিল। কিন্তু এই সাদা অন্তরের অর্থাৎ রঙহীন অন্তরের একটা বিপদও আছে। যার নিজের রঙ নেই, অপরের রঙ তার উপর প্রতিফলিত হয় সহজে। চমনলালের সেই সাদা মনের উপর

হঠাৎ রামধনুর সাত রঙ নিক্ষেপ করেছে আসমানতারা। আর সেই সাতরঙকে ধারণ করেছে বর্ণহীন চমনলালের কামনার বাষ্প। যতদিন এ বাষ্প থাকবে, ততদিন চমনলালের মুক্তি আছে কি? যৌবনে মনের আকাশে যে এমন বাষ্পের অভাব থাকে না। বর্ষার আকাশে দীর্ঘস্থায়ী জলভরা মেঘের মত তা অনবরতই ঘোরা-ফেরা করে। চমনলাল তো যৌবনকে অতিক্রম করেনি এখনো। তাই চমনলালের জন্য দুঃখ। কিন্তু সেই দুঃখের তীব্রতাটা যে ধীরে ধীরে অনেক কমে না আসছে তা নয়। কারণ একে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করে নিয়েছে বন্ধুবান্ধবেরা। তাই তারা একদিন তাদের নিত্যকারের সঙ্গী চমনলালকে বাদ দিয়েও দক্ষল দরওয়াজাতে জমায়েত হচ্ছে। তেমনি করে অপরাহ্নে গৌড়ের আকাশে রঙের বিচিত্র খেলা দেখছে। তেমনি করে আগত অন্ধকারের মধ্যে আম্রকাননের সবুজ শীর্ষে স্নিগ্ধ ছায়া জমতে দেখছে। তাদের পরিচিত গৌড়ের চোখের সামনে বসে তারা তাকে নিয়ে আলোচনা করছে।

এই আলোচনার ধারাটা ব্যহত হতে পারে না, হবে না। কেউ যদি না থাকে, একক একজনও এসে এই দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়িতে বসবে। যেন গৌড়-নগরী নিজেই ডেকে আনছে তাকে। তারো তো বিশেষ রূপ আছে, তারো তো আকাঙ্ক্ষা আছে যে, কেউ তাকে চিনুক। তার মধ্যে যারা আছে তারা কি করে দেখবে তাকে! বাইরে না এলে কি দেখা যায়! মাতৃস্নেহে থেকে মাকে বোঝা যায় না। স্বাবলম্বী হয়ে দূরে না দাঁড়ালে পিতার প্রতিনিধিত্বের মূল্য বোঝা যায় না। নগরীব বাইরে না এলে কি গৌডকেই দেখা যায়! তাই বোধহয় বহু যুগের পূর্ব দেশের অপূর্ব সুন্দবী নগরী তাব রূপ দেখাবার জন্য আশ্রিতদের বাইরে ডেকে আনে এক জাদুময় হাতছানিতে। দরওয়াজার বাইরে তাকে দাঁড করিযে রেখে বলেঃ দেখ দেখ। আকাশ দেখ, বাতাস দেখ, আমাকেও দেখ।

তাই ছুটে আসে দলে দলে লোক, প্রতিদিন, প্রতি সকাল, অপবাহ্ণ গৌডের দরওয়াজাব বাইরে।

গৌডের এই কয়টি যুবককে সেই আহবান বড বেশী মুগ্ধ করেছিল। একদিন তারা না এসে থাকতে পারতো না। একজন না একজন তাদের কেউ এখানে আসবেই। সেই শৈশব থেকে তা'রা রোজ আসছে, ভুল তো হযনি কোনদিন! যারা সবুজ স্বপ্ন দেখেছে, এখন তাবা রঙিন কল্পনার মধ্যে বিচারের সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা টেনে আনে। একই গৌড়ের দরওয়াজায় বসে তারা পাল্টেছে, তাদের কল্পনা পাল্টেছে আরো পাল্টাবে কিন্তু গৌড় পাল্টাযনি, কোনদিন পাল্টাবেও না, গৌড়, পূর্ব দেশের অমর নগরী গৌড়।

সেই অনিন্দিত সুন্দরী গৌড় নগরীর দরওয়াজায় আবার এসে বসল ভূষণ খাঁ। আগে, মাঝে মাঝে সে-ই শুধু অনুপস্থিত থাকতো এই দরওয়াজা থেকে। থাকতো—তা'রো কারণ ছিল। প্রত্যহ এ গৌড়ের সৌন্দর্য্য দেখবার প্রয়োজন ছিল না তার। কারণ গৌড়কে সে অন্তরের মধ্যেই স্থান দিয়েছিল। তাই বাইরে না এলেও গৌড় তার কাছ থেকে হারিয়ে যায়নি। কিন্তু এখন রোজ এসে সে বসে এখানে। কেন? কেন তার সঠিক ব্যাখ্যা ভূষণ নিজেও দিতে পারে না। জীবনে যেন এখন কিসের একটা শিহরণ এসেছে তার। কী একটা মুক্তির অপূর্ব দ্যোতনা অসীম বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চায়

কিনা কে জানে। তাই বুঝি সে বাইরে আসে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে সেটা তার অবচেতন মনের কাজ। ভূষণ নিজেও জানে না। কিন্তু সে আসে এবং রোজ আসে। আজো এসে সে বসল দক্ষল দরওয়াজার সেই পরিচিত সিঁড়িটার উপর। এই সিঁড়িটাই বুঝি তাদের লক্ষ্য করে বসে থাকে আর অলক্ষ্যে তাদের সেখানে টেনে নিয়ে আসে। ভূষণ সেই অনিবার্য্য আকর্ষণের দুর্বার টানে নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি সেখানে এসে বসল।

সে বসল, তারপর আকাশেব দিকে তাকাল, বাতাসের দিকে তাকাল, পাখীর দিকে তাকাল, বৃক্ষের দিকে তাকাল। কিন্তু কোথাও আজ ওরা সব আছে বলে বোধহয় তার মনে হল না। তার চোখ উন্মিলিত, কিন্তু তবু যেন সে কিছুই দেখতে পেল না—ঠিক একটা পাখীর চোখের মত—দুইটি চোখের পাড় পরস্পব সংযুক্ত না করে যেন পর্দা টেনে দিয়ে বসে আছে চোখের মণির উপর। চোখ খোলা তবু দৃষ্টি নেই। আবার পাখীরই মত সেই চোখ হঠাৎ চমকে যেন একবার খুলেও গেল। যেমন হাওয়ার স্পর্শে দূর থেকে কোন কিছুর অস্তিত্ব টের পায পাখীরা তেমনি কি কোন বস্তু হওয়ার মাধ্যমে এসে দৃষ্টিতে আঘাত হানল ভষণ খাঁরা। তাই যে চোখ আকাশে আটকায়নি, দিকে আটকায়নি, দিগন্তে আটকাযনি, সেই চোখ হঠাৎ পরিষ্কার স্থির জলে বক্তপদ্মের দিকে ঘুরতেই আটকে গেল। কেন?

হ্যাঁ আটকে যাবার কাবণ আছে। সেই মুহূর্তে তার আসমানতারার কথা মনে পডল। আসমানতারাকে সে জলপদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছে। জল থেকে তাব প্রাণচেতনা নিয়ে সেই জলেরই স্বচ্ছ দর্পণে বিভোব হযে নিজের মুখ দেখছে মৃণাল বাঁকিয়ে। এই জল ভূষণ। ঐ জলপদ্মটি সেই কথা তাকে মনে করিযে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভূষণ নিজের অন্তরের দিকে তাকালো। সেখানে কোন প্রতিবিম্ব দেখা যায় কি? যায়। স্থির আসমানতারা তাকিযে আছে তার হৃদযসবোবরের উপর। দৃষ্টিটাকে আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়ে নিল ভূষণ। হৃদয়ের সেই স্থিব গভীর জলে অবগাহন করতে লাগল। আর বাইরের দিকে হুঁস্ থাকল না তাব।

সেই মুহূর্তে রিহান আর বুরহান এল দক্ষল দরওয়াজাতে। ওরা তাকিয়ে দেখল, ভূষণ বসে আছে। এগিয়ে সিঁড়ির কাছে বসল ওরা। কিন্তু একটু আশ্চর্য্য হল। ভূষণ আজ তাদের দেখে তত উল্লসিত হয়ে উঠছে না কেন? ডাকছে না কেন? কি ব্যাপার! একটু অপেক্ষা করে দেখল—তবু কেনে সাড়া এল না।

বাধ্য হয়ে বুরহান ডাকল : একি দোস্ত্, এত নিশ্চুপ কেন তুমি?

হঠাৎ যেন ধনুকের ছিলাতে একটা টান খেয়ে তীরের মত ছিটকে উঠল ভূষণ : এ্যাঁ! কেন? ওহ্ বুরহান! এস। এস।

ভাব দেখে অবাক না হয়ে পারল না বুরহান। বলল : কি ভাবছিলে তুমি?

—আমি! না না, কিছু না, এস। ভূষণ দোষস্খালনের চেষ্টা করল।

বুরহান বলল : কিন্তু এমন মন্ময় হয়ে বসেছিলে যে? আমি না ডাকলে এখানে যে কোন মানুষ আছে তা টের পেতে না বোধহয়?

রিহান বলল : মন্ময় না তন্ময়, তাও তো বুঝতে পাচ্ছি না।

একটু হাসল ভূষণ। রিহানের দিকে তাকাল : অর্থাৎ ?

—তার মানে নিজের মনের মধ্যে না অপরের মনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে তুমি ?

বুরহান বলল : না, তন্ময় আর হবে কি করে, সাদি তো হয়নি।

ভূষণ যেন একটু রহস্য করল : সাদি করলেই কি লোকে তন্ময় হতে পারে ?

বুরহান বলল : তা না হলে তন্ময় হবে কি করে ?

রিহান হেসে উঠল : তা হক্ কথা বলেছ বন্ধু। তন্ময়টা সাদির আগে হয়, সাদির বাইরে হয়, সাদির মধ্যে হয় না। পেয়ে গেলে আর তাব মধ্যে যাবার প্রয়োজন নেই। না পেলেই তার মধ্যে যেতে ইচ্ছে করে।

বুরহান বলল : তা হলে ভাই গুজরাটের সমুদ্রতীর থেকে আবার গৌড়ে ফিরে এলে কেন তুমি ?

রিহান বলল : দূরে গেলে তন্ময়তাটা আসে। কাছে থাকলে যাকে মনে হয় পেয়েছি, ঠিক একটু দূরে গেলেই তাকে আর চেনা যায় না। তখনই আবার তার জন্য মনেব মধ্যে কামনা জাগে। সেই তন্ময় ভাব চমনলালের মধ্যেও এসেছিল। এখন আবার কাছে এসে......

ভূষণ বলল : কাছে এলেও সে যে আবার মন্ময় হয়েছে এমন কথা বলা চলে কি ?

বুরহান হেসে বলল : হক্ কথা। বল রিহান চমনলাল এখন তন্ময় না মন্ময় ?

· রিহান বলল : তাই তো প্রশ্নটা জটিল।

বুরহান বলল : জটিলতার কিছু নেই, সে এখন তন্ময়। আসমানময়। কিন্তু কেন বল ?

রিহান বলল : আসমানকে সে পায়নি। বোকা, আসমানকে যে ধরা যায় না ও তা বুঝল না।

ভূষণ বলল : কি আর করা যাবে বল। দোষটা তারও নয়। নদীর জল যদি স্বচ্ছ হয় আসমানের প্রতিফল তার বুকে তো পড়বেই।

বুরহান তাকাল ভূষণের দিকে। বলল : তাহলে কবি তুমি বলছ স্বচ্ছ হওয়াটাই ভুল ?

ভূষণ বলল : স্বচ্ছ হওয়াটাই ভুল নয় যদি স্বচ্ছ মনের একটি লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেই দুষ্প্রাপ্যের প্রতিফলন ঘটে। আর তাকে দেখে হাহাকার করে বুকটা ফাটিয়ে দিলেও আসমান-জমিন ফারাক থেকে যায়।

বুরহান বলল : দোস্ত, তুমি কবি। মনে অনেক কথাই আসে, একটুখানি বুঝিয়ে বল দিকিন।

ভূষণ বলল : আচ্ছা এই পরিখাটার দিকে তাকাও।

ওরা দুজনেই তাকাল। বলল : বেশ তাকালুম। বল কি বলতে চাও ?

—ওই পরিখার স্থির জলের উপর কোন কিছুরই প্রতিফলন ঘটেনি কি ?

ওরা তাকিয়ে একটু দেখে নিয়ে বলল ঃ হ্যাঁ ঘটেছে।

—কার কার ?

আর একটু দেখে নিয়ে ওরা বলল ঃ আসমানের, গড়ের, আম-বাগিচার, কতকটা মানুষেরও।

—আর ?

—কৈ আর তো দেখতে পাচ্ছি না !

ভূষণ বলল ঃ তাহলে কিছুই দেখতে পেলে না। ওখানে আসমানের ছায়াও পড়েনি, ওখানে গড়ের ছায়াও পড়েনি, পড়েছে মাত্র একটি জিনিষের ছায়া। সেটি হল ঐ রক্তপদ্মের। দেখেছ কেমন স্থির মুগ্ধভাবে ও নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে জলের বুকে ?

রিহান বলল ঃ আহা, বেচারী পদ্মফুল ! বোকার মত তাকিয়ে আছে পানির দিকে। জানে না বেইমান পানি, শুধু ওকেই নয়, দেখছে আরো অনেককেই।

হেসে উঠল বুরহান। বলল ঃ মন্দ বলনি ভাই।

ভূষণ বলল ঃ কথাটা শুনলে ওরকমই মনে হয়, কিন্তু আসলে জিনিষটা ওরকম নয়।

—তবে কি রকম ?

ভূষণ বলল ঃ ঐ যে মৃণালের বুকে পদ্ম ফুটেছে, ও মৃণালটি জলেরই চেতনা। সেই চেতনার বৃন্তে নিজেরই স্বপ্ন ফুল হয়ে ফুটেছে। জল পদ্মফুলকে দেখছে না নিজেকেই দেখছে। আর পদ্মও জলকে দেখছে না নিজেক দেখছে। উভয়েই মন্ময় অথচ উভয়েই তন্ময়। নয় কি ?

রিহান বলল ঃ অনেক দূরে চলে গেছ ভাই, অত দূরে যেতে পারিনে।

ভূষণ বলল ঃ ব্যাপারটা দূরের নয়। যার চেতনার বৃন্তে আকাঙ্ক্ষার বস্তু ফুটে না, তার তন্ময় ভাব, তার হাহাকার। যে তার নিজের চৈতন্যসত্তার প্রতিফলন দেখে নিজেরই মধ্যে সে মন্ময়।

বুরহান বলল ঃ বুঝলুম ভাই। কিন্তু তোমার চেতনার বৃন্তে সেই কমলকলিটি কে ?

—আমি।

—নিজে !

—নিজে বৈকি।

রিহান ভূষণকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ ধন্যরে দোস্ত, আয় তোকে আলিঙ্গন করি। আমাকে কবি করে দিতে পারিস ? তাহলে তোর ভাবিজানের হাত থেকে রক্ষা পাই। সে আমার মন্ময় ভাবের অন্তরায় হয়ে আছে।

ভূষণ বলল ঃ তবে তন্ময় হও। সেই তন্ময়তার মধ্যেই মন্ময় হতে পারবে।

—সেটাও যে পাচ্ছিনে ভাই।

—তবে আর উপায় কি ?

রিহান বলল ঃ সাপের ছুঁচো গেলার মত হয়ে আছি। না পাচ্ছি তন্ময় হতে, কারণ চোখের এত কাছে টেনে এনেছি যে, আর দেখতে পাচ্ছি না। না পারছি মন্ময় হতে,

অর্থাৎ উদরস্থও করতে পারছি না। দূরে গেলে মনে হয় ধরি, কাছে এলে মনে হয় ফেলতে পারলে বাঁচি। তোমার মতে এর দাওয়াই কি বলতে পার?

বুরহান বলল : এর দাওয়াই ও বাতলাবে কি? একটা ছুঁচো আগে গিলুক তবে তো।

রিহান বলল : ঠিক বলেছ ভাই, সাপের বিষের যন্ত্রণা কি সাপে না কামড়ালে বোঝা যায়? ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলল : দোস্ত্, একটি সাদি কর। ঘরে টুকটুকে ভাবিজান আসুক, তারপর তন্ময়তার কথা মন্ময়তার কথা বলা যাবে।

কথাটা শেষ না হতে ঠিক সেই সময়ই সিংহ দরওয়াজার কাছে নাকাড়া বেজে উঠল। চমকে সকলে সেই দিকে তাকাল। সুলতানী ঘোষণা। আবার সেই পূর্বের ঘোষণা : "গৌড়েশ্বর বঙ্গ সুলতান ঘোণো করিতেছেন যে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় গৌড় ছাড়িয়া যাইবে...."

ওরা তিন বন্ধু পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

বুরহান বলল : ব্যাপার কি বলতো?

রিহান বলল : বুঝতে পাচ্ছি না।

বুরহান বলল : সুলতান কি কোন যুদ্ধের ভয় করছেন? গৌড় নগরী অবরুদ্ধ হতে পারে এরকম ভয় আছে তাঁর? তাই অপ্রয়োজনীয় জনতাকে গৌড় থেকে তিনি সরিয়ে দিতে চান?

রিহান বলল : বুঝতে পাচ্ছি না ভাই। যুদ্ধের কথা হাওয়ায় ভেসে আসে, তাহলে কি শুনতুম না।

—তাহলে সুলতানের হঠাৎ এই খেয়াল চাপল কেন?

ভূষণ বলল : মানুষকে অবাঞ্ছিত ভাবা পাপ। এতে গৌড়ে[illegible] হবে না বন্ধু।

কি জানি কেন ভূষণের কথাটা শুনে একটা অজানা আশঙ্কায় সবারই বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছিল। চিরাচরিত প্রথাতে রিহান আর বুরহান নামাজ পড়ে নিল। ওদের নামাজ শেষ হলে সকলে নগরের অভ্যন্তরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হল।

রিহান বলল : মাঝে মাঝে ন'ক্কাড়াটা এমন অশুভ ঘোষণা করতে আসছে যে কেন! জালালটার কথা মনে পড়ছে। চমনলালটা কাছে থেকেও নেই। সত্যি কি কোন বিশ্রী দিন আরম্ভ হবে কিনা কে জানে!

রিহান বলল : চিন্তাটা বাদ দাও দোস্ত্, তার চেয়ে চল কোন সরাইখানায় গিয়ে বসা যাক।

—তাই চল।

ওরা এগিয় চলল।

ওরা সরাইখানায় গিয়ে দামী মদ নিল। ইরাণ থেকে আনা সিরাজী। বাঙলা দেশে খাবারের অভাব নেই। বাঙলার মত বিচিত্র ধরনের খাদও তৈরী হয়না বোধহয় কোথাও। কিন্তু এই একটিতে বাঙলাকে হার মানিয়েছে ইরাণ, সেটি সিরাজী।

রিহান পান করতে করতে বলল ঃ ঠিক ইরাণের নর্তকীরই মত।

বুরহান বলল ঃ যা বলেছ। অত্যন্ত উগ্র, অন্তর ঝলসানো ব্যাপার—যেমন চোখঝলসানো মেয়েগুলো ইরাণের।

রিহান বলল ঃ শুনেছি পশ্চিম গড়ে এক ইরাণী বাঈজী এসেছে, চলনা একবার ঘুরে আসি।

বুরহানের যৌবনের রক্তটা নেচে উঠল। বলল ঃ মন্দ নয়, চল একবার।

কিন্তু ভূষণের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা গেল না।

বুরহান বলল ঃ কিগো দোস্ত্ তোমার আবার কাব্যের ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল না কি? সব সময় অত মন্ময় হলে আমরা তোমাকে পাব কি করে?

ভূষণ একটু হাসল। বলল ঃ না। তবে ঠিক বাঈজী বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে না।

রিহান বলল ঃ বল তবে কি করা যায়?

ভূষণ বলল ঃ তবে চল, এক্কা করে আজ গৌড় নগরীটা ঘুরি। রাত্রিবেলা গৌড়ের রূপটা দেখা যাক।

ইরাণের পানীয় একটা উন্মত্ত আবেগ ফুটিয়েছে রক্তের মধ্যে। যে কোন একটা কিছু করতে ভাল লাগছে। ওরা সায় দিল ঃ তাই চল।

সরাইখানা থেকে বাইরে নেমেই এক্কা নয়, বড় একটি টাঙ্গা গাড়ী ধরল ওরা।

গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাবেন জনাব?

রিহান বলল ঃ শুধু ঘুরব, চল।

—কোন্দিক দিয়ে?

—যে দিক দিয়ে খুশি।

পূর্ব দিক দিয়ে গাড়ী ছোটাল গাড়োয়ান। অশ্রান্ত গতিতে দ্রুত ছুটে চলল ঘোড়াগুলো। ওরা টাঙ্গার ফাঁক দিয়ে বাইরে দিকে তাকিয়ে থাকল। নিশীথে গৌড়ের অন্যরূপ। ভূষণ তাকিয়ে দেখতে লাগল। কোন এক রহস্যময় অজ্ঞাত নারীর গাঢ় ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি নেমেছ যেন মৃত্তিকাতে। সহস্র সহস্র হীরের গহনা পরেছে সেই অপরূপা রূপসী তার অলস কবরীতে। গৌড়ের আলোকবর্তিকাগুলি চিক্মিক্, চিক্মিক্ করছে সেই হীরকদ্যুতির মধ্য দিয়ে। এক অদ্ভুত আবাঙ্মানসগোচরম ভাবের পুলক জাগল ভূষণের মনে। সে ভুলে গেল যে, তারা তিন বন্ধুতে মিলে যাত্রা করেছে গৌড়ের নিশীথ রূপ দেখবার জন্য। তার মনে হল, মহাকালের বুকে সে এক পরম জিজ্ঞাসু পথিক যাত্রা শুরু করেছে। আঁধারের রহস্যাবরণ প'রে সেই মহাকাল পরম কৌতূহলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কোন প্রশ্নেরই জবাব নেই সেখানে; একটা নিশ্চুপ নীরবতা। যেন ইঙ্গিতে বলছে এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। দুই পাশে রাস্তার উপর মাঝে মাঝে আলো। তারা প্রায়ই পেছনে পড়ে যাচ্ছে। এক ফাঁকে যেন গাড়ীটার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেও পাচ্ছে না। যেন অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে আবার তাকিয়ে থাকছে। ঐ আলোগুলো কিসের প্রতীক? ভূষণের মনে প্রশ্ন এল। এই পৃথিবীর মানুষগুলোর মত নয় কি? এই দেহটা নিয়ে সবাই স্থির আলোর মত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের ভিতর যে পরম

সত্তা, সে অনবরত চলছে আজকে এই নিশীথে টাঙ্গাগাড়ীরই মত। পার্থিব মানুষের কৌতূহল তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েও দেখতে পায় না। এই মহাকালের পথিক কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে সে?

আরো কিছু দূর চলবার পর তার কিন্তু মনে হল, না, গৌড়ও চলছে। এই নগরীগুলোও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। তারাও গতিচঞ্চল। কিন্তু তাদের গতি বিপরীত দিকে। সবাই সবার দিকে কৌতূহলে তাকিয়ে আছে, কিন্তু একটু দাঁড়িয়ে আপন করে নেবার ফুরসুৎ পাচ্ছে না। এক দুর্নিবার টান টেনে নিয়ে যাচ্ছে সবাইকে কোথায় কে জানে! পৃথিবীতে সবাই গতিময়, কারো লক্ষ্য একদিক, কারো আর একদিক। এই যে গৌড়েব এতগুলো মানুষ, এক সঙ্গে যাত্রী, তাদের সবার গতি কি একই দিকে? এই যে তারা নিকটতম কয়টি বন্ধু, তারাই কি একদিকে ছুটে চলেছে? চমনলাল আর বুরহান কি এক? চমনলাল আর আসমানের গতি কোন্ দিকে? ভূষণের মনে হল বিপরীত দিকে। হায় চমনলাল, জানে না যে, অদূরেই বিচ্ছেদ অপেক্ষা করে আছে তার জন্য! আচ্ছা বিপরীত দিকেই যদি মানুষের যাত্রা হয়, আবার কি একদা তাদের দেখা হতে পারে না? ধরা যাক মহাকালের শেষ হল। দুজনেই সেই শেষ প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হল, তখন? আচ্ছা, শেষটা কোথায়? ভূষণ শেষটা কল্পনা করতে লাগল। একি! এযে শুধু যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছেই- তারপর যে আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না! যেন নিজেকেই হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল ভূষণ। সেই হারানোর ভয়ে সে চিৎকার করে উঠল: একি! কোথায়? কোথায়?

রিহান আর বুরহানও বাইরে তাকিয়েছিল। তারা গৌড়ের নৈশ রূপটার কোন্ দিকটা দেখছিল তারাই জানে! ভূষণের একটা চাপা কণ্ঠের চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল: কি হল দোস্ত্?

নিজের ব্যক্তি-সত্তায ফিরে এল ভূষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। ভূষণ লজ্জিত হল: না, কিছু না।

বিহান বলল: তবে অমন করে উঠলে কেন? কিছু দেখলে নাকি।

হ্যাঁ! কিছু তো দেখেছেই ভূষণ। সেই দেখাটা কিছু না-দেখা। যদি দেখতে পেত, সে চিৎকার করে উঠতো না, দেখতে পায়নি বলেই চিৎকাব করে উঠেছিল। সে সব কোন কথাই সে বলল না। এ যে শুধু অনুভবের প্রশ্ন। বলা চলে না, বোঝানোও চলে না।

সে বলল: আমরা এখন কোথায়?

—পশ্চিম গড়ে এসে গেছি।

রিহান বলল: একবার যাবে নাকি দোস্ত্ আসমান বাঈজীর ওখানে?

বুরহান বলল: তোমার মাথা খারাপ, এত রাতে নাচের সাধ?

—না হয় শুধু দেখেই আসতুম বিবিকে।

বুরহান বলল: একদিন দেখে সাধ মেটেনি, আর একদিন দেখলেই কি মিটবে?

—মিটতেও তো পারে।

—তাহলে চমনলালেরও মিটত।

—চমনলাল কামানার আগুনে জ্বলছে।

—আর দেখবার এই আকাঙ্ক্ষাটা কোন্ আগুনের?

রিহান উত্তর দিতে না পেরে বলল: না ভাই বুরহান, তুমি বড় দার্শনিক হয়ে যাচ্ছ। যেটুকু রসের আমেজ উপভোগ করছিলুম তাও উড়িয়ে দিলে।

বুরহান বলল: সামনেই আসমান বিবির ঘর।

আসমানের কক্ষ থেকে মৃদু মৃদু আলো আসছে। রিহান বলল: চমনলালটা এখনো রয়েছে বুঝি। গাড়োয়ানকে সে ডাকল, এই গাড়োয়ান, গাড়ীটা এবার আস্তে চালাবে।

গাড়োয়ান গাড়ীর গতি ধীর করে দিল।

বুরহান রিহানের দিকে তাকিয়ে বলল: হঠাৎ তোমার এ খেয়াল?

রিহান বলল: বঁধুর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, না হয় তার হাওয়াটা নিয়ে যাই?

গাড়ী আর একটু এগুতে একটা অতি স্নিগ্ধ সঙ্গীতের সুর ভেসে এল।

রিহান বলল: বিবির গান চলেছে।

বুরহান বলল: একটু থাম, ভারি মিষ্টি শোনাচ্ছে কিন্তু।

রিহান বলল: এই গাড়োয়ান গাড়ী রোখ।

গাড়ী থামল। গানের কলিটা শুনল ওরা।

আসমান গাইছে:

"বড বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি—
যমুনাকুঞ্জ রহল বনয়ারী।"

—বাঃ, সুন্দর গানটা তো? বুরহান প্রশংসা চেপে রাখতে পারল না।

রিহান একটু আশ্চর্য্য হল: গানটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে?

ভূষণ শুনল, শুনল অভিভূত হয়ে। কেন ঐ গান গাইছে আসমান এত রাতে?

রিহান হঠাৎ ভূষণ খাঁকে জড়িয়ে ধরল: পেয়েছি, পেয়েছি।

আশ্চর্য্য হয়ে বুরহান তাকাল রিহানের দিকে: কি পেয়েছ?

—এ গান যে আমাদের কবির লেখা?

খেয়াল হল বুরহানের, বলল: তাই তো! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দোস্ত্ এ গান ও পেল কি করে?

ওরা দুজনেই ভূষণের দিকে তাকাল।

ভূষণ বলল: তোমরা বোধহয় জাননা আমি গান বিক্রী করি। এটাই এখন আমার জীবিকা।

বুরহান বলল: সেকি গো দোস্ত্, সে কথা আগে বলনি কেন? তবে এ গানগুলো কখনো বাইরে যেতে দিই! কে কেনে তোমার গান?

ভূষণ বলল: এক শেঠজী।

রিহান বলল: যা হোক, গান পড়েছে যোগ্য কণ্ঠেই। কেমন লাগছে দোস্ত্ এ গান শুনে?

ভূষণ কিছু না বলে শুধু হাসল।

গানটা শেষ হল, গাড়োয়ানকে ওরা গাড়ী চালাতে বলল। গাড়ী চলল।

বার

"O throw away the worser part of it,
And live the purer with the other half.'

—*Shakespeare*

কেন যেন সেই গানটা শোনবার পর মনটা একটু উচাটন হল ভূষণ খাঁর। সারাটা পথ সেই গানের কলি দুটি মনে মনে ভাজতে ভাঁজতে এল সেঃ "বড় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারী—যমুনাকুঞ্জ রহল বনযারী।" এ গানটা যখন ভূষণ খাঁ লিখেছিল তখনকার নিজের মনের অবস্থাটা বিচার করবার চেষ্টা করল সে। সেই আবেগ, সেই সততা কি নিশীথে আসমানের গানের মধ্যে আছে? মনে হল যেন আছে। মনে হল যেন চির অপেক্ষমান বিরহের এক করুণ রাগিনী ঝংকৃত হয়েছে তার গানের মধ্যে। আসমানের অন্তরে একটা বেদনা আছে। সে বেদনা কিসের? স্বপ্ন ভাঙ্গল। তার মনের সমস্ত চেতনাতে উত্তরাধিকাবসূত্রে শুধু একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষাই বুঝি লতিয়ে উঠেছিল, ছায়ার অঙ্গনঘেরা একটি গৃহ, নিভৃত পরিবেশে একটি মাত্র প্রিয়তম, কিন্তু তা তার সম্ভব হয়নি। অঙ্কুরেই সেই সম্ভাবনাকে নাশ করেছিলেন ভগবান। সম্ভবনা নাশ হলেই আকাঙ্ক্ষা তো নাশ হয় না! আসমানের হয়নি। নিজেকে একটু নিরিবিলিতে যেই সে পায় তক্ষুণি সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জেগে উঠে বোধহয়। তখনই একটা ক্রন্দনের আবেগে ভেঙে পড়ে সে।

রাত্রির নৃত্য-আসরের বাইরে যারা আসমানকে দেখেছে তাদের পক্ষে এ কথা বিশ্বাস কবা কষ্টসাধ্য নয় যে, সেও কখনো কাঁদতে পারে। আসমানের মতই তার অন্তরটাতে একটা নীল বেদনা বয়েছে। নির্মেঘ আকাশে সেই বেদনাকে দিগন্তে নুইয়ে পড়তে দেখা যায। কিন্তু রাত্রিবেলায এই আসমানকে আর চেনবার উপায় নেই। তখন আকাশের নীলিমা আকাশে থেকেও চোখে পড়ে না। অজস্র নক্ষত্রের থর থর বিস্তার হীরকখণ্ডের উজ্জ্বল দ্যুতিতে গগন ভরে দেয়। সেই লক্ষ তারার আলোর নৃত্যে বেদনা চাপা পড়ে যায়। রাত্রির নয় দিনের আসমানই যে তার কাছে পরিচিত। তাই গতরাত্রির তার বেদনার সুর ভূষণের চিত্তকে চঞ্চল করেছে। কিন্তু বুরহান আর রিহান যারা আসমানের এই দিনের রূপ দেখেনি, তারা আকাশের অনাবিল নীল বেদনার মর্ম উদ্ধার করতে পারবে না। তারা পারেওনি। তাই শুধু তারিফ করেছে। একটি বঞ্চিত হৃদয়ের জন্য সমবেদনা অনুভব করেনি। ওদের মতে এরা এক বিশেষ জাত, যাদের হৃদয় দিয়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু সত্যিই কি তাই! শুধু আসমান কেন, প্রত্যেকটি নর্তকীরই কি আসমানের মত কোন বেদনা লুকিয়ে নেই? মানুষ ভুল করতে পারে, ত্রুটি করতে পারে, কিন্তু হৃদয়হীন হওয়া কি তাব পক্ষে সম্ভব? মানুষের আকৃতি যার আছে, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব এতটুকু থাকবে না! কি জানি, মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তার গড়ে ওঠেনি। তাই মানুষের

সম্পর্কে ধারণা অন্যের যা আছে, ভূষণের তা নেই। ওর বন্ধুরা বলে অর্দ্ধেকটা তার কল্পনা দিয়ে গড়া। এই কল্পনাটা তার থাক। যদি সত্যই হৃদয়হীন কোন মানুষ থাকা সম্ভব হয়, তবে তার স্বরূপ ভূষণের চোখে ধরা না পড়ুক। মানুষ তার চোখে কিছুটা স্বপ্নে, কিছুটা সত্যে মিশে যাক্। মানুষ সম্পর্কে আজো তার যে ধারণা আছে নির্মম চরম সত্যের সম্মুখীন হয়ে সে স্বপ্ন যেন ভেঙে খান্ খান্ হযে না যায়।

ভূষণ খাঁ ঘরে ফিরে প্রদীপের আলো জ্বেলে আবার লিখতে লাগল। নিজের কথা, নিজের মনে নতুন শিহরণ জাগিয়েছে আজ। নদীর বুকেব ঢেউ তটের বুকে আঘাত খেয়ে কলতানে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—নদী স্বকর্ণে সেই শব্দের গান শুনেছে। তার তরঙ্গমালাকে আরো উল্লসিত উদ্বেলিত করেছে সেই গান।

ভূষণ লিখল ঃ

"বিরহ চির থির নহ,
সুন্দরী শুনহ শুনহ।
আওয়াব মাধব পাশ
অব নহি হোত নিরাশ।"

যদি নদীর কোন তরঙ্গ তটে গিয়ে আঘাত করে কেঁদে উঠে, আব এক তরঙ্গ কি বলবে না ঃ তুমি কেঁদোনা, কেঁদোনা ? ভূষণের যে হৃদয় একদা অপেক্ষমান কোন হৃদযের জন বেদনার সুর তুলেছিল—সেই হৃদয়ই সান্ত্বনার গান গাইল--

বিরহ চির থির নহ।

বিরহ চির স্থির নয়। হে সুন্দরী তুমি যে এই আকুল প্রাথনায় পরম প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করে বসে আছ তা ব্যর্থ হবে না। সৎ প্রত্যাশা একদিন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাবেই। হতাশ হবাব প্রযোজন নেই।

মনে মনে ভূষণ ভাবল কাল গিয়ে এই গান আসমানকে শোনাতে হবে, বলতে হবে, তুমি আর বেদনার গান গেও না। অন্তরেব গভীর বিশ্বাস থেকে যেন গানটা বেরিয়ে এল তাব। আর তার মনে হল, এই সত্য, সত্য। সে একটা স্বস্তিব হাল্কা ভাবে বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করতে গেল।

পরদিন সকালে উঠেই সে পশ্চিম গড়ে যাবাব জন্য তৈরী হল। কিন্তু বেরুবার আগেই চমন এসে হাজির। চমন এখন রোজ আসে। ঐ একটি মাত্র সময়ে। একটি গান তার প্রয়োজন। গান পেলেই আবার সে চলে যাবে। ঐ গান তাঁর প্রয়োজন। ভূষণেব আর জানতে বাকী নেই। চমনলাল আকৃতিতে সেই চমনই আছে এখন পর্যন্ত, কিন্তু প্রকৃতিতে সে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, কেমন শ্রীহীন এক লক্ষ্মীছাড়া ভাব। কেন ?

চমনলাল এই উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদ আর পাগল কেন আজ ? এও কি সেই চিরন্তন বিরহের বেদনামথিত ? ভূষণের মনে হল, না, না। বিরহের মধ্যে শ্রীর অভাব নেই। সে বড় শান্ত, সে বড় স্নিগ্ধ। বিরহী হাত বাড়িয়ে প্রিয়তমকে ধরতে চায় না। বিচ্ছেদের বেদনাটাকেও সে অভিশাপ বলে মনে করে না। তার ভয় প্রিয়তমকে হারাবার নয়, তার উদ্বেল ভাব প্রিয়তমকে পাবার জন্যও নয়, তার ভয় বিরহের বেদনাটুকু যদি কোনদিন হারিয়ে যায়!

বিরহ নিয়ে সে বাঁচতে পারে, কিন্তু বিরহের বেদনা হারালে সে বাঁচবে কি নিয়ে? বিরহীর কাছে বেদনা পরম প্রাপ্তি। আকাশ সেই পরম বিরহবেদনার স্পর্শে স্নিগ্ধ নীলিমার নীলে ভরে আছে। তার অন্তরটাকে তো সে মেঘের অঞ্চল পরে ঢেকেই রাখে সব সময়, কিন্তু কখনও কখনও যখন নিতান্ত অনাবৃত করে দিয়ে সেই বিরহবেদনা সে অনুভব করতে বসে, উন্মত্ত উন্মাদনায় কি সে পাগলামী করে? করে না। কিন্তু সমুদ্র? পৃথিবীকে পাবার জন্য ঢেউয়ের বাহু তুলে কেমন বিপর্য্যস্ত রূপেই না ছুটে আসে। গর্জন করে। গর্জন করে, কান্নায় ভেঙে পড়ে, মাথাকুটে। এ তার প্রেম নয়, এখানে পাবার আকাঙ্ক্ষা বড়। এ তার কামোন্মাদনা। আকাশ প্রেমিক, সমুদ্র কামুক। চমনলাল সমুদ্র। ভালবাসাকে চিনতে না পেরে ভালবাসার প্রহসনে নেমেছে সে। চমনলালকে দেখে বিপর্য্যস্ত সমুদ্রের মত মনে হয়। বেলাভূমিতে আছড়ে আছড়ে মাথাকুটে কাঁদছে। তার গোপন অন্তঃপুরে লুকানো মুক্তাধার ঝিনুকগুলিকে সে বেলাভূমিকে উপহার দিচ্ছে। কিন্তু মন পাচ্ছে না। বেলাভূমিতে ঝিনুক বিলাসীরা সমুদ্রের সেই প্রণয়োপহারকে সমুদ্রের জন্য এতটুকু অনুভব না করেই কুড়িয়ে নিচ্ছে। হায় সমুদ্র, প্রেমের পথ এটা নয়! প্রাপ্তির উপায় আকড়ে ধরা নয়, ছেড়ে দেওয়া।

চমনলালের দিকে তাকাল ভূষণ।

চমনলাল বলল ঃ আমার কবিতাটি দাও বন্ধু।

তার মুখে 'বন্ধু' কথাটি যেন একটি বিদ্রূপের মত শোনাল ভূষণের কাছে।

আত্ম-উপভোগের জন্য যে উন্মাদ বন্ধুত্ব আবার তার আছে নাকি!

কিন্তু কবিতা তাকে দিতে হবে, অর্থের জন্য নয়, সমবেদনা দেখাবার জন্যেও নয়, শুধুমাত্র কথা দিয়েছে বলে, তাই।

ভূষণ বলল ঃ হ্যাঁ, বোস, দিচ্ছি।

কিন্তু ভূষণ ভাবল—কোন্ কবিতা দেবে সে! কালরাত্রে একটি মাত্র গানের কলি সে লিখেছে—সে তার নিজের। সে গান উৎসর্গীকৃত। সুতরাং—সে ফিরে লিখতে বসল ঃ

> প্রেম কহব সখি কারে।
> আকুল সাগর ধরত কিনারে॥
> স্বপন স্বপন তনু কাহ্ন।
> থির রহত আসমান॥

"সখি! প্রেম কাকে বলব? সাগর দেখ ব্যাকুল হয়ে কিনারায় ভেঙে পড়ছে। শুধুই স্বপ্ন দেখে কানুর মত নীলতনু হল তবু দেখ আসমান স্থির আছে। কাকে প্রেম বলব সখী?"

পদটা সে চমনলালের হাতে বাড়িয়ে দিল! যেন সময় নেই, যেন একটা হরিণী বিতাড়িত হয়ে ছুটে চলেছে তেমনি করে চমনলাল বেরিয়ে গেল। একটু যেন দুঃখ হোল চমনলালের জন্য ভূষণের। হায়! কামনার চাবুক যার পৃষ্ঠদেশে পড়েছে সে কি স্থির হতে পারে! এমনি করেই তাকে ছুটতে হবে। আর সে বিলম্ব করল না, বেরিয়ে পড়ল। আসমানতারার

ওখানেই চলল সে? কারণ ভূষণ জানে, যত ব্যস্ত হয়েই ছুটে যাক, চমনলাল এখন আসমানতারার ওখানে যাবে না। কারণ রাতে যে আসমানতারা দিনে সে শুধু মাত্র আসমান। দিনে সে এক নির্মল নীল আকাশ। তখন তার হৃদয়টা দেখা যায়। রাতে সে তারার মালা পরে আসমানতারা হয় তখন তার নীলসত্তা তারার চক্‌মকিতে আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে।

ভূষণ পশ্চিম গড়ে গিয়ে পৌঁছুল। আসমানের ঘরের কাছে গিয়ে দেখল: প্রতীক্ষিতা আসমান দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভূষণ গিয়ে আঙিনায় উঠল: কি গো, কিসের অপেক্ষায় এমনি করে দাঁড়িয়ে আছ?

আসমান বলল: দাঁড়িয়ে আছি দেখবার জন্য।

—কি দেখার জন্য?

—পাছে আমরই বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া।

—যাকে বধুঁ বলে সম্বোধন করেছ, সেকি আন্ বাড়ী যেতে পারে আর?

আসমান বলল: কেন পারবে না। কৃষ্ণ কি যান নি?

—তিনি কি রাধার দুয়ারের উপর দিয়েই গিয়েছিলেন?

আসমান বলল: তা ছাড়া আর কোথা দিয়ে যাবেন বল? সমগ্র বিশ্বময় যে বিরহিণী তার হৃদয় পেতে রাখে। সেই হৃদয়ের উপর রথচক্রের রেখাপাত না করে প্রিয়তম কি কখনো যেতে পারেন?

ভূষণ বলল: তাহলে আর তাকিয়ে থাকবার প্রয়োজন কি আসমান? সে তো এমনিই ধরা পড়বে।

আসমান বলল: ঐটেই স্বভাব। চাঁদের আকর্ষণে সাগরেব বুকে নিত্য জোযার ভাটা। চাঁদের হৃদয় তো সাগরেই ছড়িয়ে আছে, তবু চাঁদ সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন বঁধু?

ভূষণ বলল: ওটা যে প্রকৃতির নিয়ম।

আসমান বলল: জান তো, রমণীকে প্রকৃতি বলে শাস্ত্রে। তাই এটা আমারও নিয়ম।

ভূষণ বলল: বেশ, সেই নিয়মে ধরা দিয়ে আমি তোমার ঘরেই এলুম। চল, এবার ঘরে চল।

ওরা দুজনেই গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

যথারীতি দুজনেই তা'রা মাটির উপরেই বসে পড়ল।

ভূষণ বলল: তোমার জন্য আমি নতুন পদ এনেছি।

আসমানতারা বলল: আমার ভাগ্য অপ্রত্যাশিতরূপে আজ সুপ্রসন্ন। তোমার গান আমি রোজ পাই। নিশ্চয়ই সোনা দিয়ে বাধিয়ে রাখব সেগুলো। কই কি লিখেছ দাও অমাকে।

ভূষণ বলল: আমি পাঠ করে শোনাব তোমাকে, তুমি শোন।

আসমান বলল: আহা, তুমি যদি গান করেই শোনাতে আমাকে?

ভূষণ বলল: আমি গান গাইলে চলবে কেন বল। আমি লিখব তুমি গাইবে, তুমি

বলবে, আমি শুনব, এইতো রীতি। নিজের মুখে ফুঁ দিয়ে লোকে ধ্বনি তুলতে পারতো—কিন্তু তা হয় না। লোকে ফুঁ দেয় বাঁশীতে। ফুঁ-টা শিল্পীর, সুরটা বাঁশীর। তুমি আমার বাঁশী।

আসমান বলল: বেশ তাহলে তুমি ফুঁ দাও, আমি বাজি।

ভূষণ আসমানের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর পড়তে লাগল:

বিরহ চির থির নহ।
সুন্দরী শুনহ শুনহ।।
আওয়ব মাধব পাশ।
অব নহি হোত নিরাশ।।

পদটি শুনে কেমন একটি জিজ্ঞাসার দৃষ্টি টেনে আসমান তাকাল ভূষণের দিকে। তার মুখের দিকে সে তাকিয়ে থাকল শুধু।

ভূষণ সেটা লক্ষ্য করল। বলল: কি দেখছ?

—দেখছি তোমার মুখ।

—রোজই তো দেখছ।

আসমান বলল: সূর্য্য পৃথিবীর মুখ রোজই দেখে, তাই বলে কোনদিন দেখা বাদ দেয়?

ভূষ বলল: যদি কোন দিন ঘনদুর্য্যোগের দিন থাকে, আকাশে ঘনঘটা থাকে সেই দিন?

আসমান বলল: মেঘের আড়ালে থাকলেও সূর্য্য পৃথিবীর দিকেই তাকিয়ে থাকে জানো। একদিন যদি সে পৃথিবীর মুখ না দেখে সেজন্য সূর্য্য দায়ী নয়।

ভূষণ জিজ্ঞেস করল: তবে দাযী কে? পৃথিবী?

—পৃথিবীও নয়।

—তবে?

—দুয়ের কেউ নয়। সে হল দুয়ের মধ্যেকার মেঘ। এই মেঘ নিয়তি। তার বিচিত্র খেয়াল। সে যদি কোনদিন তোমার আমার মধ্যে আড়ালের মেঘ টেনে দিতে চায় বা দেয়, তাহলে অন্য কথা। নইলে দেখা বন্ধ হবে কেন।

ভূষণ বলল: নিয়তি যদি মেঘ হয়, তাতেও আমি ভয় করিনে।

আসমান বলল: কেন, ব্যবধানের মেঘ আমাদের আড়াল করে দিয়ে দাঁড়ালে তুমি খুশি হও?

ভূষণ বলল: প্রশ্নটা মোটেই তা নয়। মেঘ যদি আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েও দাঁড়ায়ও, তোমার অস্তিত্বটাকে সে বিলুপ্ত করতে পারবে না। হাজারো বাদলের দিনে নিশীথের অন্ধকার কি নেমে আসে? সূর্য্য আকাশে থাকতে কি এমন হয় যে আর পথ চলা যায় না? মেঘ যতই ঘন হোক সূর্য যতক্ষণ আকাশে আছে, তার যে আলোর ছটা তা পৃথিবীতে এসে পড়বেই। তুমি যদি সূর্য্য হও তবে আর আমার ভয় কি।

আসমান বলল: তবু তো ভয় থাকতে পারে?

—যেমন ?

—দিন আর রাত হয়। রাত্রিবেলাতে সূর্য্য অদৃশ্য থাকে। ঐ টুকু বিরহই কম কিসে ?

হাসল ভূষণ ঃ কে বলল তেমাকে যে এই পৃথবীর কাছ থেকে সূর্য্য কোন মুহূর্তের জন্য এতটুকু আড়ালে যায়। পৃথিবীর এ পৃষ্ঠে অন্ধকার থাকলে অপর পৃষ্ঠে আলো থাকবেই। মানুষেরও দুই পৃষ্ঠ—মন আর বাহির। বাইরের আলো যদি নেভে, মনের আলো ফোটে। সে ফোটাই বড় ফোটা। যদি এমন কোনদিন আসে যখন চর্মচক্ষুতে তোমাকে দেখতে পাবো না, তাতেও আমি হতাশ হব না। তোমাকে বেশী করে আমার মনের চক্ষুতে দেখব আমি। ভাব ঃ নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

আসমান আবেগে ভূষণকে জড়িয়ে ধরল। কেবল দেহের কামনা থেকে নয়, মনের এক আশ্চর্য্য ভাব থেকে।

ভূষণ জিজ্ঞেস করল ঃ কি হল তোমার ?

—বড় ভাল লাগছে।

ভূষণ তার দুটি উজ্জ্বল চোখে একটি শিল্পী-পুরুষের দৃষ্টি টেনে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আসমান বলল ঃ একটা কথা বলব ?

—নিশ্চয়ই বলবে। তুমি কথা বলবে, আমি শুনব, সেজন্যই তো আমি।

—না গো না, তেমন অর্থে কোন কথা নয়, একটি প্রশ্ন।

—বল।

—হঠাৎ এই গানটি বেছে বেছে আমার জন্য আনলে কেন ?

ভূষণ একটু অভিনয কবল। বলল ঃ হাঠাৎ কাল রাতে আমার কেন মনে হল, কে যেন অতি করুণ সুরে কাব ব্যর্থ প্রতীক্ষায় একটি বেদনার গান গাইছে ঃ

বড় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহারি
রহল যমুনাকুঞ্জ বনয়ারী।"

আমার মন উচাটন হল। আমার মনে হল এ বিরহটা সত্য নয। এই অধীর আগ্রহের একমাত্র ফল মিলন। কিন্তু মিলনের জন্য একটু বিরহের দরকাব, নইলে সে মিলন সার্থক হয় না। তাই দেখ, গ্রীষ্মে জর্জরিত না হলে পৃথিবীতে বর্ষা নামে না, শীতের ঐ রিক্ত পরিবেশে অপেক্ষা না করলে বসন্ত আসে না। কিন্তু বর্ষাও নামে, বসন্তও আসে। তাই লিখলুম।

মুহূর্তে ভূষণের কোল থেকে একটা গভীর আগ্রহে মাথাটা তুলে নিয়ে ঋজু ভঙ্গীতে উঠে বসল আসমান ঃ সত্যি তুমি এমন শুনেছ ?

—হ্যাঁ, মানে, মনে মনে শুনেছি।

আসমান বলল ঃ আমি জানতুম, তুমি শুনবে।

—কেন গো ?

—আমি নিজেই যে কাল অধীর আগ্রহে তোমার কথা মনে করে এ পদ দুটি গাইছিলুম। সত্যি, মনের নিবিড় আকুতি প্রণয়াস্পদকে চঞ্চল না করে থাকতে পারে না।

ভূষণ বলল : কিন্তু হঠাৎ তোমার এই বিরহের গান কেন ?

—তোমকে এক মুহূর্ত না দেখলেই যে আমার মধ্যে বেদনার ভাব জাগে।

—তাহলে তুমি কি মনের মধ্যে আমাকে পাওনি ?

—পেয়েছি। পেয়েছি বলেই তো বিরহ। বিরহের মধ্যে যে পাওয়া, তার মত বড় পাওয়া আছে নাকি ! দর্শনে যদি চোখের মধ্যে থাক, তবে বিরহে সমস্ত চেতনাজুড়ে থাক তুমি। দর্শনে তোমার যদি বহিরঙ্গ দেখি, হৃদয়ে বিরহে তোমার অন্তরও যে ধরা পড়ে।

ভূষণ বলল : তা হলে তোমার চোখের আড়ালেই থাকি, কেমন ?

আসমান বলল : কি করে বলি বল। পরম হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা তিনিও মিলন বিরহ কোনটাকেই এড়াতে পারেন নি—আমি কোন্ ছার। মিলন বিরহ সর্বত্রই তুমি, তুমিগো, শুধু তুমি।

ভূষণ বলল : আসমান, এই যে তোমর রূপ, এটাই সত্য ?

আসমান বলল : সত্য মাত্র এক, কিন্তু দেখার কারণে আমি দুই।

—কেমন ?

—আগুনের মধ্যে ব্রাহ্মণ দেখে পবিত্রতা, আবার মানুষ দেখে যন্ত্রণা, কোন্‌টা সত্য ?

—এটা একটা প্রশ্ন বটে।

—কিন্তু আগুনের চরিত্র এক। পতঙ্গের দেহেও তার কাছে যা, যজ্ঞের ঘৃতও তাই। উভয়েকে পুড়িয়েও তার নিজের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনা।

ভূষণ বলল : কিন্তু তবু আসমান, আমি বলছি তুমি এপথ পরিত্যাগ কর।

—কিসের পথ ?

—এই নটীর পথ।

আসমান বলল : কবি আমাকে আগুন হিসেবে জ্বালানো হয়েছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাহ্য পদার্থ আমাকে জ্বালাবে আমি যে জ্বলবই।

—কিন্তু অনেক পতঙ্গ যে নিঃশেষ হয়ে যাবে ?

আসমান বলল : সে জন্য অগ্নিকে দায়ী কোরোনা, পতঙ্গকেই দায়ী কর।

—পতঙ্গ যে নির্বোধ।

—কিন্তু অগ্নি কি সবোধ ?

—তা জানি না, কিন্তু তুমি এ পথ পরিত্যাগ কর।

আসমান বলল : হায় কবি, তুমি তো জান যে, অগ্নির নির্বাপণ তার নিজের উপর নির্ভর করে না, করে পরিবেশের উপর। যদি হাওয়া বয় আর শুষ্ক পদার্থ থাকে, তবে অগ্নি জ্বলে। যদি বৃষ্টি নামে, নেভে। আমি নিভব কি করে, তোমার সমাজ যে হাওয়া ছেড়েছে, তোমার সমাজ যে শুকিয়ে আছে। যে দিন বৃষ্টি নামবে, সে দিন আপনিই নিভ্‌ব।

—কিন্তু এ বৃষ্টি নাববে কি করে ?

—মানুষে মনের প্রেমেই বৃষ্টি, সেইই আগুন নেভাবে। তার শুভ বুদ্ধির উদয় হলে আমি থাকব না।

—আমিতো তোমকে প্রেম দিয়েছি?

—তুমি তাই সীতা হয়ে আমার মধ্যে আছ, জ্বলছ না। সবাই যেদিন তোমার মত প্রেমের অনুরাগে আমাদের দিকে তাকাবে, আমরা শীতল হয়ে যাব। হয়তো থাকব, কিন্তু চাঁদের আলোর মতন। যেদিন কেউ পুড়বেনা, সবাই সীতার মত পরম নির্ভয়ে আমাদের মধ্যে থাকতে পারবে।

ভূষণ বলল ঃ আচ্ছা, তোমাকে যদি আমি আমার গৃহদেবতা অগ্নি করে রাখি, তবে?

আসমান একটু ম্লান হাসল। বলল ঃ কবি, জাননা তোমার ঘরের ঐ খড়ের ছাউনী সমাজের শুকনো কামনার খড় দিয়ে ছাওয়া। সেই খড় যে আমার উপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে...।

ভূষণ বলল ঃ তবু—

আসমান বলল ঃ তবু তুমি পারবে না। তুমি থাক স্বপ্নের জগতে, তুমি তো বাস্তবকে চেন না। এ আগুন যারা জ্বলিয়াছে তারা কি নিভতে দেবে? তুমি তোমার ঘরের নিভৃতে আমাকে লুকিয়ে রাখলেও নয়। তারচেয়ে আমাকে তোমার দৃষ্টিতে তুমি যেমন দেখেছ তেমনি দেখ। পতঙ্গেরা যেমনি দেখে তেমনি দেখুক। শুধু তুমি জেন, আমি যে আগুন সে আগুনই। আমার চরিত্রের পরিবর্তন নেই।

ভূষণ বলল ঃ পতঙ্গ তোমার মধ্যে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, কিন্তু তুমি নির্বিকার আগুনই থেকে যাও। তোমার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রেখাপাত ঘটেনা। তাহলে আমি? আমিও কি তোমার মন থেকে....

আসমান একটু হাসল ঃ তুমি শুধু শিল্পীই, কিন্তু তোমার দৃষ্টি এত ক্ষীণ কেন?

ভূষণ তাকালো আসমানের দিকে।

আসমান বলল ঃ ওরা যে আমার মধ্যে হারিয়ে যায়, তাই ওদের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু তুমি আমার মধ্যে থাক পবিত্র সীতা হয়ে, তাই তোমাকে নিজের মধ্যে পেলেও ভুলে যেতে পারি না। তুমি আমার অনন্তকালের আশ্রয়, তোমাকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই। ওরা আমার মধ্যে হারিয়ে যাবার উপাদান, তাই ওদের কোন অস্তিত্ব নেই। তুমি এমন একটি পদার্থ, যাকে কেন্দ্র করে জ্বলা যায় না, যাকে না হলে থাকা যায় না, অথচ যাকে শেষ করা যায় না। বুঝলে কবি—তোমার আমার মধ্যে এই সম্পর্ক।

ভূষণ এ কথার যেন কোন উত্তর দিতে পারল না। সে চুপ করে থাকল।

আসমান বলল ঃ থাক ওসব কথা। এবার আমার কথা শোন, আমার একটি অনুরোধ রাখবে?

—বল।

—এই তো কিছু দূরে গুপ্ত বৃন্দাবন। চল বিগ্রহ দেখে আসি।

ভূষণ বলল ঃ চল।

আসমান বলল ঃ চল। শুনেছি সেখানে এক পরম পবিত্র পুরুষ এসেছেন— পরমানন্দ দেব। পরম বৈষ্ণব তিনি।

ভূষণ ঠাট্টা করল ঃ যদি তিনি বৈষ্ণব হন, তবে তিনি পুরুষ নন। তিনি প্রকৃতি।

জান তো বৈষ্ণবদের কাছে একমাত্র ভগবানই পুরুষ আর সবাই প্রকৃতি। সেই পরম প্রেমের প্রণয়প্রার্থী সবাই।

আসমান হেসে বলল : বেশ, না হয় তাই হোল, চল প্রকৃতিই দর্শন করে আসি।

ভূষণ বলল : কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি জান, তুমি যদি আমাকেই তোমার পরম আশ্রয় বলে মনে করেছ, তোমার আত্মা বলে মনে করেছ, তবে আবার তীর্থযাত্রা কেন?

আসমান বলল : শ্রীরাধিকা জানতেন কৃষ্ণই পরমপুরুষ, কিন্তু তিনিও তবে দেবদেবীর পূজা করতেন কেন? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কেন ৺কালী পূজো করলেন? এগুলো লোকাচার।

ভূষণ হেসে বলল : বেশ তবে চল।

আসমান তৎক্ষণাৎ খাসনবিসকে ডাকল। বলল : এই মুহূর্তে একটি পাল্কী নিয়ে আসুন, আমি গুপ্ত বৃন্দাবন ঘুরতে যাব।

খাসনবিন বলল : আমি পাল্কী সংগ্রহ করছি।

ভূষণ বলল : একটি মাত্র পাল্কী হল, কিন্তু আমি?

—কেন, তুমিও যাবে, একই পাল্কীতে।

—কিন্তু দরওয়াজাতে যদি সুলতানের চরেরা ধরে। রাজ-কর্মচারী ছাড়া তো অন্য হিন্দুরা পাল্কী চাপতে পারে না।

আসমান বলল : পাল্কীতে কি আমাদের কোন দ্বিতীয় সত্তা থাকবে? 'তুমি' তখন 'আমি' হব, আমি আসমান বিবি। আসমান বিবির তাঞ্জামে চাপা নিষেধ নেই জান তো?

ভূষণ বলল : সেই ভাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল্কী এল। নক্সা করা, বণ্ড করা, রূপোর কাজ করা পাল্কী। সেই পাল্কী পথে বেরুল। পথিকরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারা দেখল, পশ্চিম গড় থেকে একটি তাঞ্জাম চলেছে দক্ষল দরওয়াজার দিকে।

তের

> Man's reverential loyalty to this spirit
> of unity is expressed in his religion;
> it is symboliged in the names of his
> deities."
>
> —*Rabindra Nath Tagor.*

শিবিকা দক্ষল দরওয়াজা দিয়ে বাইরে বেরুল। সুলতানের দ্বাররক্ষী সোজা বর্শা উচিয়ে বলল : কে যায়?

একটুখানি ঝালর ফাঁক করে তার অনিন্দিত সুন্দর মুখখানি বের করল আসমান—আসমান বিবি।

জেনানা তাঞ্জামে চাপতে পারে, বিশেষ করে বাঈজীদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিকূল আইন নেই।

গৌড় নগরীর মাটীর দেয়ালের বাইরে মুক্ত বিশ্বে বের হল তাঞ্জাম।

আসমান বলল ঃ এবার ঝালরটা ফাঁক করে দিই?

—কেন?

—পৃথিবীকে দেখি। দেখনা, চতুর্দিকে শ্যাম সজিবতা অনাদৃত গুল্মের বিস্তির্ণ বিস্তার, আম্রকাননেব দীর্ঘ সারি। লক্ষ্য করে দেখ এদের মধ্যে কামনার আগুন নেই।

ভূষণ বলল ঃ তাই তো ওরা সবুজ। তাই তো ওরা স্নিগ্ধ।

আসমান বলল ঃ দেখ, কেমন স্থির মৃগশিশুর মত সমস্ত প্রকৃতি আমাদেব দিকে তাকিযে আছে।

ভূষণ বলল ঃ আমাদেব নয়, তোমার দিকে। তুমি যে ওদের কাছে শকুন্তলা।

আসমান একটু ঠাট্টা করে বলল ঃ তুমি কি দুষ্মন্ত নাকি? মনে রেখ, তাহলেও তুমি তপোবনে চলেছ। তোমার শিকারেব প্রবৃত্তি বাইরে রেখে যেতে হবে। আব শিকারের প্রবৃত্তি বাইরে রাখলে দুষ্মন্তও যা শকুন্তলাও তাই।

ভূষণ বলল ঃ না গো অমন তুলনা দিও না। শেষে অভিজ্ঞান অঙ্গুরী তুমি যদি হারিয়ে ফেল?

—তবু কি তোমার আমার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হবে? তা হবে না। চেনবার জন্য তোমার অভিজ্ঞান অঙ্গুবীর প্রয়োজন হতে পারে, আম'ব হবে না। আমি তোমাকে চিনবও, জানবও এবং বিরহেব মধ্যেও তোমাকে পাবও। আর এ গল্পের শেষ কথা তো আমার জানা আছে—মিলন।

ভূষণ বলল ঃ বেশ, তবে কণ্ব মুনির তপোবনে আমি আমার বন্দুক কার্মুকাদী পবিত্যাগ করে চললুম। আমার দুষ্মন্তত্ব আর কছু থাকল না। কই, কোথায় তোমার প্রকৃতিমৃগ দেখি।

আসমান বলল ঃ ঐ দেখ। দেখ কেমন সবুজের সমাহার।

ভূষণ বলল ঃ আমি দেখছি শ্যাম রূপের নিবিড় বিস্তার।

আসমান বলল ঃ কী এক পরম প্রাপ্তিতে যেন স্নিগ্ধ হয়ে আছে প্রকৃতি, না?

ভূষণ বলল ঃ তা বটে। এখন হাওয়াও নেই, বাতাসও নেই। একেবারে আন্দোলনহীন স্থির প্রশান্তি, যেন চৈতন্যের গভীরে প্রবেশ করে নিজের দেহ-সত্তার কথা ভুলে গেছে, তাই নিশ্চল এক পরম প্রশান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আসমান জিজ্ঞাসা করল ঃ সেই পরম চৈতন্য কি?

ভূষণ বলল ঃ কোন্ দিকটাতে সেটা আমিও বুঝতে পাচ্ছি না।

—মানে?

—মানে, নীচে না উপরে?

—আরো বুঝিয়ে বল।

ভূষণ বলল ঃ অর্থাৎ এই তৃণ, বৃক্ষের শান্ত স্নিগ্ধবিস্তার কি উর্ধ্বে নীল আকাশকে দেখে, না মাটির রসের স্বাদ আস্বাদন করে?

আসমান বলল ঃ আমার কি মনে হয় জানো কবি?

—বল।

—ওরা মাটীর রসের স্বাদ পেয়েছে। কোন রসের স্বাদ না পেলে এমন শান্ত, স্নিগ্ধ, শ্যামল সজীবতা আসে না।

ভূষণ বলল ঃ তাহলে মহাপ্রেমের, অর্থাৎ রসের আস্বাদন বোধ হয় কৃষ্ণই বেশী পেয়েছিলেন।

—কেন?

—সজীব, শ্যামল স্নিগ্ধতা তো কৃষ্ণেরই ছিল। শ্রীরাধিকার বর্ণ ছিল গৌর।

আসমান বলল ঃ কিন্তু শ্যামস্নিগ্ধতা শ্রীরাধিকারও ছিল। সেটা তার অন্তরের। সেখানেই তার সার্থকতা।

ভূষণ বলল ঃ শাস্ত্রে বলে নারী চরিত্র জানা দেবতার সাধ্যাতীত, পুরেষের তো প্রশ্নই নেই। রাধার অন্তরের শ্যামস্নিগ্ধতার কথা জানতে পারলুম।

আসমান বলল ঃ আচ্ছা কবি, পুরুষরা ভাবে ওটাই নারীর দোষ। তাই নারী তাদের কাছে ছলনাময়ী। ওটা কি নারীর সচেতন মনের কাজ বলে মনে কর তুমি? তা নয়। ওটা তার সহজাত। নইলে নারী জীবনের সার্থকতা আসতো না, পুরুষও ভিড়তোনা নারীর কাছে। নারী যদি তার গূঢ় রহস্যকে উদঘাটিত কবে দেয় পুরুষের কাছে, তবে সেই পুরুষ আর তার কাছে যাবে কি? যাবে না। তাই নিজেকে চিরকাল মূল্যবান করে রাখার জন্য, রহস্যের একটা হাতছানি দিযে পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে হয় চিরদিন। প্রকৃতিতে কোথায় নারীর মধ্যে এই চরিত্র নেই বল? ঐ যে ফুল দেখছ, তার অত রূপ কেন? সে কি প্রিয়তমের দূত প্রজাপতিকে তার কাছে লোভের আহ্বান জানিয়ে টানবার জন্যেই নয়? ঐ রূপটাতো আর কিছু নয়! ওটা না থাকলে চলবে কি করে বল।

ভূষণ বলল ঃ সবটা সত্য কি এ কথার? প্রকৃতিতে এমন পাখী আছে, এমন অনেক পশু আছে, সেখানে পুরুষদের দেখা যায় ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে, নিজেদের রূপজাল বিস্তার করতে।

আসমান বলল ঃ হ্যাঁ, জানি সে কথা। সেখনে নারী সৌন্দর্য্যের অভাবে ছলনাজাল বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু সৌন্দর্য্যটাতো ছলনার একটি পথ মাত্র। তারা অন্য পথ অবলম্বন করে। সেটা হল নিজেকে গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে লুকিয়ে রাখা। বিশ্ব সংসারের স্বভাব সেই লুকানো জিনিসকে খোঁজা। যাকে দেখা যায় না তার জন্য সকলে পাগল।

ভূষণ বলল ঃ যা দেখা যায় না তার জন্যই যদি মানুষের কৌতূহল, তবে ভগবান তো সবচেয়ে বেশী অদৃশ্য, সব মানুষ পাগল হয়ে নিশ্চয়ই তার জন্য ছুটতো?

আসমান অবাক হয়ে তাকাল ভূষণের মুখের দিকে ঃ তুমি একি বলছ কবি?

ভূষণ বলল ঃ হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। সেজন্য আমাকে অবশ্য নাস্তিক ভেবো না।

আসমান বলল ঃ না আমি সে কথা বলছি না। মানুষ ভগবানের জন্য ছুটছে না তো কার জন্য ছুটছে? কার জন্য তার এই কৌতূহল? সেই পরমপুরুষ বড় বিরাট-অদৃশ্য। মানুষের ছোট ছোট কৌতূহল। ছোট ছোট অদৃশ্য বস্তুর সন্ধান করতে গিয়ে সেই কৌতূহল বৃহৎ অদৃষ্ট বস্তুর অসীম-অদৃশ্য অবস্থানের কথা জানতে পারে। তাই সেই বিরাট অদৃশ্যকে ধরবার জন্য তার কামনা জাগে।

ভূষণ এবার নিজেই অবাক হয়ে তাকালো আসমানের দিকে ঃ আসমান তুমি এত জান? আজ তোমার কথা শুনবার পর আমার শুধু এইটুকু আশ্চর্য্য লাগছে যে, তুমি তবু নটী কেন?

আসমান আবার হাসল। বলল ঃ কোন্ নারী নর্তকী নয়, বল? আদ্যশক্তি ভগবতী তিনি নিজেই যে নর্তকী। কি নেই তাঁর মধ্যে বল? এক দিকে তার বিদ্যা, জ্ঞান, আর এক দিকে লক্ষ্মী আর কার্তিকেয়। এক পায় তিনি নাচছেন আর এক পায়ে স্থির হয়ে আছেন। আড়ালে তার চরম-উদ্দেশ্য, পরম-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যানগম্ভীর নিস্তরঙ্গ শিব। কিন্তু সেই শিব মূর্তিটিকে তিনি মনের আড়ালের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। যার অন্তরের পরম সত্তা গভীর নৈর্লিপ্তিক প্রশান্তি, বাইরে তার প্রকৃতিরূপে কী নৃত্য! মহামায়ার অংশে আমি সেই নারী, আমার পক্ষেই বা এটা সম্ভব হবে না কেন বল?

ভূষণ বললঃ হে রমণী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার। আমার আর কখনো ভ্রান্তির সৃষ্টি হবে না।

আবার একটু হাসল আসমানতারা ঃ কোন দিন নয়?

—না।

—তোমার চমনলাল যদি আমার মায়ার ফাঁস গলায় আটকে দম বন্ধ হায়ে মরে?

—তবু না। কারণ দেবী মহামায়া নিজে অসুর নিধন করেছেন। এই অসুরের নিধন হবার কারণ কি? লোভ। শক্তি লাভ, ঐশ্বর্য্য লোভ, রূপের লোভ। মহামায়ার রূপে লুব্ধ হয়েছিল সে তাই তার মৃত্যু। কিন্তু সে যদি মহামায়ার সৌন্দর্য্যে কামনান্মোত্ত না হয়ে সেই রূপরশ্মির অন্তরালে পরম সিগ্ধ, স্থির প্রশান্তি ভরা এক অনন্তরূপিণী পরম চৈতন্যসত্তার অবস্থান লক্ষ্য করতে পারতো, তাহলে তার মৃত্যু হোত না, হোত মুক্তি। চমনলাল মুক্তিপথেরই যাত্রী, কিন্তু ভুল করে মৃত্যুকে বেঁছে নিয়েছে।

হঠাৎ আসমানতারা বাইরে তাকিয়ে কি দেখল। যেন করতালি দিয়ে উঠল।

ভূষণ জিজ্ঞেস করল ঃ কি হোল তোমার?

আসমান বলল ঃ আমরা কিন্তু মুক্তির কাছাকাছি এসে গেছি।

—মানে?

আসমান অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখাল ঃ ঐ দেখ।

ভূষণ দেখল—দুটি ময়ূর।

আসমান বলল ঃ আমরা গুপ্তবৃন্দাবনের কাছে এসে গেছি। সেই ব্রজকিশোর নন্দদুলাল আর নিশ্চয়ই দূরে নন।

ধীরে ধীরে পথের দুধারে প্রকৃতির শ্যাম সমারোহ আরো বাড়তে লাগল, আরো মধুরতর স্নিগ্ধতা যেন ফুটে উঠতে লাগল, যেন একটা অতীন্দ্রিয় স্বাদে ভরা ধূপের গন্ধ নাসিকাতে লাগতে লাগল। আসমানের দু'চোখের দৃষ্টি যেন আরো অব্যক্ত রহস্যে ব্যাখ্যাতীত সৌন্দর্য্যে ভরে উঠলে। অবশেষে পাল্কী থামালো বাহকেরা। ভূমি স্পর্শ করল শিবিকা।

বাহকেরা বলল ঃ আমরা গুপ্তবৃন্দাবন এসে গেছি।

পরম শ্রদ্ধাভরে আসমান আর ভূষণ মাটীতে নামল। মাটীতে লুটিয়ে প্রণাম করল আসমান কোন অদৃশ্য দেবতাকে। তার পর কি আশ্চর্য্য! সে ভূষণকেও প্রণাম করল।

ভূষণ অবাক হয়ে বলল ঃ একি করছ?

আসমান বলল ঃ আমার কৃষ্ণকে প্রণাম করছি। এবার চল। আসমান এগিয়ে চলল গুপ্তবৃন্দাবনে বৈষ্ণবতীর্থের দিকে। ভূষণও চলল তার পেছনে পেছনে।

একটু এগুতেই কারুকার্য্যখচিত গুপ্তবৃন্দাবনের প্রবেশপথ চোখে পড়ল। মুণ্ডিত মস্তক বৈষ্ণবেরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আসমান সেই প্রবেশপথের কাছে এসে আর একবার ভূলুণ্ঠিতা হয়ে প্রণাম করল।

অপূর্ব রূপৈশ্বর্য্যশালিনী এই রমণী মূর্তিকে দেখে বৈষ্ণবরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। ভূষণ আর আসমান এগুলো। ওদের মধ্যে কি দেখল সেই সমবেত বৈষ্ণব জনতা জানি না, ওরা কৌতূহলের দৃষ্টি মেলে রেখে পথ ছেড়ে দিযে দাঁড়াল। ভেতরে প্রবেশ করে শ্বেতপ্রস্তরে বাঁধানো আঙিনার উপর নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে প্রেম গদগদ ভাবে আসমানতারা আর একবার প্রণাম করল।

ভূষণ ধূলাতে গড়ালো না। মাথা নত করবাব ভাবও দেখালো না। শুধুমাত্র কি এক মধুর রসসিক্ত কামনাতে মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির দিকে তাকিযে থাকল।

সেই মন্দিরের বারান্দাতে বসে ছিলেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীপরমানন্দ দেব।

ভূষণ তাকে দেখল। যেন একখণ্ড উজ্জ্বল মূল্যবান প্রস্তর। অন্তরের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি আপনিই ফুটে বেরুচ্ছে। মনে হলে ঐ দেহে বোধহয় প্রকৃতি আর পুরুষের সমন্বয় ঘটেছে। তাই পরম প্রাপ্তির স্পর্শে এক পূর্ণতম পবিত্র প্রশান্তি।

বাবাজীও তাদের দিকেই তাকিয়ে থাকলেন।

মন্দিরের একজন পূজারী পাশে বসে ছিলেন। তিনিও তাকালেন সেই দিকে। কিন্তু তিনি চিনতে পারলেন। গৌড়ে কোনদিন তিনি দেখেছিলেন সেই উজ্জ্বল রমণী মূর্তিকে। বাবাজীর কানে কানে বললেন তিনি ঃ আচার্য্য দেব, উনি একজন বাঈজী। বোধহয় মন্দিরে উঠবেন। সম্ভবতঃ আপনার খোঁজ পেয়েই এখানে এসেছেন। ওকে মানা করুন?

বাবাজী একটু হাসলেন। পুরোহিতের দিকে তাকালেন। বললেন ঃ কে বাঈজী? তুমি ব্রজের গোপীবালাকে দেখতে পাচ্ছ না?

—একি বলছেন আপনি? ও যে মহাপাপীয়সী!

—কে পাপীয়সী? ওর চোখের মধ্যে গোপীভাবকে দেখতে পাচ্ছ না?

—গৌড়ে যে ওর কলঙ্কের সীমা নেই। ওর নাম আসমানতারা।

বাবাজী বললেন ঃ শ্রীরাধিকারও কলঙ্ক লাগেনি জীবনে ? তাই বলে তিনিও কলঙ্কিনী ?

জীব্ কাটলেন পুরোহিত।

বাবাজী বললেন ঃ ও পরমাপ্রকৃতি। ওর বাইরে মায়া অন্তরে পরম হ্লাদিনীশক্তি। ওকে ডাক।

পূজারী মাথা নীচু করে থাকল।

কিন্তু আসমানতারাকে ডাকতে হল না। সে মন্দিরের সিঁড়িতে এসে বাবাজীর চরণোদ্দেশে পরম প্রণিপাত জানালো।

বাবাজী তার দিকে তাকালেন ঃ এস, উঠে এস।

আসমান যেন আশ্চর্য্য হল ঃ আমি!

—হ্যাঁ, তোমরা দুজ'নেই।

—কিন্তু প্রভু আমি যে...।

আসমানকে কথা শেষ করতে দিলেন না বাবাজী। বললেন ঃ আমরা কেউ প্রভু নই। আমরা দাসানুদাস। সেই পরমপুরুষ গোপীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পাদনখকণার ভিখারী। তুমি আমি এক, এস।

আসমানের দু'চোখে জলের ধারা নামল।

বাবাজী বললেন ঃ এস, এস, তুমি যে ব্রজের গোপনন্দিনী ছিলে। এস, তোমার আগমনে গুপ্তবৃন্দাবন আজ ধন্য হল।

তা শুনে অন্তরের মধ্যে শিউরে উঠল পূজারী।

বাবাজী বললেন ঃ কাঁদ, কাঁদ, আরো কাঁদ। এই অশ্রুর ধারাই তো যমুনা। এই যমুনার তীরেই তো সেই পরমসখার মোহনমুরলী বাজে।

তা শুনে আসমান যেন আরো কাঁদতে লাগল।

বাবাজী বললেন ঃ তুই কাঁদ, আর গান গা। আমি শুনি। রাধা-কৃষ্ণ শুনুন।

স্বতঃই আসমানের কণ্ঠ থেকে গান ফুটে উঠল ঃ

"সজনী কে কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পায়ত
মঝু মনে নহি পতিয়াই॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লুঁ
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥"

সেই কণ্ঠের মধ্য দিয়ে যেন শ্রীরাধিকার আকুল বেদনা বাজতে লাগল। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে যেন এক অশ্রুসিক্ত বেদনার গম্ভীরতা নেমে এল। বাবাজীর দুই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। তিনি আপন মনেই বলতে লাগলেন ঃ ওরে মাস যাবে তোর, বরষ যাবে, কিন্তু দিন আসবে, যে দিন তোর মাধব আপনি এসে তোর দয়ারে ধরা দেবেন।

আসমান কেঁদে বলল ঃ কিন্তু আমি যে মহাপাপীয়সী প্রভু ?

বাবাজী বললেনঃ কে পাপীয়সী? পঙ্ক থেকে যে পদ্ম ফোটে সেও পুজায় লাগে, আর তোর তো জন্ম বাগিচায়।

আশ্চর্য্য হয়ে আসমান তাকাল বৈষ্ণবাচার্য্যের দিকেঃ আপনি জানেন?

বাবাজী বললেনঃ প্রভু জানেন। তিনিই বলে দিলেন।

—তবে প্রভু আপনি বলুন, আমার শেষ কি?

বাবাজী বললেনঃ শেষ তো তোর কপালে লেখা রয়েছে,. রয়েছে চোখের দৃষ্টির মধ্যে। শেষ তোর প্রেম। মর্ত্যপ্রেমের মধ্যে তুই অনন্ত প্রেমের সন্ধান পেয়েছিস।

আসমান বললঃ তাহলে প্রভু আমাকে আশ্রয় দিন, আমি আর ফিরে যাব না।

বাবাজী বললেনঃ এখনো ফিরে যেতে হবে। আবার একদিন তুমি ফিরে আসবে। সেদিন তোমার নতুন জীবন।

—কবে সে দিন আসবে প্রভু?

—মাধব যেদিন তোমাকে টানবেন সেই দিন।

আসমান কাঁদতে লাগল।

বাবাজী ভূষণের কাঁধে হাত রেখে তার দিকে তাকালেন। বললেনঃ এমন প্রেমিক পুরুষ পেয়েছ তোমার আবার দুঃখ কি? এর মধ্য দিয়েই যে তোমার মুক্তি।

আসমান বললঃ আমার যে পাপ?

বাবাজী বললেনঃ পাপ তোমার নয়, পূণ্যও তোমার নয়, সবই সেই গোবিন্দের ইচ্ছা। ধৈর্য্য ধর, অপেক্ষা কর। তাঁর কার্য্যশেষে তিনিই তোমাকে পথের নির্দেশ দেবেন।

চোদ্দ

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।"
—রবীন্দ্রনাথ।

গৌড়ের পথে আবার ফিরে আসছিল তাঞ্জাম। সেই পথ আর সেই তরুশ্রেণী পথের দুধারে। সেই শ্যামল তৃণাস্তরণে ছাওয়া বাঙলার প্রান্তর। কিন্তু যেন শিশিরসিক্ত হয়ে আছে। যেন একটা নিস্পন্দ বেদনার আবেগে সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বিরহিণী রাধিকার মতই আপন মন্ময়তায় ডুবে ডুবে আসছে আসমান। আর নিশ্চুপ তার সহযাত্রী ভূষণ খাঁ। তার অন্তরেও কাব্যের নতুন পুলক জেগেছে আজ। সেও কি কুড়িয়ে নিয়ে গেল কোন অমূল্য সম্পদ গুপ্তবৃন্দাবনের ধূলিকণা থেকে? কয়েকটি ঘুঘু ডাকছিল শুধু। তারা ছাড়া নির্জন পথে হ্রাসমান দিনের অপরাহ্ণ-পরশ ব্যতীত আর কিছুই নেই। সেই নির্জন পথে দুটি মৌন মন ফিরে চলেছে গৌড়ের মাটীর দেয়ালের মধ্যে; মুক্তি ছেড়ে বন্ধনের মধ্যে।

হঠাৎ কিন্তু সেই নির্জন পথ পশ্চাতে উচ্চকিত হয়ে উঠল। অশ্বখুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন। এক নয়, দুই নয়, অনেক। নিজের মধ্যে মগ্নয় ধ্যানটা ভেঙে গেল ভূষণের। সে সেই দিকে উৎকর্ণ হল। শব্দটা নিকটবর্তী হতে লাগল।

ভূষণ বলল ঃ কারা ?

আসমান যেন এতক্ষণ শুনতে পায়নি। চমকে জিজ্ঞেস করল ঃ কৈ ?

—পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ ? মনে হয় কারা যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ?

আসমান দেখল—ভূষণের মুখে একটা শঙ্কার ছায়া। অভয় দিল ঃ কোন ভয় নেই। দিনের বেলা, গৌড়ের কাছে, নিশ্চয়ই কোন বিদেশী নয়। যদি বড় জোর কেউ হয়, তবে সুলতানের ফৌজ হবে। সুলতানের ফৌজকে তুমি ভয় কর ?

ভূষণ বলল ঃ না।

—আমার জন্য ভয় করছে ?

ভূষণ হাসল ঃ না। তোমাকে কেউ ধরতে পারবে না জানি।

একটু হেসে আসমান তাকাল ভূষণের দিকে ঃ কোন্ আমিটা ?

ভূষণ বলল ঃ বিদেহী তুমি।

এমন সময় শব্দটা আরো বেশী কাছে এল। মনে হল, যেন পাল্কীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তবে পাল্কীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো বহু অশ্ব নয় একটি মাত্র অশ্ব। আসমানও বুঝতে পারল তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে একজন অশ্বারোহী। বহু মানুষের মধ্যে বাস করেছে আসমান—বহু শিকারী বেড়ালের মধ্যে ইঁদুরের মত। প্রতিপদে নিজেকে সাবধান করে চলতে হয়েছে তাকে। মানুষগুলো সম্পর্কে তার ধারণা এতটা তীক্ষ্ণ হয়েছে যে, একটি মাত্র দৃষ্টিতেই সে মানুষকে চিনে বলে দিকে পারে। এমন কি পায়ের শব্দ শুনে মানুষের মনের অবস্থাটা কি সে বলতে পারে। আসমান বুঝতে পারল—তার পাল্কীর পাশে দাঁড়িয়েছে শিকারী। সে তাই মুহূর্তেই নিজেকে সপ্রতিভ করে নিল। অশ্বারোহীর গুরুগম্ভীর প্রশ্ন এল সেই মুহূর্তে ঃ কে যায় তাঞ্জামে ?

ঘোড় সওয়ার একজন মুসলমান। তবে তুর্কী বলে মনে হয়। বাঙলাদেশে এসে বাঙলা ভাষা শিখেছেন, কিন্তু বাঙালীর অন্তরটা তৈবী করতে পাবেন নি। মানুষ দেখে গৌড়ের বাসিন্দারা (সাধারণ থেকে উচ্চস্তর,) স্তর ভেদে কথার ধরন পাল্টায়। পাল্কী বাহকেরা অশ্বারোহীর চেহারা দেখে তার চরিত্রটা অনুমান করে নিয়ে সেই হিসেবেই ভাষা প্রয়োগ করল ঃ আওরৎ।

—আওরতৎ কে ?

ঝালরের ফাঁকে আসমান তখন নিজের মুখখানা বের করল ঃ জনাব, এ বাঁদীর নাম আসমান বিবি। তওফাওয়ালী। পশ্চিম গড়ে থাকি। তলব করলেই দেখা পাবেন।

অশ্বারোহী বলল ঃ আমি মালিক তাজুদ্দিন। দশ আমীরের হুকুম দেনেওয়ালা কর্তা। কুচবিহার জয় করে ফিরছি।

আসমান বলল ঃ হুজুরকে বহুৎ সেলামৎ। আপনার কিসে খুস্ হতে পারে হুকুম করুন।

মালিক বললেন ঃ আমি পশ্চিম গড়ে যাব।

আসমান বলল ঃ জনাবকে সেলাম জানাতে কসুর করব না। গোস্তাকী মাপ্ হয়, এবার আমি ঝালর ফেলছি।

মালিক তাজুদ্দিন বললেন ঃ চল, আমিও গৌড়ে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গেই।

বিনযের ভঙ্গী করে আসমান বলল ঃ 'শাহানশা গৌড়েশ্বর দুনিয়ার মালিক। তাঁর শাসনে সুখে আছি। ডাকু বদমাস লোকের ভয নেই। গৌড়ের দেওয়াল দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে আব মালিকের মত লোককে তক্‌লিব দিতে চাই না। সালাম মেহেরবান।' ঝালরটা নামিয়ে নিল আসমান।

হঠাৎ বোধহয একটু থ খেযে গেলেন মালিক তাজুদ্দিন। তিনি ঘোড়া থামালেন। বোধহয পেছনে অশ্বারোহীদেব জন্য অপেক্ষা করলেন। আসমান মুখের মধ্যে একটা দুষ্টু হাসি টেনে ভূষণের দিকে তাকাল।

তাঞ্জাম এগিযে চলল। দক্ষল দরওয়াজা দিযে আবার গৌড়ে প্রবেশ করল। মাটীর দেওযালের মধ্যে জনাবণ্য, সেই জনারণ্যে হারিয়ে গেল। সেখানে আরো তঞ্জাম চলেছে। আবো হযতো রূপবিলাসিনী বিবিবা চলেছে এদিক ওদিক। কারোর বেগমও চলেছে।

তাঞ্জামেব মধ্যে ভূষণ এতক্ষণে বলল ঃ এবার আমায় নামিয়ে দাও।

আসমান তাকাল তাব মুখের দিকে ঃ কেন, চলনা ?

ভূষণ বলল ঃ তোমারই মানা ছিল। আর রাত্রিতে তো তুমি আসমান থাকবে না, হবে আসমানতারা।

আসমান বলল ঃ তা বটে, কিন্তু আজ রাত্রিতে কোন নাচের আসর নেই। তোমার চমনলাল কোন নতুন চুক্তি কবেনি।

ভূষণ তাকাল আসমানের মুখের দিকে ঃ সে কি! চমনলালের মোহ ভাঙল নাকি ?

—কিম্বা তার অর্থেব অসঙ্কুলান, কোন্‌টা ?

—অর্থেব অসঙ্কুলান্ এর একদিনে দুদিনে হবে না জানি।

আসমান বলল ঃ তা যদি না হয, আমার ব্যর্থতা। পতঙ্গ না পুড়েই চলে গেল।

ভূষণ বলল ঃ কিম্বা অনুশোচনার আগুনে পুড়ে ও শান্ত হয়ে গেছে ?

—কিসের অনুশোচনা ?

—বিবেকেব।

—যাব চোখে কামনার আগুন নির্বাপিত হয়নি, তার মধ্যে বিবেকের প্রকাশ ঘটবে কেমন করে? বিবেক হল বিভূতি, বিবেক হল ভস্ম, না পুড়লে একে পাওয়া যায় না।

ভূষণ বলল ঃ ধরলুম চমনলাল আজ যাবে না, কিন্তু পতঙ্গের অভাব আছে কি। নতুন মালিক তাজুদ্দিনই কি তোমার চোখের আগুন দেখে মুগ্ধ হয়নি ? সেও তো আসতে পারে ? তখনও তো তুমি আসমানের তারা হয়েই ফুটবে। মিটির মিটির কটাক্ষপাত করবে। সে ইঙ্গিতের মূল্য আমি দিতে জানি না।

আসমান বলল ঃ না পারলে। পৃথিবীর কবির মত ঊর্ধ্ব গগনের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কবিতার কথা ভেবো।

ভূষণ বলল : ছোট ঘরে মাটীর প্রদীপ আমার ভাল লাগে। দূরে নক্ষত্রগুলির দিকে আমি হাত বাড়াতে চাই না।

আসমান বলল : সে কিগো, মুক্তি যে দূরেই, মুক্তি যে ভগবান, তার দিকে হাত বাড়াতে হলে কাছে কোথায় পাবে?

ভূষণ বলল : সে জ্ঞানের কথা। জ্ঞানের ভগবান আকাশের মত উঁচুতে, ভক্তির ভগবান মাটীর মত কাছে। আমার পথ ভক্তির, জ্ঞানের নয়।

আসমান বলল : বেশ আজকে তোমার জন্য তুলসীতলায় প্রদীপই জ্বালাব আমি, নাটশালায় আলোর ঝাড় দেব না।

ভূষণ বলল : চল।

তাঞ্জাম এগুতে লাগল।

হঠাৎ কিন্তু তাঞ্জাম থেকে আসমানই লক্ষ্য করল, একটি এক্কা গাড়ী দ্রুত পশ্চিম গড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই গাড়ীর মধ্যে একটি আরোহী। সে আরোহী কোন এক লক্ষ্যস্থলের জন্য আবেগে ব্যাকুল হয়ে বসে আছে। গাড়ীরই মত মনটা তার চঞ্চল বোধহয়। আসমানের চিনতে বাকী থাকল না যে, সে চমনলাল।

ভূষণের দিকে আসমান ফিরে তাকাল : আমার কথাই সত্যি।

—কি কথা?

—তোমার চমনলালের কামনার আগুন নেভে নি।

—কি করে জানলে?

—এই মুহূর্তে দিব্যচক্ষে দেখতে পেলুম।

—কি দেখলে?

—সে কামাগ্নিতে জ্বর জ্বর হয়ে বসে আছে।

ভূষণ বলল : তা হলে আমায় নামিয়ে দাও।

আসমান বলল : তোমাকে তা হলে ভক্তির ভগবানের কাছে ছেড়ে দিলুম।

ভূষণ একটু হাসল শুধু।

আসমান বাহকদের বলল : এই, তাঞ্জাম রোখ।

তাঞ্জাম থামল। ভূষণ নামল। আসমান একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

—আসি।

—এসো। কাল কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব, তুমি তাড়াতাড়ি এস।

—আসব।

ভূষণ চলে গেল।

আসমানের তাঞ্জাম আবার এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে তাঞ্জাম গিয়ে উপস্থিত হল আসমানের কুটীরের সামনে। তার নাটমহল যাই হোক, তার নিজের আবাস কুটীরেরই মত। আবাসে তার মন, মহলে মাধুরী। সেই মন প্রদীপের আলো, সেই মাধুরী আগুনের শিখা।

আঙিনায় প্রবেশ করতেই খাসনবিস এসে দাঁড়ালো। আসমান তাকে দেখেই বুঝতে

পারল সে কিছু বলবে। কি বলবে তাও সে আন্দাজ করে নিতে পারল। আসমান জিজ্ঞেস করল ঃ কি খবর খাসনবিসজী ?

খাসনবিস বলল ঃ চমনলাল এসে বসে আছে।

আসমান বলল ঃ কিন্তু এটা তো তার সময় নয় ?

—কিন্তু কি জানি, সে এখনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আসমান বলল ঃ তাকে বলুন, আমি দেহব্যবসায়িনী নই। নাচের আসর সে চায় তো সময় মত আসবে।

খাসনবিস বলল ঃ হ্যাঁ, সে নতুন করে নাচের আসর কিনতে এসেছে।

—আপনি কি বলেছেন ?

—আমি তাকে কোন কথা দিতে পারিনি।

—কেন ?

—কারণ বণিক রিহনুদ্দিন এসেছিল আজ। সে কিনতে চায় নাচের আসর।

শুনে আসমান একটু ভাবল।

খাসনবিস বলল ঃ শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিকে নিয়ে থাকা আমাদের উচিত নয়। ব্যবসায় চাই প্রসার। বহুজনের মধ্যে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

আসমান বলল ঃ তা নাও হতে পারে। দুষ্প্রাপ্য জিনিষ মহার্ঘ্য। এতে আসমানের মূল্য বাড়বে বৈ কমবে না।

খাসনবিস বলল ঃ তাহলে চমনলালের সঙ্গে চুক্তি করব ?

আসমান একটু ভাবল। একটা হাসিব ছটা ফুটল তার মুখের রেখাতে। এ হাসির মধ্যে কিসের ইঙ্গিত ছিল খাসনবিস তা বুঝতে পারল না। কিন্তু আসমান ভাবল, উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হতে চলেছে।

খাসনবিস জিজ্ঞেস করল ঃ কি বলব ওকে ?

আসমান বলল ঃ বলবেন, এটা আমাদের ব্যবসা। যে বেশী দেবে আমরা তারই।

—বেশ আমি তাকে সে কথাই বলছি গিয়ে।

খাসনবিস চলে গেল। আসমান সেই অবস্থাতেই শয্যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খিল্ খিল করে হেসে উঠল। আগুনের শিখা আরো একটু বেশী জ্বলে উঠেছে। এবার আরো পতঙ্গ পুড়বে। পুড়ে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। হায় বিধাতা তোমার কি অপূর্ব খেলা ! সত্যকে আচ্ছন্ন রেখে মানুষগুলোকে তুমি এমন বিভ্রান্ত কর কেন ? এই মরদেহের মধ্যে মানুষ কি তার পরম আকাঙ্ক্ষিত জিনিষকে পেতে পারে ? এই শিকারী মানুষগুলো নিশ্চয়ই বহু রূপসীর সৌন্দর্য্যসুধা পান করেছে, বহু দেহব্যবসায়িনীর দেহ উপভোগ করেছে। বিবাহিত পত্নীদের দেহটাই কি ওরা কুরে কুরে খায়নি ? কি পেয়েছে সেখানে ? এদের ক্ষুধা তবু মেটে না কেন ? এরা কি বুঝতে পারে না যে, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বজায় রেখে কোনদিন কিছু পাওয়া যায় না ? পাওয়াটা দেহে নয়, পাওয়াটা মনের মধ্যে ! আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সঙ্গে একাত্ম.হতে পারলে আর কোন অভাববোধ থাকে না। দেবী দুর্গতিনাশিনী দুর্গা তো তাই অহংরূপী অসুরকে বধ করলেন জলে নয়, স্থলে নয়,

স্বর্গে নয়, অন্তরীক্ষ্যে—যাতে কোথাও সেই অহং নিজের পা রেখে বলতে না পারে, আমি, আমি, আমি। কিন্তু আসমান তো দেবী নয় মানবী। এই সব রিপুতাড়িত ব্যক্তিদের কোন্ অহংকে সে নাশ করবে? তার মধ্যে কি পরম ভাবের দ্যোতনা জাগে? বরং একটা যেন প্রতিহিংসা। একটা যেন ধ্বংসের বিরাট আগ্রহ। দেবী কি ধ্বংসের রূপ রেখেছেন নারীর মধ্যে আর মুক্তির প্রসাদ নিজের কাছে? তারা কি সেই দশভুজার ধ্বংসের হাত? আশীর্বাদের হাত কি অদৃশ্য? তার নিজের কাছে? আসমান কি স্বইচ্ছায় এই ধ্বংসলীলাতে মেতেছে? আজ তো সে মুক্তির জন্যই গিয়েছিল—তবে বাবাজী এই কথা বললেন কেনঃ 'সময় এখনো হয়নি।' ঘরের দুয়ারে তার পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ভূষণকে পেয়েও কেন সে এই উচ্ছৃঙ্খল ঘৃণ্য জীবনের উন্মাদনাকে প্রতিহিংসার কথাটা ভুলে গিয়েও ত্যাগ করতে পারছে না?

আসমান ঠিক করল, এ নিয়ে আর চিন্তা করবে না সে। মানুষের চিন্তার ঊর্ধ্বে এক বৃহত্তম চিন্তা আছে। মানুষের ইচ্ছার ঊর্ধ্বে এক বৃহত্তর ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছার বাইরে মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা কিছুতেই এগুতে পারে না। নিজের ইচ্ছাতেই যদি জীবন হত, তাহলে তার মা এমন বাজপাখীর কবলে পড়বেন কেন? আর আসমানের নিজের জীবন, যা আম্রকাননের স্নিগ্ধ ছায়ার স্পর্শ দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল—তা কেন গৌড়ের এই ভোগৈশ্বর্য্যময় উগ্র বিলাসের মধ্যে এসে স্থান লাভ করবে? এর মধ্যে কি তার নিজের কোন হাত ছিল? তার মায়ের হাত ছিল? না। তবু এমন হোল কেন? আরো তো বহু মানুষ আছে, তাদেরও তো হতে পারতো? কিন্তু হলনা কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কি পূর্বজন্মের কর্মফলের কথা ভাববে সে? হায়! মানুষের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যদি না থাকে এক বিরাট ইচ্ছার কাছে, তাহলে কী তার কর্মের অধিকার! আপন কর্ম বলে কি কোন কর্ম আছে? তাহলে ভাগ্য থাকে না। যদি ভাগ্য থাকে কর্ম থাকে না। কবির শেখ একসময় তাকে বলতঃ ভাগ্য আর কর্ম দুই-ই আছে। ভাগ্য থাকলেই শুধু হবে না, কর্ম দিয়েই তাকে পেতে হবে। কিন্তু আসমান কোনদিনই তার সেই সান্ত্বনাবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি। ভাগ্য যদি প্রবল, কর্মে আগ্রহ সেই সৃষ্টি করবে। কর্মটাও তো তার অধীন। আর না হলে ভাগ্যকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করতে হয়। একদা আসমান তার নিজের জীবনের বিপর্যায় দেখে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারাতে চেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে হয়েছিল প্রতিহিংসাপরায়ণা, আর মনের মধ্যে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করেছিল। মনে হয়েছিল, যদি তার সমস্ত সত্তা এক সঙ্গে ঘলে উঠে, তবু যে পাপের বিরুদ্ধে তার তীব্র আক্রোশ সেই পাপকে সে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারবে না। একথা মনে হতে তার যন্ত্রণা আরো বেড়েছিল। তারপর একটা ব্যর্থ হতাশায় কেঁদে ভেঙ্গে পড়ে সে ভগবানকে ডেকেছিলঃ প্রভু তুমি আছ, তুমি প্রতিবিধান কোরো।

সেই অদৃশ্য এক পরম পুরুষের প্রতি তীব্র অভিমানে তার নয়ন থেকে যে স্নিগ্ধ অশ্রু নির্গত হয়েছিল—তার মধ্যে সে পেয়েছিল শরতের প্রভাতী শিশিরের স্বাদ। ভাল লেগেছিল। কেঁদে সে বলেছিলঃ প্রভু, তুমি থাক বা না থাক, তবু আমার বিশ্বাসে

তুমি বেঁচে থাক। তুমি না থাকলে যে আমি কারো কাছে কাঁদতেও পাব না।' সেই থেকে তার কাঁদবার জন্য ভগবান রয়েছেন। কিন্তু সেই ক্রন্দন কি তার ব্যর্থ হয়েছে? না। অন্তরের যন্ত্রণাটা কমেছে বৈকি! সব কিছুকেই সে এখন গ্রহণ করতে পারে। যে একটি নির্বিকল্প উদাসীনচিত্ততা তাকে এই প্রশান্তচিত্তের ঔদার্য্য দান করেছে তা সেই অদৃশ্যে পরম শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখার জন্যই হয়েছে। আর সেই বিশ্বাসের ফলই কি ভূষণ খাঁ! সমস্ত বন্ধনের উর্ধ্বে সে একটি নির্মল সত্তা। আচাবের মধ্যে তাকে মেলেনি বটে কিন্তু চিরন্তন সত্যের পরম স্পর্শে সে আজ পাবারও অধিক প্রাপ্য হযেছে। এই কি সে কোনদিন আকাঙ্ক্ষা করতে পেরেছিল? না। না চাইতে তবে কে তাকে এই দান এনে দিল? সেই এক মহা ইচ্ছার ইচ্ছা ব্যতীত একে আর কি বলা যেতে পারে? না ভেবে সেই ইচ্ছার ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। এই মুহূর্তে চমনলালের মুখ কল্পনা করতে একটা প্রতিহিংসাপরায়ণতা জেগে উঠতে চায়। সেও কি তার নিজের ইচ্ছায়? না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের মধ্যে যে জিঘাংসার ছবি তা কি তার নিজের? না। ভগবানই তো বলেছেনঃ 'তুমি নিমিত্ত মাত্র।' আসমান কোন এক মহৎ ইচ্ছার হাতে নিমিত্ত মাত্র ছাড়া আর কি? সেই মুহূর্তে যেন দূর থেকে তার মনের মধ্যে একটি বাণী ভেসে উঠলঃ "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" আসমান হাত জোড় করে বলে উঠলঃ কর্মেও আমার কোন অধিকার নেই, প্রভু সব তুমি, তুমি।

সেই তুমিকে অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগল আসমান।

এমন সময় খাসনবিসজী আবার ফিরে এল।

আসমান তার দিকে তাকলঃ হ্যাঁ, বলুন।

খাসনবিস বললঃ চমনলাল সবাব চাইতে বেশী দিতেই রাজী।

শুনে আসমান একটু হাসল। বললঃ বেশ তাই হবে। তবে শেঠজীকে বলে দিন আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে। গৌড়ের একজন মালিক আসবেন, আর আসবেন একজন বণিক। তিনজনের মধ্যে যার মোহরের অঙ্ক বা মোহের অঙ্ক যাই বলুন, বেশী হবে, আসমানের নৃত্যের আসর তার জন্যেই।

—বেশ, আমি চমনলালকে সেই কথাই জানাচ্ছি।" খাসনবিস চলে গেল।

খাসনবিস সে কথা চমনলালকে জানালে চমনলালের মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। তার মনের মধ্যে অর্থসমস্যার কোন প্রশ্ন দেখা দিল না। সে জানে তার যেটুকু সঞ্চয় আছে সেটুকু অনেকরেই সামর্থের বাইরে। কিন্তু তার মধ্যে যা দেখা দিয়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করল তা হল এই যে—তবে আসমান কি তার প্রতি বিরূপ হয়েছে? আসমানের কোন আকাঙ্ক্ষা কি সে অপূর্ণ রেখেছে? ভূষণের যে পদগুলির তার কাছে কোন মূল্যই নেই, সেগুলিও সে আসমানের জন্য পাঁচ মোহর দামে কিনে এনে দিয়েছে। মূল্য দিয়েই এনে দিয়েছে। ইচ্ছে করলে বিনা মূল্যে সে কিং এগুলো এনে দিতে পারতো না? আসমান কি জানতো শুধুমাত্র তার কাছে তার কথার খেলাপ যাতে না হয় সেই জন্য অলক্ষ্যেও মূল্য দিয়ে পদগুলি সংগ্রহ করেছে! তবে আসমান এমন করল কেন? তাই তার মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। তার যে আকাঙ্ক্ষা মেটেনি! আসমানকে

যে সে এখনো পায়নি—তবে? একটা উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা তার মনে দুর্দান্ত ঝড়ের বেগের সৃষ্টি করল যেন। সমস্ত বাধানিষেধের আড়ালকে ভেঙে তার মনে হল ঐ মুহূর্তে সে আসমানের কাছে ছুটে যায়। আসমানকে তার চাইই। একটা প্রবল মানসিক আন্দোলনে সে নিজের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। তবু সে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা আশার ছলনাতে সে বসে থাকল। মনে হল—অর্থের যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে তাতে সে জয় লাভ করবে। আসমান ও তার মধ্যে যে ব্যবধানের প্রাচীর উঠতে যাচ্ছে তা গুড়িয়ে যাবে। তাই সে বসে থাকল।

কিন্তু কিছুকাল পরে সে হঠাৎ এমন একটি দৃশ্য দেখল, যাতে না চমকে থাকতে পারল না। যেন সে বিশ্বাস করতে পারল না নিজের চোখকে। সে কখনো এই প্রতিযোগিতাতে নামতে পারে বিশ্বাস করতে পারল না চমন। সে দেখল বাইরে একটি ঘোড়ার গাড়ী এসে থামল। তার মধ্য থেকে যে নামল—সে অবিশ্বাস্য। সে রিহান। চমনলাল চমকে উঠল, একটু কেঁপে গেল। কেন? নিজের অন্তরের মধ্যে কোন বিবেকের দংশন সে অনুভব করল কি? তার কি মনে পড়ল দক্ষল দরওয়াজার কথা? তার কি মনে পড়ল—এই সেদিনও গৌড়ের একদল তরুণের একাত্ম প্রীতির কথা? মনে পড়ে কি বৃশ্চিক দংশন অনুভব করল যে, আমরা কেউ কখনো একে অপরের কাছ থেকে মনের কথা লুকাইনি? লজ্জা বোধ করল কি সে যে, আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছে ওদের কাছ থেকে? হয়তো তাই। যদিও আজ সে কামনার মেঘে আচ্ছন্ন, আত্মবিস্মৃত, তথাপি অবচেতন মন হযতো তাকে এসব কথাই বলে দিল। চমনলাল মুখটা নামিয়ে নিয়ে নিজের কোলের দিকে তাকিয়ে রইল।

রিহানও দেখল চমনলালকে। একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার মনে মধ্যে কেন্ ভাবের সঞ্চার হোল? ঈর্ষার? ঘৃণার? তা বলা যায না। রিহান বোধহয ঠিক কোন উন্মাদ কামের তাড়নাতে এখানে ছুটে আসেনি। কোনদিন তার মনের মধ্যে একটা জেদ চেপেছিল। সে একদিন চমনলালের বিশ্বাসঘাতকাতায় আঘাত পেয়েছিল। নর্তকীর আসরে চমনলাল তাকে প্রত্যাখ্যান করবে এটা সে ভাবতে পারেনি। এত স্বার্থপর হয়ে চমনলাল বন্ধুত্বের মর্য্যাদাকে অস্বীকার করতে পারবে ভাবতে পারেনি সে! তাই একদিন এর প্রতিশোধ নেবে এটাই সে ভাবছিল। পশ্চিম গড়ে এসেছিল সে আজ সকালবেলা। ফেরবার পথে হঠাৎ তার আসমান বাঈয়ের কথা মনে পড়ে যায়। সে খোঁজ করে। খাসনবিসের কথায় সে জানতে পারে, চমনলালের চুক্তির মেয়াদ আজ শেষ হয়েছে। আজ যে কেউ আসমানের আসর কিনতে পারে। রিহানের তাই মনে হয়েছিল—সেইই কিনবে এ আসর। কিন্তু সে একা আসবে না, আসবে বুরহান, আসবে ভূষণ। চমনলালকেও নিশ্চয়ই সে নিয়ে আসবে। তাকে আনা বেশী প্রয়োজন। শুধুমাত্র সে আজকের আসরটি কিনে নেবার জন্যই এসেছিল। সূর্য্য এখনো ডোবেনি। আবার সে ফিরে যাবে দক্ষল দরওয়াজাতে। বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ফিরে আসবে। হঠাৎ সে এখানে এভাবে চমনলালকে দেখবে আশা করতে পারেনি। একটুখানি বিদ্রূপের রেখা বুঝি ফুটে উঠল তার মুখমণ্ডলে। সে চমনলালের দিকে তাকাল। ডাকল ঃ এই যে চমন ভাই, তুমি?

চমন মুহূর্তেই পূর্ব অভ্যাসবশতঃ মাথাটা উঁচু করে রিহানের মুখের দিকে তাকিয়েই আবার নিচু করে নিল।

রিহান বলল : তোমাকেই আজ খোঁজ করছিলুম আমি।

চমন কোন উত্তর দিল না। রিহান বলল : আজকের আসমান বিবির নৃত্যের আসর আমি নিচ্ছি। তোমাকেও আসতে হবে।

নিজের মনের মধ্যেই একটুখানি আন্দোলিত হল, একটুখানি কেঁপে উঠল চমন। কেন? ক্রোধে? লজ্জায়? কে জানে।

রিহান বলল : যা হোক, তোমাকে এখানেই পেলুম। তুমি থাকছ নিশ্চয়ই?

চমনলাল কোন কথা বলল না।

এমন সময় খাসনবিস সেখানে এল।

রিহান বলল : এই যে আমি এসেছি। আজকের চুক্তি আমার।

খাসনবিস বলল : আর একটু অপেক্ষা করতে হবে খাঁ সাহেব।

—কেন? আসমান এখনো ফেরেনি?

চমনলালের বুকটা কেঁপে উঠল। সেকি! আসমান কোথায় গেছে?

খাসনবিস বলল : হ্যাঁ মালিকান ফিরেছেন, তবে...

—তাকে খবর দিন।

—না, আপনাকে একটু আপেক্ষা করতে হবে।

—কেন?

—মালিক তাজুদ্দিন আসছেন এখানে। তিনি যদি আসেন তাঁর মর্জির উপর অনেকটা নির্ভর করবে।

—মানে?

—হাজার হলেও তিনি সুলতানের গণ্যমান্য একজন আমীর। দশজন আমীরের মালিক। তাকে অবহেলা করে আর....

যেন আত্ম-অভিমানে একটু আঘাত লাগল রিহানের। বলল : তাজুদ্দিন মালিক হতে পারেন, আমরাও অভিজাত ঘরের ছেলে। আর তাজুদ্দিনের কত অর্থ আছে? সুলতানের কোন একজন মালিকাকে কিনে নেবার মত ক্ষমতা এ বান্দার আছে। সুতরাং অর্থের যদি প্রতিযোগিতার কথা হয় সে কথা বলুন।

খাসনবিস বলল : সে প্রশ্নটা তো রয়েছেই। আসমান বিবিরও তাই অভিমত—যিনি বেশী দেবেন আজকের নাচ তার জন্যই।

রিহান বলল : তবে সব চাইতে বেশী দর রইল আমার।

যেন একটা ক্রোধের ভাব ফুটে উঠল চমনলালের মধ্যে। হঠাৎ সে ছিটকে উঠে দাঁড়াল। বন্ধুত্বের কথাও বুঝি আর তার মনে থাকল না। অতীতের কোন দিনের পরিচয়ের কথাও বুঝি আর তার মনে এল না। কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না, মানে বলবার অবকাশ তার থাকল না। সেই মুহূর্তে বাইরে একটি গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। খাসনবিস সেই দিকে তাকাল। রিহানও। সকলে দেখল দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ, কিন্তু নিত্যান্ত রুক্ষ একজন পুরুষ। মাথায় উষ্ণীষ। কৃষ্ণ শ্মশ্রু।

খাসনবিস সালাম জানালো ঃ আইয়ে জনাব। তার বুঝতে বাকী থাকল না যে, আগন্তুকই মালিক তাজুদ্দিন।

তাজুদ্দিন নিতান্ত অবজ্ঞাভরে রিহান আর চমনলালের দিকে তাকালেন। খাসনবিসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কে?

—আমি আসমান বিবির বান্দা।

—এরা কে?

খাসনবিস বলল ঃ ইনি শেঠ চমনলাল, আর ইনি বণিক রিহানুদ্দিন।

শুনে নিতান্ত অবজ্ঞাভরে ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন তাজুদ্দিন। খাসনবিসকে বললেন ঃ গুপ্তবৃন্দাবন থেকে যিনি ফিরলেন কিছু আগে, সেই আসমান বিবির ঘরকি এটাই?

—আজ্ঞে জনাব।

—তাকে জানাও যে মালিক তাজুদ্দিন এসেছেন।

খাসনবিস তৎক্ষণাৎ অনুগত ভৃত্যের মত মালিকের আগমন সংবাদ জানাবার জন্য অন্দরে গেল।

নিজেব মনেব মধ্যেই তখন হেসে কুটি কুটি হচ্ছিল আসমানতারা। সে হাসির একটু ঝলক দেখতে পেল খাসনবিস। কি কাবণে তার এই হাসি খাসনবিস বুঝতে পারল না।

খাসনবিস বলল ঃ মালিক তাজুদ্দিন এসেছেন।

আসমান বলল ঃ আমাব তো কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রযোজন নেই? কে বেশী দিল? আজকের আসব তাব জন্যই।

এতবড একজন মালিক তাকেও আসমান প্রত্যাখ্যান করবে! কিছু যেন বুঝতে পারল না খাসনবিস। সে দাঁড়িযে থাকল।

আসমান বলল ঃ কি দাঁড়িযে রইলেন কেন? যান, দেখে আসুন আজকের আসর কাব জন্য। সেইভাবে প্রস্তুত হব।

দুক দুক বক্ষে ফিবে এল খাসনবিস।

খাসনবিসকে দেখে তাজুদ্দিন বললেন ঃ বিবিকে আমার সেলাম জানিয়েছ?

—জানিয়েছি জনাব।

তাজুদ্দিন চমনলাল আর রিহানকে দেখিয়ে বললেন ঃ এদের এখান থেকে যেতে বল।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে লাফিয়ে উঠল চমনলাল ঃ আসমানের আসর আমার।

মোহরের তোড়া ছুঁড়ে দিল রিহান খাসনবিসের দেহের উপর ঃ এই নাও। আসর আমার।

একটা ক্রুর দৃষ্টিতে রিহান আর চমনলালের দিকে তাকিয়ে তাজুদ্দিন বললেন ঃ আজকের সন্ধ্যাবেলার আসর আসমান বিবির কাছ থেকে আমি নিচ্ছি।

চমনলাল উঠে দাঁড়ালো ঃ কত মোহর দেবে?

একটু বিদ্রূপাত্মক সুরে বলল তাজুদ্দিন ঃ টাকার হিসেব শেঠজী আর বেনেরা করে। আমরা হিসেব করে চলি না। আমরা হিসেব করি শুধু এইটির, বলে নিজের কোমরের তলোয়ারখানি খুলে সে চমনলাল আর রিহানকে দেখাল।

তলোয়ারের একটি ঝলক দেখে খাসনবিস নিতান্ত ভয় পেয়ে গেল। কি হয় কে জানে! রিহানের দুই চোখে সে আগুন দেখতে পেল। স্থির দৃষ্টিতে কিছুকাল একটা পাথরের মুর্তির মত রিহান তাজুদ্দিনের দিকে তাকয়ে থাকল। তারপর যাবার জন্য পা বাড়াল।

খাসনবিস ছুটে গিয়ে টাকার তোড়াটা রিহানের হাতে ফেরৎ দিলঃ খাঁ সাহেব, এই আপনার.....

রিহান সে অর্থ হাতে নিল না। বললঃ গুণে রাখ, এই অর্থ কাজে লাগবেই।

সে চলে গেল।

তাজুদ্দিন ধমকে উঠলেন চমনলালকে—বাহার যাও।

কি করবে বুঝতে না পেরে চমনলালও বেরিয়ে এল। তার কান্না পেতে লাগল। সে দেখল রিহান তার এক্কায় গিয়ে চেপেছে। চমনলালও তার পিছনে নিজের এক্কায় গিয়ে চাপল।

রিহানের এক্কা গিয়ে সরাইখানাতে থামল। রিহান এক্কা থেকে নেমে গিয়ে সরাইখানাতে ঢুকল।

চমনলালও নামল গিয়ে সেখানে। সেও গিয়ে সরাইখানাতে উঠল।

রিহান উগ্র এক বোতল সিরাজী নিল।

চমনলাল দেখলঃ তার পেয়ালা থেকে বুদ্বুদ উঠেছে। সেও গিয়ে রিহানের পাশে বসল। রিহানের দুই চোখে যেন আগুন ছুটছে তখনো। তুর্কীরক্ত রিহানেরও মধ্যে। আভিজাত্য তার কোন অংশেই কম নয়।

চমনলাল ডাকলঃ দোস্ত্।

রিহান চুপ করে থাকল।

চমনলাল বললঃ "আমি বড় স্বার্থপর হয়ে তোমাদের কাছ থেকে দূরে থেকেছি, আমার এই নীচতা ক্ষমা কর। বিশ্বাস করো আমি পাগল হয়ে গেছি।"

চমনলালের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

বিহান বললঃ চমন তোমার দুর্বলতা আমরা বুঝতে পারি। তোমাকে ক্ষমাও করতে পারব। নইলে সে রাতে তুমি আসমানের আসরে ঢুকতে না দিয়ে যে অভদ্রতা করেছিলে, তার প্রতিশোধ নিতুম। আসমানের প্রতি আমাদের লোভ নেই, নইলে ছিনিয়ে নিতুম।

নিতান্ত একটা বুদ্ধিহীন বোকা ছেলের মত চমনলাল রিহানের হাত জড়িয়ে ধরল। বললঃ তুমি লোভ কোর না কোন দিন ওর প্রতি। ওকে ছেড়ে দাও। ওকে না হলে আমি বাঁচতে পারব না।

তার এই কাতর ভাবের মধ্যে এমন একটা নোংরা ইঙ্গিত ফুঠল যে রিহানেরও রাগ হল। সে বিদ্রূপ করে বললঃ চমন, দুনিয়াটা ক্লীবের জন্য নয়, খোজার জন্য নয়, মরদের জন্য। মরদ যদি, তবে কে এক মালিক এসে তোমাকে অপমান করল, প্রতিবাদ করতে পারলে না? ছিনিয়ে নিতে দিলে আসমানকে?

চমনলাল কেঁদে ফেললঃ ভাই তুমি বাঁচাও আমাকে ঐ দুষ্‌মনটার হাত থেকে।

রিহান বললঃ তোমার পুরুষকার তোমাকে বাঁচাক না বাঁচাক আমার মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু ও দুষ্মনটা আমাকে অপমান করেছে। আমিও তুর্কী রিহান। আমি তোমার মত কামোন্মত্ত নই। তাজুদ্দিন মালিক হতে পারে, কিন্তু রিহানও মালিকপুত্র। সে মুহূর্তেই বুঝতে পারবে যে গৌড়ের কোন নাগরিক অপমান সহ্য করতে জানে না।

শেষবারের মত সিরাজীর পেয়ালাটা নিঃশেষিত করে সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর, সবাইখানার মালিকের দিকে একটা সোনার মোহর ছুড়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে বাইরে চলে গেল। চমনলাল সেখানেই বসে থাকল।

অপর দিকে দক্ষল দরওজায় কিন্তু তখন ভিন্ন দৃশ্য। সেখানে চিরাচরিত মানুষের ভীড় জমেছে। বন্ধনের মধ্যে নয, লোভের মধ্যে নয, হিংসার মধ্যে নয়, দ্বেষের মধ্যে নয—প্রেমের মধ্যে এসেছে মানুষেরা। আকাশের প্রেমে, বাতাসের প্রেমে, অসীমের প্রেমে। এইখানে একটুখানি মক্তির স্বাদ মেলে। এখানে এলে জীবনের আর একটি স্বাদ। সেই স্বাদ দক্ষল দরওযাজার একদল তরুণকে শৈশব থেকে আকৃষ্ট করে এসেছে। বুরহান তাদের মধ্যে একজন। বিকেলবেলা ঘরের বাঁধন থেকে মুক্তি নিয়ে সে বাইরে এল। দক্ষল দবওযাজাব সিঁড়িতে গিযে বসল। তখনো সেখানে কেউ এসে বসেনি। বুরহান একাই সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। আকাশেব দিকে তাকাল সে, বাতাসের স্পর্শ নিল, আব মনে মনে বলতে লাগল ঃ আহা! কী মধুর এই আকাশ, আর স্নিগ্ধ এই অপরাহ্নের বাতাস! গৌড়ের সৌন্দর্য্য কোথায় থাকতো, যদি না দক্ষল দরওয়াজার উপর এই আকাশের নিবিড় নীলপ্রশান্তি থাকতো! যদি না দক্ষিণের এই মৃদু মৃদু মলয়হিল্লোল থাকত! গৌড়ের অভ্যন্তরেব এই জীবনের চেয়ে গৌড়েব চতুষ্পার্শেব এই প্রকৃতির আকর্ষণ কম কি! বুরহানের মনে হয়, এরাও তার জীবনরে সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে থাকবে। এই যে তাদের কযেকটি তরুণ গৌড়ের বিরহকে সহ্য করতে পারে না, তার কারণ কি? তাব কারণ শুধুমাত্র গৌড়ের বিলাস নয়, গৌড়ের ঐশ্বর্য্য নয়, গৌড়ের প্রকৃতিও। এই কারণেই বাইরের দুর্দান্ত প্রলোভনকে গৌড়ের সন্তানেরা এড়িয়ে আসতে পারে। নইলে রিহান কি মেহেরুন্নিসাকে ছেড়ে ফিরে আসত? সে বণিক, সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর বাণিজ্য সম্ভারও পেত। গুজরাটের বন্দরে এই দুয়েরই আকর্ষণ কম নয়। আর চমনলাল সেও কি দুলারী বাঈকে ফেলে আসতে পারতো? গৌড়ের পটভূমির বাইরে, কোন সৌন্দর্য্য যেন সৌন্দর্য্যই নয়, কোন আকর্ষণ যেন আকর্ষণই নয়। দুলারী বাঈয়ের কথাটা মনে পড়তে হঠাৎ চমনলালের কথাটা মনে পড়ল বুরহানের। চমনলালের কি হল? গুজরাটের বন্দরে সে যদি রূপের মোহ কাটিয়ে আসতে পারল তবে গৌড়ে এসে সে এমন হল কেন? গৌড়ের আকাশ, দক্ষল দরওয়াজার অনিবার্য্য আকর্ষণ, সবই কি তার ভুল হয়ে গেল? সামান্য একটা নারীর মোহ সে ত্যাগ করতে পারল না! চমনলালের জন্য দুঃখ হল তার। দক্ষল দরওয়াজায় তার আসনটি শূন্য।

দিনের আলো ততক্ষণ একেবারে নিস্তেজ হয়ে এসেছে। একটা কমলা আভা ফুটে উঠেছে আলোর মধ্যে। বুরহানের চৈতন্য হল। চমনলাল তো নিয়মিত অনুপস্থিত। কিন্তু তার আর বন্ধুরা গেল কোথায়? রিহান কোথায়? সে তো কোনদিন অপরাহ্নে দক্ষল

দরওয়াজায় না এসে থাকে না! দিন তো শেষ হয়ে যায়, সে এখনো এল না কেন? একটা বিরাট অভাব বোধ হল বুরহানের। দক্ষল দরওয়াজার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তারা কয়েকটি বন্ধুও যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে! কি হল রিহানের? তবে কি তাদের জীবনের মধ্যে একটা বিপরীত স্রোত বইতে শুরু করেছে? রিহানও কি কোন......।

না, না, তা সম্ভব নয়। রিহানকে সে অন্তরঙ্গভাবে চেনে। দুর্বলতার ফাঁদে পা বাড়াবার ছেলে সে নয়। চমনলালও কি তেমন ছিল? না। কিন্তু হঠাৎ কি হল কে জানে? মানুষ নিজেই হয় তো জানে না তার অন্তরের মধ্যে কখন কি ভাবে কোথায় আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত হয়ে থাকে। কখনো হয়তো অবিশ্বাস্য রূপে বাইরের আহ্বান সেই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগরিত করে দেয়। তখন মানুষ নিজেরই অন্তরের অবিশ্বাস্য পরিবর্তনে নিজেকেই চিনতে পারে না। তবে কি রিহানেরও...! না। এমন ঘটনা ইতিমধ্যে কি ঘটেছে? না। বুরহানের মনে হল তবু কি যেন ঘটতে চলেছে তাদের জীবনে! জালালের বিদায়ই তাদের জীবনে একটা বিপর্য্যয়ের মত দেখা দিয়েছে। বিশেষ একটা শক্তি ছিল জালালের। সে মানুকে বুঝতেও পারে, বোঝাতেও পারে। সে থাকলে হয় তো চমনলালের এমন বিপথযাত্রা সম্ভব হত না।

সূর্য্যের কমলা রোদও ম্লান হয়ে আসতে লাগল। আজানের শব্দ শোনা গেল। বুরহান পশ্চিমদিকে মুখ করে সন্ধ্যাবেলার নামাজটা সেরে নিল। তারপর ছায়ার আবরণে সন্ধ্যার আলোকে আবার বসল। কেউ যে এল না! ভূষণটাও নেই। অবশ্য ভূষণ না থাকলে তত কিছু ভাববার থাকে না। লোকটা খেয়ালী। বাস করে বাইরের জগতে ততটা নয়, যতটা অন্তরের জগতে। এই দক্ষল দরওয়াজার আবেদনের যে তার কাছে কোন মূল্য নেই তা নয়। কিন্তু দরওয়াজা তার নিজের মধ্যে আর এক বিশেষ রূপে প্রতীয়মান হয়ে যে আকর্ষণের সৃষ্টি করে তা অতুলনীয়। অপরাহ্নের রাঙারৌদ্রে দক্ষল দরওয়াজার চূড়োতে রঙ পড়ে। কিন্তু ভূষণের মনের রঙের যে প্রতিফলন ঘটে দক্ষল দরওয়াজাতে, তা আরো মধুর। সেই রঙের বাইরে সমগ্র গৌড়টাই বুঝি বিচিত্র এক মনোহারিণী রূপ নেয়। তখন সে নিজের মধ্যেই মম্ময় হয়ে আত্মস্থ হয়ে থাকে। বন্ধুবান্ধবদের যে ভোলে তা নয়। হয়তো মনের কল্পনাতে তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সে আনন্দে অনবরত কথা বলে চলেছে। বন্ধুর জন্য আন্তরিকতা হয় তো তাদের চেয়েও তার অনেক বেশী। তবু এর কাছে খুব বেশী আশা করা যায় না। অনেকটা যে সকলের সঙ্গে মিল খায় এই যথেষ্ট, কারণ তার কল্পনার জগৎ বাস্তবের সংস্পর্শে এসে ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা। সেটি যে আজ পর্য্যন্ত খায় নি এটাই বুরহানদের কৃতিত্ব। তাই ভূষণের অভাব মনের মধ্যে কোন শঙ্কার সৃষ্টি করে না।

বুরহান আজ একা নিঃসঙ্গ দক্ষল দরওয়াজাতে। বন্ধুদের অভাব সে মনের মধ্যে তাদের কথা কল্পনা করে পূরণ করবার চেষ্টা করছিল। আর মাঝে মাঝে কল্পনা যখন শেষ হচ্ছিল—সে ফিরে তাকাচ্ছিল পথের দিকে, কাউকে দেখা যায় কি না তাই দেখার জন্য।

এইমাত্র সে কল্পনা শেষে আর একবার পথের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখল, কি ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে ভূষণ আসছে। যার কথা সে খুব বেশী আশা করতে পারে নি সেই আসছে। কিন্তু তবু সে পুলকিত হল।

ভূষণ কাছে আসতেই সে ডাকল : এই যে দোস্ত্, এস, এস।

ভূষণ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, বুরহান একা। বলল : একি দোস্ত্ তুমি একা!

—আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। এস, বোস।

ভূষণ গিয়ে বসল বুরহানের পাশে।

—রিহান আসেনি আজ?

—না, সে কথাই ভাবছি।

ভূষণ বলল : আশ্চর্য্য তো!

বুরহান জিজ্ঞেস করল : কেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—না। কিন্তু ও তো এখানে রোজ আসে এবং আসবেই এ তো জানা কথা।

বুরহান বলল : আমিও তো সে জন্যে একটু চিন্তিত। দিনে দিনে কি আমরা বন্ধু হারাব?

ভূষণ বলল : কেন, এই তো বন্ধুমিলনের সময়।

—কেমন?

ভূষণের মত শান্ত ছেলের চোখেও একটা বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠল যেন। বলল : গৌড়ে রূপসীর ছোখে আগুন জ্বলছে। পতঙ্গদের দৃষ্টি সেই দিকে। আগুনে পুড়ে যদি কেউ ফিরে আসতে পারে তবে তার অগ্নিশুদ্ধি। তার পতঙ্গস্বভাবের মৃত্যু হবে। আর আগুন দেখবার পরও যদি কেউ সে দিকে ঝাঁপিয়ে না পড়ে বুঝব পতঙ্গস্বভাব তার নয়। সেও খাঁটি। এই তো বন্ধুবিচারের উপযুক্ত মুহূর্ত।

বুরহান বলল : তোমার কি মনে হয় রিহানও সেই আকর্ষণে...।

ভূষণ বলল : দোস্ত্ অতটা আমি বিচার করতে পারিনে। ও কথা থাক। আমি আর তুমি আছি, এস আমরা দুজনেই কথা বলি।

—কিন্তু ওদের জন্য ভাবনাটাকে কিছুতেই যে মনের মধ্য থেকে তাড়াতে পারছি না। আচ্ছা কবি, তোমার কি মনে হয় রিহানও কখন রূপের মোহে পড়তে পারে?

ভূষণ বলল : কেন পারবে না? তুমি পড়নি? আমি পড়িনি?

—আমি? তুমি? কার বলতো?

—কার অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তির আমি জানি না। কিন্তু রূপের আকর্ষণে আমরা সবাই পড়েছি। রূপটা কি? আকর্ষণী ক্ষমতা। কখন দেহেও রূপ হয়, কখন বিদেহেও রূপের সন্ধান মিলতে পারে। তোমার আছে দখল দরওয়াজার রূপাকর্ষণ, চমনলালের আসমানতারার।

বুরহান বলল : আমি ঐ আসমানতারার কথাই বলছিলাম। তোমার কি মনে হয় রিহানও ওর প্রতি আকর্ষিত হতে পারে?

—কেন পারে না? অসম্ভবের কি আছে?

বুরহান জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার নিজেরও কি ওকে ভাল লেগেছে দোস্ত্?

—হ্যাঁ।

—তোমারও?

—হ্যাঁ। তবে আসমানতারার দেহটা নয়, তার গানটাও নয়। ওর মধ্যে যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, শোনা যায়, তার কিছুই নয়। এ সমস্ত ছাড়িয়ে ওর মধ্যে একটা যেন কী আছে, সেই আকর্ষণে, সেই রূপের মোহে পড়েছি আমি।

বুরহান বলল ঃ তোমার কথা আলাদা। বাস্তবের মূল্যই বা কি তোমার কাছে। যা দেখ তার অর্দ্ধেকটা স্বকীযতায় তোমার কাছে সত্য, বাকিটা তো তোমাব। কিন্তু আমাদের তো তা নয়। তাই মনে হয় রিহান যদি সত্যি আসমানের আকর্ষণে পড়ে থাকে, তবে সেটা কি?

ভূষণ বলল ঃ আকর্ষণ যে কিসে করে কেউ জানে না। যে নিজে আকর্ষণ বোধ করে সেও জানে না। আকর্ষণ যে করে সে এক অদৃশ্য রহস্য। চমন আজ মনে করছে আসমানের দেহটা ওর কাম্য। কাল পাক্, দেখবে তার ভুল ভাঙবে। দেখবে তৃপ্তি নেই। আকর্ষণ যা কবছে তা দেহ নয, দেহাতীত একটা জিনিষ। যা প্রতিটি জিনিষের মধ্যে আছে, আবার প্রতিটি জিনিষের মধ্যেই নেই। এ সমস্ত কিছুরই অতীত সে। যে জিনিষ আসমানের মধ্যে দেখে চমন আজ মুগ্ধ, তা প্রকৃত পক্ষে চমনের নিজের মধ্যেও আছে। চমন কি নিজেই জানে কস্তুরীমৃগের নাভির মত নিজেরই মধ্যে অবস্থিত কোন গন্ধ তাকে পাগল করে দিয়েছে কিনা?

বুরহান বলল ঃ ওযে বড় কথা হলো দোস্ত্। ও তোমাদের মত ভাববিলাসী লোকেদের জন্য। আমাদের জন্য নয়।

ভূষণ বলল ঃ তবে আর কি করব বল? আমি ঐ দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। ঐ দূরে দু'একটি তারা ফুটেছে। তোমরা নীচে আসমানতারার কথা ভাব, আমি দূরের আসমানতারার দিকে তাকিয়ে থাকি। আজ আমার বড় ভাল লাগছে।

একটা পাগল নাকি ভূষণ! কেমন কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে বুরহান তাকালো তার দিকে ঃ কি গো, কি হলো তোমার?

ভূষণ বলল ঃ আচ্ছা দোস্ত্ ঐ দূরে তারাটিকে ফুটে উঠতে দেখছ?

—হ্যাঁ, দেখছি।

—ঐ তারার চোখ দিয়ে কখনো জল পড়তে পারে?

—পারে না।

ভূষণ হেসে তাকাল বুরহানের দিকে ঃ যেমন পারেনা মাটীর এই আসমানতারার চোখ দিয়ে, কেমন? কিন্তু শোন দোস্ত্ আকাশেও স্বাতী নক্ষত্র থাকে। তার চোখ দিয়ে নাকি জল পড়ে। সেই জল যেমনি উন্মুক্ত-হৃদয় ঝিনুকের বুকে পড়ে অমনি তা মুক্তা হয়ে যায়। তারার চোখের দুই বিন্দু জল আজ আমার বুকের মধ্যে পড়েছে, মুক্তো সৃষ্টি হবে না কি?

—তুমি পাগল হয়েছ নাকি ভূষণ?

ভূষণ বলল ঃ কি জানি। কিন্তু তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না তো ?

—কি উত্তর দেব বল। তোমার কথার উত্তর দিতে পারলে আমি পদ রচনা করতে পারতুম।

ভূষণ বলল ঃ আচ্ছা দোস্ত্, সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে তুমি সব চেয়ে বড় বলে মনে কর ?

বুরহান বলল ঃ হ্যাঁ, খোদাতালার সৃষ্টিতে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব আর নেই।

—তাহলে মানুষ নিশ্চয়ই ঝিনুকের চেয়ে বড ?

—নিশ্চয়ই।

ভূষণ চিৎকার করে উঠল ঃ পেয়েছি, পেয়েছি।

—কি পেয়েছ ?

—আমার প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেই পেয়েছি।

—কি ?

—ঝিনুকের বুকে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়লে যদি মুক্তা হয়, মানুষের বুকে চোখের জল সৃষ্টি করবে মুক্তি। বুরহান আমার বড ভাল লাগছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, মুক্তি, চতুর্দিকে মুক্তি। মুক্তি আমাকে ডাকছে।

হঠাৎ ভূষণ উঠে দাঁডালো তারপর তীরবেগে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করল।

বুরহান অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিযে থাকল ঃ আচ্ছা একটি পাগল তো !

অগ্রসরমান অন্ধকারের মধ্যে ভূষণ হারিয়ে গেল।

বুরহান একটা অবাক কৌতুকে আকাশের দিকে তাকল। ধীরে ধীরে নক্ষত্রেরা ফুটে উঠছে। এই নক্ষত্রের মধ্যে ভূষণ হঠাৎ কি পেল যে তার মনের মধ্যে মুক্তির কল্পনা ফুটে উঠল ? সে আশ্চর্য্য হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। কবির দৃষ্টি যে জগতে প্রবেশ করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সেখানে যেতে পারে না। ঐ নক্ষত্রের মধ্যে বুরহান এতটুকু ক্রন্দনের আবেগ দেখতে পেল না। অশ্রুর সম্ভাবনা যে কি করে সম্ভব তার ধারণার মধ্যে তা এলো না। বাধ্য হয়ে সে আবার দৃষ্টি নামাল মাটীর দিকে।

কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। কে ? বুরহান একটু আশ্চর্য্য হল। চেনা চেনা যেন মনে হচ্ছে ? আরে এযে চমনলাল ! বুরহান যেন অস্বাভাবিক ভাবে আশ্চর্য্য হল। চমনলাল আরো এগিয়ে এল। বুরহান আর বসে থাকতে পারল না ? তাড়াতাড়ি সিঁড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল তার কাছেঃ চমন ভাই !

চমনের পা টলছিল। যেন হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছিল সে। বুরহান বুঝতে পারল যে সে নেশা করছে। কি ব্যাপার ? আজ অসময়ে সে নেশা করে দক্ষল দরওয়াজার দিকে আসছে ! আসমানতারা কোথায় ? সে চমনের হাত ধরল ঃ এস, এস, এখানে বসি। কি হল তোমার ?

চমনলাল এক দৃষ্টিতে বুরহানের দিকে তাকিয়ে থাকল। কি যেন দেখবার চেষ্টা করল তার মুখের মধ্যে।

বুরহানের মধ্যেও তখন একটা আবেগ। অনেক দিন পরে পুরানো বন্ধুকে যথাস্থানে

পেয়ে এই আবেগ। মুহূর্তে যেন তার মনেই থাকল না যে চমনলাল অপ্রকৃতিস্থ! সে তাকে সিঁড়ির উপর বসালো। বসিয়ে জিজ্ঞেস করল—

—এতদিনে আমাদের মনে পড়ল ভাই?

চমন বুরহানকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল: আমি বড় পাপী বুরহান, বড় পাপী। বড় স্বার্থপর...আমাকে ক্ষমা করো।

তার দুইচোখে দরবিগলিত ধারাতে অশ্রু ঝরতে লাগল।

বুরহান বুঝতে পারল না কেন সে কাঁদছে? সে অবাক হয়ে শুধু তার চোখে অশ্রুপ্রবাহ লক্ষ্য করতে লাগল।

পনের

"জগা রে, জাগ রে চিত্ত জাগ রে—
জোয়ার এসেছে অশ্রুসাগরে।"
—রবীন্দ্রনাথ।

কি এক মুক্তির আনন্দ যে ভূষণ দক্ষল দরওয়াজা থেকে নিয়ে এল সেই জানে। ঘরে ফিরেই সে কাগজ কলম নিয়ে বসল। তৎক্ষণাৎ লিখতে লাগল। চতুষ্পার্শে সব যেন তার হারিয়ে গেছে। এমন কি তার নিজের গৃহের অস্তিত্বও আর তার মধ্যে নেই। মনে হ'ল অশ্রুর প্রবাহে সব ভেসে গেছে। অশ্রুর প্রবাহে সমস্ত বিশ্ব সংসার যেন তার অহংবোধকে হারিয়ে ফেলেছে। সেই অশ্রুবিধৌত স্নিগ্ধতার মধ্যে পরম চৈতন্য স্বরূপ এক মুক্তা সমস্ত বিশ্ব সংসারের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সেই মুক্তাই মুক্তি।

সে লিখল:

গগন স্বাতীকি বিন্দুয়া চূয়ত
ঝিনুক হিয়া ভেল মুক্তা।
দিন দিন করি স্বপন স্বপন
উঠল উজলি মুক্তা॥
মরত স্বাতীকি অশ্রু বিগলিত
পাওয়ল কবি হিয়া যুক্তি।
ভূষণ খাঁ ভনে রাখলু গোপনে
ফুটব মনে মন-মুক্তি।

কবিতাটি লেখবার পর তার ভাল লাগল। মনের মধ্যে যখন বিশেষ ভাবের একটি প্রেরণা জাগে তখন তাকে রূপ দিতে না পারলে যেন ভাল লাগে না। আত্মা থেকে নিঃসৃত এক একটি আত্মজা যেন এরা। এদের বাইরে প্রকাশ যেন বিরাট এক বেদনা

থেকে মুক্তি দেয়। মন তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্বাদে ভরে ওঠে। নিজেকে হাল্কা মনে হয়, ভাল লাগে। পরম স্নেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ভূষণ বারকয়েক পদগুলি পড়ল। আর তার মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তবৃন্দাবনের সেই মধুর স্মৃতি জেগে উঠতে লাগল। আসমানকে চিনেছে কজন? রাতের আসমানের বুকে গৌড়ের মানুষ অসংখ্য নক্ষত্রের দ্যুতি দেখেছে কিন্তু দিনের আকাশকে দিগন্তবাণী নীল বেদনায় খিলান তৈরী করতে দেখেছে কি তারা? কিন্তু ভূষণ দেখেছে। নক্ষত্রের দীপ্তি পাগল করেছে পতঙ্গকে, কিন্তু নীল আকাশের স্নিগ্ধ বেদনা উন্মাদ করেছে ভূষণকে। একটি অপ্রাপ্তির-অপরটি প্রাপ্তির। একটি নিজে ধরতে চায়, অপবটি নিজে ধরা দিতে চায়, হারিয়ে ফেলতে চায়। ভূষণ মনে মনে ভাবল হায় আসমান কে তোমাকে দেখতে পেল!

প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে ভূষণ শয্যা গ্রহণ করল। কিন্তু তাব সহজে ঘুম আসতে চাইল না। অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে কত বিচিত্র কল্পনা অন্ধকারে আকাশের বুকে নক্ষত্রেব মত জ্বলে উঠতে লাগল। আর প্রত্যেকটি নক্ষত্রের বুকে আসমানেব আয়ত দুটি চক্ষুর প্রতিবিম্ব দেখতে পেল ভূষণ। এ কেমন পাওয়া? আকাঙ্ক্ষা নেই আর ভূষণের, শুধু কী এক ভাল লাগায় ভরে আছে অন্তরখানি। সেই ভাললাগার স্পর্শে অব্যক্ত এক চেতনা ধীরে ধীরে জড়াতে লাগল ভূষণকে। তারপর সে ঘুমালো কিম্বা জেগে থাকল বুঝতে পারল না। একটা নির্বিকার অব্যক্ত ভাবের জগতে সে কতক্ষণ থাকল বলতে পাববে না। কিন্তু আবার তার চোখের সামনে কতগুলি চঞ্চল স্পন্দন সে অনুভব কবল। ভূষণ দেখল, বিরাট এক মরুভূমি। পিঠে তাদের সঞ্চয় নিয়ে ক্লান্ত পথিকের দল সেই তপ্ত বালুকারাশি পার হবার চেষ্টা করছে। তাদের তাম্রাভ ললাটে ক্লেদাক্ত স্বেদবিন্দু। চোখের, দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। কতগুলি পাখী উড়ল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। পাখীগুলো ভয়ে চীৎকার করে কলরব করে উঠল। দূরে একটি বৃক্ষ। একটা অস্বাভাবিক রূপ বড় বাবুই বাসা তৈরী করছে। চোখে দুটো ভূষণের চেনাচেনা লাগল।

এই স্বপ্নটা বোধ হয় সে রাত্রিশেষের দিকে দেখছিল। হঠাৎ সে দুটো ময়ূরকে পাশাপাশি ডানা ঝট্‌পট্ করতে দেখলো। ওরা ঠোঁট দুটো ফাঁক করে বিরাট চিৎকার করে উঠল। কিন্তু চিৎকার শোনা গেল না।

ভূষণের ঘুম ভেঙে গেল। শুনল, একটি কাক ডাকছে।

তাহলে ভোর হয়ে গেছে! সে স্বপ্নটার কিছুই অর্থ বুঝতে পারল না।

অব্যক্ত রহস্যের এক মূক ইঙ্গিত তাকে যেন চমকিত করে রাখল।

সে দুর্গা দুর্গা বলে শয্যা ত্যাগ করল।

পূবের আকাশে রক্তচ্ছটা, নতুন দিনের সূর্য্য উঠবে। ভূষণ সেই আকাশের দিকে তাকালো। কাল অন্তরের মধ্যে প্রায়প্রত্যক্ষ যে মুক্তির স্বাদ সে লাভ করেছিল—আজ যেন তা সেই ভাবে আর প্রকট নেই।

দূরে এক 'আবাঙ্‌মানস গোচরম' জগৎ আছে, যেখানে যেতে হবে। কিন্তু তার জন্য যেন অনেক দূর হাঁটতে হবে। সেই পরম মুক্তি সূর্য্যের মত নিশ্চিতই রয়েছে। এখনো ফুটে ওঠেনি। একটা আলোর আভা দেখা যাচ্ছে মাত্র। ভূষণের মনে হল, মুক্তির যে শিহরণ তার মধ্যে এসেছে তা শুধু এই সূর্য্য ওঠবার আগে আকাশে আলোর আভাষ। যে চৈতন্য সূর্য্যরূপে মুক্তিচেতনার আকাশে উদিত হলে অন্ধকার সম্পূর্ণ রূপে বিতাড়িত হয়, সে সূর্য্য এখনো ওঠেনি।

আজ কি জানি কেন, ভূষণ আর কোন কিছুরই জন্য অপেক্ষা কবতে পারল না। তার মন ছুটে গেল পশ্চিমগড়ে আসমানের কাছে। কেন? তার সৌন্দর্য্যসুধা পান করার জন্য কি? তার সান্নিধ্যের আনন্দ গ্রহণ করার জন্য কি? আসমান তাকে কি দেবে? কি দেয়? এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পেল না ভূষণ। নদী সাগরের পথে কোন্ টানে চলে তা কি জানে নদী? আসমান সাগর কিনা একথা নিশ্চিন্ত রূপে বলা যায় না। কিন্তু মোহনাও তো হতে পারে, যার মধ্য দিযে নদীকে সাগরের পথে অগ্রসর হতে হয়? ভূষণ তাই একটা ব্যাখ্যাতীত রহস্যের ভাব নিয়ে পশ্চিম গড়ের দিকে এগিয়ে চলল। অনেকটা দূব বটে পশ্চিম গড, কিন্তু তবু কোন যানবাহনের সাহায্য নেবার কথা তার মনে এল না। মনে না আসার হযতো কারণ ছিল—যে কারণের কথা অদৃশ্য বিধাতাই শুধু জানতেন।

এই পৃথিবীর কোন জিনিষকে পেতে হলে মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। বাড়ী কেন, টাকার দরকার; দূরে যাও, গাড়ীর দরকার; ক্ষুধা মেটাও, আহারের দরকার। কিন্তু একটি মাত্র জগৎ আছে যেখানে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়—সেখানে কোন মাধ্যম নিযে যাওয়া যায় না, যেখানে আহার করবার জন্য হাতে ধরে কিছু মুখে তুলতে হয় না। যে শুধুই এমনি এক স্বতঃস্ফূর্ততার জগৎ। ভূষণ কি তবে সেই জগতের পথেই চলেছে?

হাঁটতে হাঁটতে কখন আবাব ভূষণ সেই বাড়িটির কাছে উপস্থিত হ'ল। সেই কুটীরটি। কিন্তু কুটীর হলেও তা কেমন উদ্ভাসিত। সেই কুটীরের কপাট ধরে পথে তাকিয়ে ছিল আসমান। পর্ণ কুটীরের ঝাঁপির কাছে রামচন্দ্রের প্রত্যাশায় দণ্ডকারণ্যে সীতার অপেক্ষা যেমন সেই পর্ণকুটীরকে প্রাসাদের চাইতেও মূল্যবান করে তুলতো, এই জীর্ণ কুটীরের কপাটে আসমানের উপস্থিতি তেমনই একেও যেন মহিমামণ্ডিত করে তুলেছিল। ভূষণ গিয়ে আঙিনায় উঠল। আসমান একটু হাসল (এ হাসি আপন রূপের ছটায় উদ্ভাদিত। এ নারীরও নয়, পুরুষেরও নয়।)

বলল ঃ

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ চন্দা—
জীবন যৌবন, সফল করি মানলুঁ—
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥"

এস, এস কবি! আমি যে তোমার অপেক্ষাই করছিলুম। আজ বড় প্রয়োজন তোমার।

ভূষণ বলল ঃ আমারও প্রয়োজন তোমায়। শোন, কাল তুমি আমাকে মুক্তির স্পর্শ দিয়েছ। সঙ্গে সঙ্গে সে আবৃত্তি করল রাতে লেখা পদ কয়টি ঃ

গগন স্বাতীকি বিন্দুয়া চুয়ত
ঝিনুক হিয়া ভেল মুক্তা।
দিন দিন করি স্বপন স্বপন
উঠল উজলি মুক্তা॥
মরত স্বাতীকি অশ্রু বিগলিত
পায়লুঁ কবি হিয়া যুক্তি।
ভূষণ খাঁ ভনে রাখহ গোপনে
ফুটব মনে মন-মুক্তি॥

আসমান ভূষণের দিকে তাকাল। দেখল, সত্যি সেই মুখে শুধুমাত্র অনুভব-গোচর এক জগতের প্রকাশ। অনেক দূর দেশ থেকে আলোর রশ্মি এসে পড়েছে ভূষণের মুখে—পৃথিবরীর অপর পার থেকে যেমন চাঁদের বুকে আলো এসে পড়ে। সেই আলোর স্পর্শে ভূষণ আজ আলোকিত।

আসমান ভূষণকে বলল ঃ বধু বল তোমার মর্ত্যের স্বাতী কে?

ভূষণ স্থির দৃষ্টিতে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ। কাল তোমার চোখে যে অশ্রু দেখেছি, তা আমার হৃদয়ে এসে গড়িয়ে পড়েছে। আমি ভেবেছি। ভেবেছি, স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝিনুকের বুকে পডলে নাকি মুক্তো হয়। মানুষ তো ঝিনুকের চেয়ে বড়। তার চোখের জল যদি কেউ বুকের মধ্যে ধরে রাখে তাহলে সেই কয়েক বিন্দু জল মুক্তি রূপে ফুটে উঠতে পারে না কি? কেমন যেন অনাস্বাদিতপূর্ব এক অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার কাল আমি অনুভব করেছি। আর আমার মনে হয়েছে ঐ বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্রই আমি পরম করুণাস্নিগ্ধ কয়েক বিন্দু দীন অশ্রুর মত জড়িয়ে আছি। শুধু 'আছি' এই আনন্দ। আমার মনে হল বুঝি এই মুক্তি।

আসমান ভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু। মনে মনে ভাবল, কোন্ শুভক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ভূষণ। আমিই কি জানতুম আমার মধ্যে একটি দরবিগলিত ধারা লুকিয়ে আছে? কবির শেখ কোন দিন একটু আন্দোলনের সৃষ্টি করে ছিল, কিন্তু তা যেন এমনতর হয়নি। তুষারের বন্ধন থেকে ঝর্ণাপ্রবাহের স্বপ্নকে সে মুক্তি দিতে পারেনি। জগতে সব প্রকাশের জন্যই নিমিত্তের প্রয়োজন আছে। গিরিরাজশৃঙ্গে শুভ্র তুষাররাশি ভালবেসে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার প্রেম রশ্মিপাতে কত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়। তবে পরে সে ঝর্ণার উচ্ছল প্রবাহে নদীর স্বপ্ন নিয়ে চলতে থাকে। ভূষণ সেই সূর্য্য। বিদেহী তার আলোর স্পর্শ প্রেম-আসমানের মোহের তুষার-বন্ধন

থেকে শুভ্র চেতনাকে মুক্তি দিয়েছে। সে ভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ভূষণ বলল ঃ কি দেখছ?

—তোমার আলোকে দেখেছি।

ভূষণ বলল ঃ জান, কাল রাতে আমি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছি?

—কি স্বপ্ন?

মরুভূমির উপর দিয়ে একদল ক্লান্ত পথিক যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তারা কতগুলি পাখী হয়ে গেল। অন্ধকার এল। দূরে একটি বৃক্ষে বিরাট এক বাবুই পাখীকে বাসা বুনতে দেখলুম। তার চোখ দুটি সুন্দর। ঠিক তোমার চোখের মতই আসমান! কিন্তু তারপরই দেখলুম দুটো ময়ুর। ডেকে উঠতে গেল, আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আসমান বলল ঃ তাই তো, এতো বড় বিচিত্র স্বপ্ন! আমিও স্বপ্ন দেখলুম কাল, জান?

—তুমিও? কি স্বপ্ন?

—দেখলুম এক তৃষ্ণার্ত তীর্থযাত্রী এসে আমায় বললেন, একটু জল দাও।

—তারপর?

—আর কিছু নয়।

—এ স্বপ্নের অর্থ কি?

আসমান বলল ঃ তা জানি না। আর জানতে চাইও না। আমার মন এখন শুধু বলছে ঃ তোর সমস্ত জীবনের সঞ্চয় দিয়ে তুই তীর্থযাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা কর। কিন্তু কি ব্যবস্থা আমি করতে পারি ভূষণ?

ভূষণ যেন আনন্দে চিৎকার করে উঠল ঃ পেয়েছি, পেয়েছি আসমানতারা। আমার স্বপ্নের ইঙ্গিতই তোমার স্বপ্নের অর্থকে পরিষ্কার করবে। মরুভূমির ক্লান্ত পথিক আর কেউ নয়, তীর্থ-যাত্রী। পাখীগুলোও তারাই। আশ্রয়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। বাবুই পাখী আর কেউ নয়—তুমি। তুমি তাদের জন্য বাসগৃহ তৈরী করে দিচ্ছ। আসমান, আসমান, তুমি ওদেব ধর্মশালা তৈরী করে দাও।

—কোথায় ভূষণ?

ভূষণ বলল ঃ সে কথাও ভগবান বলে দিয়েছেন। আমি ময়ূর স্বপ্ন দেখলুম কেন? ময়ূর যে বৃন্দাবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

—কোন্ বৃন্দাবন ভূষণ?

—দূরে তোমায় যেতে হবে না। ঘরের কাছে যে বৃন্দাবন আছে সেই গুপ্ত বৃন্দাবনেই তুমি তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা তৈরী কর।

আসমান বলল ঃ ভূষণ তুমি তবে আমাকে সাহায্য কর। এই দায়িত্ব গ্রহণ কর।

ভূষণ বলল ঃ দাও।

ষোল

"জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকাল বেলা উঠেই বুরহান ছুটল রিহানের কাছে। তার মনটা এক অহেতুক শঙ্কাতে ভরে আছে। রিহান তার চলতি প্রথার কাল ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। গৌড়ে সে উপস্থিত থাকাকালীন এমন দিন আজ পর্য্যন্ত যায়নি যাতে সে কখনও দক্ষল দরওয়াজাতে অনুপস্থিত থেকেছে। রিহানের মনে এমন কোন গোপন কথাও নেই যা সে বুরহান বা অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে এড়িয়ে চলবে। যদি তেমন কিছু ঘটনা ঘটে থাকতো—যা একটি অপরাহ্ন তাকে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে দূরে রেখেছে—সে ঘটনাও বুরহানের অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তার অদর্শন সত্যি বুরহানের মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। বাস্তব বন্ধুদের মধ্যে রিহান আর জালালকে সে বড় বেশী ভালবাসে। জালাল চপলতাহীন এক শুভবুদ্ধির আত্মপ্রকাশ। তার হৃদয়খানি বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে এতটা বেশী উন্নত জগতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল যে, তাকে আর হৃদয়ের লোক না বলে বিচারের লোক বলেই ধরে নেওয়া যেত। রিহান ততটা বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত নয়। তত দূরদৃষ্টিও তার নেই। সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির অভাব আর প্রতি পদে বিচার করে চলবার প্রচেষ্টার প্রতি তার আলস্য তার হৃদযের আবেগপ্রবণতাকে বড বেশী বাড়িয়ে দিয়েছিল। মনটা তার তত গভীর নয়। তাই তার আবেগের স্রোত সহজেই বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, প্লাবন আনে। কূলে যারা থাকে তাদের না ভেসে উপায় থাকে না। অগভীর হৃদয়, অগভীর নদীর মতই বন্যার বেগ এলে তাকে আর ধরে রাখতে পারে না। রিহান সেই অগভীর নদী। তাকে দেখলে ভয় করে না, কিন্তু ভাল লাগে। বুরহান ছুটে এল সেই রিহানের কাছে।

বুরহান রিহানের মিনা করা বাড়ীর কাছে এসে দেখল—এই সকাল বেলাতেই রিহান একা তার বৈঠকখানাতে বসে আছে। কিন্তু বড় গম্ভীর। কি একটা গভীর চিন্তায় যেন আত্মমগ্ন। বুরহান তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ল ঃ এই যে দোস্ত্ কি খবর?

হঠাৎ যেন চমকে উঠল রিহান। মুখ তুলে তাকাল ঃ ওহ্ তুমি! এস দোস্ত্ বোস।

বুরহান অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকাল। এমনটি পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। চিন্তা করবার লোক রিহান নয়। কিন্তু আজ যেন সে গভীর চিন্তামগ্ন।

—কি ভবছ তুমি দোস্ত্?

—এ্যাঁ! না কিছু না।

—না কি? তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে......

—রিহান বলল ঃ না ভাই, তেমন কিছু নয়। আমি ভাবছিলুম—

—কি ?

—ভাবছিলুম আভিজাত্য ছেড়ে ব্যবসায়ে নেমে ভুল করেছি কি না। অর্থের মর্য্যাদা বেশী না আভিজাত্যের মর্য্যাদা বেশী।

বুরহান বলল ঃ অভিজাত বংশের ছেলে তুমি, অভিজাত নয়তো কি ?

রিহান জিজ্ঞেস করল ঃ কিন্তু অভিজাত বংশের ছেলে হয়ে তাদের মত কাজ না করলে কি অভিজাত থাকা যায় ?

—কেন ? তুমিতো এমন কোন দুষ্কর্ম করনি যা তোমাকে আভিজাত্যের নীচে নামাবে।

—কিন্তু আমার ব্যবসায় ?

বুরহান বলল ঃ মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য যেকোন কর্ম গ্রহণ করতে পারে, তাতে তার মর্য্যাদা নষ্ট হবে কেন ? মর্য্যাদাটা কর্মের চেয়ে ব্যবহারের উপর বেশী।

রিহান বলল ঃ আমাদের ব্যবহারে তো আজ পর্য্যন্ত কোন নীচুতার স্পর্শ লাগেনি। কিন্তু গৌড়ের লোক কি আমাদের একজন মালিকের মর্য্যাদা দেয় ? যদি আমরা অস্ত্র ধরতুম, সৈনিক হতুম, তবে ?

বুরহান বলল ঃ সেটাতো ভয়ে দান করা মর্য্যাদা, তার প্রকৃত মূল্য আছে কি ? মানুষ তার হৃদয় থেকে স্বতস্ফূর্ত ভাবে অপর মানুষকে যে সম্মান কবে, যে মর্য্যাদা দেয, তাই সম্মান, তাই মর্য্যাদা।

রিহান বলল ঃ কিন্তু এগুলো শুধুমাত্র আদর্শের কথা। কার্য্যক্ষেত্রে এর কোন মূল্য নেই।

বুরহান অবাক হয়ে রিহানের দিকে তাকাল ঃ হঠাৎ তোমার মনে এ প্রশ্ন দেখা দিল কেন বলতো দোস্ত্ ?

রিহান বলল ঃ কাল এমন একটি ঘটনা দেখলুম কি না। শুধু মাত্র যুদ্ধটা পেশ হওয়ার জন্য এবং মালিক হওয়ার জন্য একজন তুর্কী মালিক মানুষের চোখে বেশী শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিয়ে গেল। আমরা অপাংক্তেয় রইলুম।

বুরহান রিহানের পিঠ চাপড়ে বলল ঃ এই জন্য তোমার দুঃখ ? বুঝেছি তুমি ভাবের আবেগে এখন উত্তেজিত হয়ে আছে। চল বন্ধু, এই সকালবেলা একটু দক্ষল দরওয়াজাতে বেড়িয়ে আসি, তোমার মন অনেকটা হাল্কা হবে।

—চল।

দুই বন্ধু সকালবেলাতেই দক্ষল দরওয়াজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

তখনো মাঠের বুকে শিশির শুকায় নি। একটা পরম স্নিগ্ধতা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

বুরহান সেই দিকে তাকিয়ে রিহানকে বলল ঃ দেখ বন্ধু, বাইরে একটু তাকাও।

রিহান বলল ঃ কি ?

—আচ্ছা নীচে তৃণগুচ্ছ দেখতে পাচ্ছ ?

—পাচ্ছি।

—ঊর্ধ্বে বৃক্ষশীর্ষ ?

—পাচ্ছি।

—এই সকালবেলা, কাকে ভাল লাগছে?

—সবাইকে।

—মনে হয় কি বৃক্ষ তৃণের চেয়ে অনেক বড়?

—না।

—প্রকৃতির জগতে কোন একটা অহংকারের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ?

—না।

—শুধুমাত্র মানুষের জগতেই এটা আছে। এটা মানুষের নিজের সৃষ্টি। এটা তার কৃত্রিমতা। দোস্ত্, সেই কৃত্রিম সম্মানের জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ!

রিহান একটু ম্লান হাসি হাসল। বলল ঃ না ভাই, আমার দুঃখ এখন চলে যাচ্ছে।

বুরহান তবু লক্ষ্য করে দেখল—রিহানের মুখে যেন একটা প্রবল চিন্তার ছাপ পড়েছে। সেটা যায়নি। কি বলে তাকে বোঝানো যায় একথা ভাবতে লাগল বুরহান। হঠাৎ এমন সময় দূরে তার নজরে পড়ল দক্ষল দরওয়াজায় আলাউদ্দিনকে। তরুণ ছেলেটি। বুরহানকে বেশ শ্রদ্ধা করে। সে এক রকম ছুটেই যেন বুরহানের কাছে এগিয়ে এল—

—শুন্ছেন? তার চোখে মুখে যেন একটা শঙ্কা।

—কি?

—মালিক তাজুদ্দিনকে কোন্ দুষ্মনেরা খুন করেছে কাল রাতে।

কথাটা শুনবামাত্র যেন চমকে উঠল রিহান।

মালিক তাজুদ্দিন খুব পরিচিত যে তা নয়। সুলতানের মালিকদের মধ্যে তার চেয়ে বহু নামকরা ব্যক্তি আছেন। তবু নামটা যেন শোনা শোনা লাগল বুরহানের কাছে। সে জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা বলতো ইনি কে?

—কুচবিহারের ফৌজদার।

বুরহান বলল ঃ ওহ্, হ্যাঁ, কিছু কিছু মনে পড়ছে! তা কি ভাবে খুন হলেন?

আলাউদ্দিন বলল ঃ শুনেছি পশ্চিম গড়ের সরাইখানার পাশে কে তার বুকে ছুরি বসিয়েছে।

বুরহান রিহানের দিকে তাকাল ঃ কি ব্যাপার বল তো?

রিহান মোটেই এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাল না। বলল ঃ গৌড়ে খুনখারাবি হামেশাই হচ্ছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

বুরহান বলল ঃ না, সেজন্য নয়। সুলতানের একজন মালিক তো, তাই।

রিহান বলল ঃ মালিকে মালিকে বিরোধ নেই? খুনখারাবি শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই হবে এমন কোন কথা নেই।

আলাউদ্দিন বলল ঃ সুলতানের চরেরা জব্বর তল্লাসী আরম্ভ করছে। সুলতান হুকুম দিয়েছেন দুষ্মনকে ধরতেই হবে।

রিহান বলল ঃ সেটা সুলতানের কর্তব্য। তিনি সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হলেও এমনি করে সন্ধান করতেন।

বুরহান বলল ঃ তা বোলোনা রিহান। সাধারণ মানুষ হলে কি আর তিনি নিজে এ বিষয়ে মাথা ঘামাতেন?

রিহান বুরহানের দিকে তাকাল : তা হলে সাধারণ মানুষ আর সুলতানের একজন মালিক সমান নয়?

বুরহান একটু ইতস্ততঃ করে বলল : তা একটু পার্থক্য থাকে বই কি।

রিহান বলল : এইতো কিছু আগে তুমি আভিজাত্য নিয়ে বড় বড় কথা বলছিলে। বুঝলে দোস্ত্ অভিজাতদের একটা বিশেষ স্থান আছে এ সমাজে। আমরা আর তারা সমান নই। যদি এটা আমাদের মধ্যে কারো হত? উঁচুতলার দৃষ্টি যখন নীচুতে পড়ে না তখন নীচুতলার দৃষ্টি উপরে অযাচিত ফেলে লাভ কি? তাজুদ্দিনের কথা বাদ দাও। ওদের ভাবনা নিয়ে ওরাই মাথা ঘামাবে আমাদের ভাবনা আমরা ভাবি।

রিহানের ভাবখানা যেন একটু অন্যরকম। হঠাৎ এমন বিতৃষ্ণা নিয়ে অপরের প্রতি তাকাতে তাকে কখনো দেখেনি বুরহান। অগভীর হৃদয়ে ভালবাসা এবং ক্রোধ দুই-ই তাহলে প্লাবনের সৃষ্টি করে! উঁচুদের প্রতি একটা ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে রিহানের মনে। এখন স্রোতের বেগ ছুটছে, দুকূল ছাপিয়ে উঠবে। তবে এটা থাকবে না বুরহান জানে।

আলাউদ্দিন মালিক তাজুদ্দিন সম্বন্ধে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল। ইঙ্গিতে তাকে থামতে বারণ করল বুরহান। আলাউদ্দিন আর সে বিষয়ে কোন কথা তুলল না।

গৌড় নগরী তখন কর্মমুখর হয়ে উঠছে। বাইরে থেকে অগণিত মানুষের স্রোত ঢুকছে নগরীর মধ্যে। গোরু এবং মোষের গাড়ীও। অধিকাংশেই খাদ্য আসছে। টাটকা শাক সব্জি বেশী। মহানগরী এই গৌড়ের জনসাধারণের জন্য দৈনন্দিন কম খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। চতুষ্পার্শের জনসাধারণ তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দ্বারা গৌড়ের সেই প্রয়োজন মেটায়।

কর্মমুখর শ্রমিকজনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই। সকাল বেলার তরুণ রৌদ্র পড়েছে তাদের উপর। সকল মানুষের মধ্যে তখন সজীব একটা উৎসাহ। প্রত্যেকে যেন চোখেমুখে একটা বিরাট প্রত্যাশার চিহ্ন নিয়ে স্বর্ণ-নগরী গৌড়ে প্রবেশ করছে।

বুরহানের ভাল লাগল এই শ্রমিক জনস্রোত দেখে, তাদের মুখের মধ্যে একটা বলিষ্ঠ জীবনের অভিব্যক্তি দেখে। সে বলল : দেখ, লোকগুলোকে কেমন সুখী মনে হচ্ছে। মাটীর কাছাকাছি মানুষগুলোই বোধ হয় সুখী।

রিহান বলল : তুমি জান কি ওরা সবাই মাটীর কাছাকাছি?

—কেন নয়?

—মাটীর কাছাকাছি যে লোকগুলো, তারা কি আর গৌড় নগরীর মুখ দেখতে পায়? তারা সেই মাটী আকড়েই রয়েছে। এরা মাটীর ফসলের কাছাকাছির মানুষ।

বুরহান তাকাল রিহানের দিকে : মানে?

রিহান বলল : মানে এরা অধিকাংশই দালাল বুঝলে। বিনাশ্রমে শুধুমাত্র দুটো টাকা খাটিয়ে এরা কৃষকের আয়ে ভাগ বসাচ্ছে। সুতরাং এদের মুখে হাসির ছটা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

বুরহান বলল : তুমি যেন সত্যি কেমন হয়ে যাচ্ছ রিহান। হঠাৎ মানুষের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা এসেছে।

রিহান বলল : সেটা অবহেলিত মানুষের জন্য। এতদিন আমার তাদের সম্পর্কে কোন

রকম কৌতূহল ছিল না। আমি কাল নিজে অবজ্ঞা পেয়ে বুঝতে পেরেছি অবহেলাটা কেমন জিনিষ। আমি রিহান, প্রচুর অর্থের মালিক, বণিক বলেই অবহেলাটা শুধু যে আমারই লাগবে তা তো নয়। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষই অবহেলা পেলে যন্ত্রণা অনুভব করে। বঞ্চিত হলে ক্ষুব্ধ হয়। জান বুরহান পৃথিবীতে এই যে বঞ্চনার খেলা; এ যদি শেষ না হয়, শান্তি আসবে না। আজ যে মালিক তাজুদ্দিন খুন হল, তাকি......" কথাটা শেষ করতে পারল না রিহান। হঠাৎ চমকে উঠল নিজেরই মধ্যে। যেন ধরা পড়ে গেছে এমনি একটি ভাব ফুটে উঠল। বুরহান অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো। কি ভাবল সে। বলল ঃ থাক। ওসব কথার প্রয়োজন নেই। জানো রিহান কাল বিকেলবেলা এক মজা হোল। তুমিতো ছিলে না—।

রিহান যেন আর একবার চমকে উঠতে গেল।

বুরহান বলল ঃ তুমিতো ছিলে না, আমি এখানে একা বসে। এমন সময় ভূষণ এলো। ভাবলুম তবু সঙ্গী পাওয়া গেল। কিন্তু ওযে পাগল, পাগলই। হঠাই এখানে আসমানের দিকে তাকাতেই কেমন যেন—

রিহান কেমন একটু চঞ্চল হয়ে বলল ঃ এখানে আসমান!

বুরহান তাকাল রিহানের দিকে ঃ 'মানে!' কিন্তু তক্ষুণি সে বুঝতে পারল "এখানে আসমান" বলতে সে কি বোঝাতে চেয়েছে। সে হো হো করে হেসে উঠল। 'না, না, সে আসমান নয় গো, এ উপরের আসমান।'

রিহানের হাসা উচিত ছিল, তবু সে হাসতে পারল না। শুধু বলল ঃ তার পর কি হল?

—আসমানের দিকে তাকিয়ে যে তার মনের মধ্যে কি ভাবের উদয় হল সেই জানে। হঠাৎ 'মুক্তি মুক্তি' বলে লাফিয়ে উঠল। তারপর কোথায় জনস্রোতের মধ্যে নেমে হারিয়ে গেল। আবার আমি একা হলুম। এই ভাবে একা অনেকক্ষণ বসে থাকলুম। ভাবছিলুম তুমি আসবে। অপেক্ষা করতে করতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখি টলতে টলতে চমনলাল আসছে। আমি চমকেই উঠলুম—অনেকদিন পর দক্ষল দরওয়াজাতে এলো কি না সে। ওকে কাছে ডেকে বললুম—এই যে চমন ভাই আবার দক্ষল দরওয়াজার কথা মনে পড়ল? ও কি করল জান? আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। বলল ঃ 'আমি বড় পাপী আমাকে ক্ষমা কর ভাই।' সত্যি আমার বড় মায়া হল। এবার বুঝি ওর জ্ঞান ফিরবে।

রিহানের মধ্যে যেন আবার একটা উত্তেজনা ফুটে উঠল। বলল ঃ ওটা একটা অপদার্থ। কাপুরুষ। কলঙ্ক। খোদার দুনিয়ায় ওর নাম করা উচিত নয়। ওরই খুন হওয়া উচিত ছিল।

একি! একি বলছে রিহান! বুরহান অবাক হল।

ইতিমধ্যে আলাউদ্দিন উঠে দাঁড়াল ঃ আচ্ছ জনাব আমি আসি। সালাম।

—এস। আদাব।

আলাউদ্দিন সরে যেতে যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বুরহান। একটু নিরালা প্রয়োজন তার। তার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ যেন দানা বেঁধে উঠেছে। চারিদিকে সে তাকিয়ে

দেখল। আশেপাশে কোন লোকজন নেই। সে ফিস্ ফিস্ করে রিহানকে বলল ঃ কি হয়েছে দোস্ত্?

শুধু কেমন একটা দৃষ্টিতে রিহান বুরহানের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টির মধ্যে ঘৃণা আছে কি না কিছুই বোঝা গেল না। সব কিছুই যেন তার মধ্যে মিশে আছে। সে কিছু বলতে পারল না।

বুরহান আস্তে আস্তে বলল ঃ বল, আমার কাছে লুকোবার কিছু নেই, বল।

রিহান ধীরে ধীরে বলল ঃ তাজুদ্দিনকে আমিই খুন করিয়েছি।

বুরহান নিজের হাতটা দিয়ে যেন রিহানের মুখখানা চেপে ধরল। থাক্ থাক্, —আর নয়, হাওয়ারও কান আছে। চল, ঘরে ফিরে চল।

ওরা ঘরে ফিরে চলল।

ওরা ফিরে যাবার কিছুকাল পরেই বিপর্য্যস্ত একটা পাখীর মত চমনলাল সেখানে এল। চারিদিকে তাকিয়ে যেন সে কি দেখতে লাগল। মনে হল সে যেন কারোর খোঁজ করছে। তন্নতন্ন করে চতুর্দিক সে দেখল। কর্মব্যস্ত মানুষেরা নগরে আসছে তো আসছেই। তাদের সে স্রোতের যেন বিরাম নেই। সেই মানুষের স্রোতের মধ্যে সে যেন কার মুখ খুঁজে বেড়াতে লাগল। তাকে দেখে মনে হল, সে যেন হতাশ হচ্ছে। আকাঙ্ক্ষিত মুখ সেখানে নেই। আর কোথাও তার দৃষ্টি নেই। পরিখার মধ্যে সদ্যজাগ্রত কমলকলি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। আম্রকুঞ্জের শ্যামল শীর্ষও নয়। বহু বর্ণের পাখীরা যে খেলা করছে তাও তার দৃষ্টিতে পড়ল না। সে যেন একটু হতাশ হল। নিজের অজ্ঞাতসারেই বহুপূর্বের অভ্যাস বশতঃ সে দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়িতে গিয়ে বসল। কিন্তু সেই পরিচিত পাষাণ স্পর্শও তাকে বিন্দুমাত্র স্বস্তি দিতে পারল বলে মনে হল না।

এমন সময় একটি এক্কা গাড়ী গৌড়ের ভেতর থেকে বাইরে যাচ্ছিল। চমনলালের দৃষ্টি সেই গাড়ীর উপর পড়ল। দেখে যেন সে একটু চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি থেকে নেমে সে সেই গাড়ীর কাছে এগিয়ে গেল।

এক্কা গাড়ীতে চলছিল ভূষণ। একটা খুশীর আবেগে সে ঝল্‌মল্ করছিল যেন। নিজের মনের মধ্যেই শিস্ দিয়ে গুন্‌গুন্ করছিল সে ঃ

"যব ডাকত কাহ্নু বৃন্দাবন
হম কৈছে রহব গেহে।"

যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল চমনলাল গাড়ীর উপর ঃ ভূষণ!

চমকে ফিরে তাকাল ভূষণ চমনলালের দিকে ঃ এই যে তুমি! পদ চাই বুঝি?

—না, না, তুমি রিহানকে দেখেছ?

ভূষণ বলল ঃ রিহান! কেন? ঘরে যাও, সেখানে পাবে।

চমনলাল বলল ঃ না, ঘরে নেই সে, তাইতো দক্ষল দরওয়াজাতে এসেছি।

—"তাহলে অপেক্ষা কর, পাবে।"

অপেক্ষা করলে সব কিছুই পাওয়া যায়। জীবাত্মার জন্য এমনি আকুল প্রতীক্ষা করে আছেন পরমাত্মা, শ্রীরাধিকা আছেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য। সেই প্রেমের ডাক ভূষণ শুনতে পেয়েছে। পাবে, সবাই পাবে। সে বলল ঃ বোস তুমি পাবে, পাবে।

চমনলাল সাগ্রহে তাকাল তার দিকেঃ ওরা আসবে এখানে?

—নিশ্চয়ই আসবে।

—তুমি দেখেছ ওদের?

—দেখিনি, দেখতে পাব নিশ্চয়ই।

—সে কিগো!

ভূষণ বলল: দেখতেই তো যাচ্ছি।

চমনলাল উদগ্রীব হয়ে উঠল: তুমি যাচ্ছ? চল, আমিও যাব, রিহানকে আমার বড় প্রয়োজন।

হঠাৎ যেন চমক ভাঙল ভূষণ খাঁর। বলল: রিহান কোথায়? আমিতো যাচ্ছি গুপ্ত বৃন্দাবন। তুমি যাবে?

হতাশায় যেন একেবারে ভেঙে পড়ল চমনলাল: তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? কি বললুম, কি শুনলে?

পাগল কথাটা যেন ভূষণের মনে প্রবল ভাবে আলোড়নের সৃষ্টি করল। কি একটা ব্যাখ্যাতীত রহস্যের মধ্যে রয়েছে সে। পৃথিবীতে তার দৃষ্টিটাই যেন অন্যরকম। কেমন যেন সবই তার ভাল লাগছে। তার যেন মনে হল, এই ভাললাগার পাগলামিতে ভরে উঠতে না পারলে সার্থকতা নেই। পাগল না হলে কিছুই পাওয়া যায় না। সে বলল: চমন আমি যেন পাগল হতে পারি। আমি যে পাগল হবার জন্য চেষ্টা করছি। পাগল হবে তো এসো। পাগল হলে অনেক কিছুই পাওয়া যাবে।

চমনলালের ভাল লাগল না। সে নিজে উদ্ভ্রান্তচিত্ত। সে নিজে বিভ্রান্ত। এ সব তার ভাল লাগে না। সে মুখ ফিরিযে নেয়। আবার নিজে গিয়ে সেই সিঁড়িটার উপরে বসে। ভূষণের গাডী এগিয়ে চলে। কিসের যেন ঘোর লেগেছে তার। চোখে কাল থেকে তার সবই ভাল লাগছে। অশ্রুর সিক্ততার মধ্যে বিরাট একটি মাধুর্য্য আছে, সেই মাধুর্য্য তাকে আকর্ষণ করছে।

গড়ের বাইরে আসতেই এক্কা গাডীটা দ্রুত ছুটল। গতির দ্রুত ছন্দের সঙ্গে কল্পনার একটা সৌহাদ্য আছে। গাড়ী যতই ছুটতে লাগল ততই ভূষণ খাঁর সেই অশ্রুর আবেগ মাখানো কল্পনাটা প্রবল হতে লাগল। চোখ বুজে গুপ্তবৃন্দাবনের সেই যুগল মুর্ত্তির কথা কল্পনা করতে লাগল। তার যেন মনে হল, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধ সবাই চলেছে সেই পরম লক্ষ্যের দিকে। এ চলার মধ্যে ক্ষান্তি নেই।

ক্ষান্তি নেই!

তাহলে আসমানতারা কার জন্য ধর্মশালা তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছে? তার সে স্বপ্নেরই বা অর্থ কি? তাহলে সবটাই কি মিথ্যা? ভূষণ আবার ভাববার চেষ্টা করল। নিজের বুকের মধ্যে সে উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করল। কিন্তু তবু যেন তার বার বার মনে হতে লাগল, না না ক্ষান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। এযে পরম স্নিগ্ধদ্যুতিতে উদ্ভাসিত।

ভুল! আসমানতারার ভুল। ভূষণেরও ভুল। ক্লান্ত পথিক কেউ নেই। এই পথ চলার মধ্যেও বিরাট এক আনন্দ। সেই আনন্দের পলকে ভাসতে ভাসতে সবাই চলেছে।

ভূষণ তখন উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেল। তার মুদ্রিত দুটি চোখের মধ্যে একটি জ্যোতির্ময় যুগলমূর্তি ভাসতে লাগল। ভূষণ মনে মনে বলতে লাগল ঃ ওগো পুরুষ তোমার প্রেম বিচিত্র! ওগো প্রকৃতি তোমার প্রেম বিচিত্র! এতদিন আমায় কেন এই করুণা থেকে বঞ্চিত রেখেছিলে?

গাড়ী চলতে লাগল।

গুপ্তবৃন্দাবনের পথের দু'পাশের শ্যামল তরুশ্রেণী, ফলফুল, পাখী কিছুই আজ তার চোখে পড়ল না। এক অপূর্ব রহস্যময় জগতের মধ্য দিয়ে ভূষণ চলতে লাগল যে জগতের অস্তিত্ব শুধু মনের মধ্যেই আছে আর কোথাও নেই।

এই ভাবে চলতে চলতে গাড়ী এসে থামল গুপ্তবৃন্দাবনের কাছে। গাড়োয়ান হঠাৎ গাড়ী থামাল। হঠাৎ গতি থেমে যাওয়াতে চমকে উঠল ভূষণ। সে চোখ খুলে তাকাল। দেখল গুপ্তবৃন্দাবনের প্রস্তরখোদিত প্রবেশপথ। সে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে মাটীতে লুটিয়ে প্রণাম করল—তারপর সেই প্রস্তরখোদিত প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে আঙিনাতে প্রবেশ করল। ভূষণ দেখল, মন্দিরের বারান্দায় নিমিলিত নয়নে বৈষ্ণবাচার্য্য পরমানন্দদেব বসে আছেন। তার দুই চোখে শেফালী ফুলের পাপড়িতে কয়েক বিন্দু শিশিরের মত অশ্রু টলমল করছে। মাঝে মাঝে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কেঁদে উঠছেন বাবাজী। তা দেখে হৃদয়ের এক গোপন উৎসে অশ্রুসাগরে ভূষণেরও যেন দোলা লাগল। সে মন্দিরের সিঁড়িতে সর্বাঙ্গ লুটিয়ে দিয়ে আবার প্রণাম করল। সেই প্রণামের মধ্যে যে ভক্তির অদৃশ্য স্পর্শ রয়েছে তা যেন বাবাজীকে স্পর্শ করল। তিনি হঠাৎ চোখদুটো মেলে চাইলেন ঃ কে?

—আমি প্রভু, আমি। আমি জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।

বাবাজী হাসলেন ঃ এস, তুমি যে সেই পরম প্রেমময়ের অঙ্গভূষণ, এস।

ভূষণ বলল ঃ প্রভু, আমি এসেছি।

বাবাজী বললেন ঃ আমি জানি তুমি আসবে। তুমি যে নদী, সাগরের পথে না এসে উপায় কি। প্রেমের সাগর যে এই গুপ্তবৃন্দাবনে স্থির হয়ে আছে।

ভূষণ বলল ঃ প্রভু আমার অহংকার ক্ষমা করুন।

—কিসের অহংকার তোমার।

—কিছু করবার অহংকার নিয়ে আমি এখানে এসেছিলুম। পথে আসতে আসতে গোপীবল্লভ আমার সে অহংকার ভেঙ্গে দিয়েছেন।

—কি করবার অহংকার ভূষণ?

—কাল স্বপ্ন দেখেছি আমরা দুজন। আমি দেখেছি মরুভূমিতে ক্লান্ত পথিকেরা চলেছে। আসমান দেখেছে, এক তৃষ্ণার্ত পথিক জল চাইছে। আমি প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলুম—তীর্থ যাত্রীদের জন্য ধর্মশালা তৈরী করে দিতে হবে।

সেই জন্যই আসছিলুম। আসমান তার সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে সেই ধর্মশালা তৈরী করবে এই গুপ্তবৃন্দাবনে। কিন্তু আজ পথে আসতে বার বার মনে হল, কার জন্য করুণা প্রকাশ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কে ক্লান্ত? সবাই যে এক পরমানন্দের দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে। আমার

ভুল ভেঙ্গে গেল। ধর্মশালার কথা আমার আর মনে নেই। কিন্তু মনের মধ্যে আমাদের যে অহংকারটুকু জন্মেছিল তা অপরাধ। সেই অপরাধ ক্ষমা করুন প্রভু।

বাবাজী একটু হাসলেন। বললেনঃ তোমাদের স্বপ্ন সত্যি।

আশ্চর্য্য হয়ে ভূষণ তাকাল বাবাজীর দিকেঃ সত্যি!

—হ্যাঁ। বহু তীর্থযাত্রী এখানে আসে। স্থানাভাবে বড় কষ্ট পায়। সেই গোপীবল্লভই তোমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কাজ করবার তুমি কে? আমি কে? তাঁর কাজ তিনিই করবেন। আমি তুমি নিমিত্ত মাত্র। এতে অহংবোধের কোন স্থান নেই। শ্রীকৃষ্ণের নামে যে কাজই কর তাতে অহং-এর স্থান কোথায়?

ভূষণ বলল ঃ তা হলে আমাদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে কোন ঔদ্ধত্য নেই?

—নিশ্চয়ই নেই।

ভূষণ বললঃ কিন্তু গুরুদেব, তবে পথে আসতে আসতে আমার মনে ঐ ধারণা এল কেন?

বাবাজী হেসে বললেনঃ তোমার ধারণাও মিথ্যা নয়। সবাই সেই পরম আনন্দের টানেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু পথের ভুলে অনেকে গিযে মরুভূমিতে পড়ে পথ হারায়, মরীচিকা লক্ষ্য করে ছুটে যায় সেই আনন্দসায়রের বাবি পান করতে। তারাই তো ক্লান্ত পথিক। সাগর থেকে যে সেই আনন্দের আহ্বান এসেছে, মানুষ বোঝে না। তাই কেউ অর্থকে সেই আনন্দের লক্ষ্য বলে ভাবে, কেউ সম্মানকে, কেউ নারীকে। হায় তাদের অন্তরালে যে সেই পরম চিদ্‌ঘন আনন্দ-সত্তা লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের ডাকছেন, ওরা তা জানে না। ওরা বিভ্রান্ত পথিক। নইলে সবাই সেই আনন্দের আহ্বানে ছুটে চলেছে।

ভূষণ বলল ঃ মানুষের এই ভ্রান্তি থেকে মুক্তি নেই কি?

—আছে।

—কিসে?

—যে দিন ওরা মিথ্যা আনন্দের লক্ষ্যকে বুঝতে পেরে অত্যন্ত ক্লান্তচিত্তে সেই পরম আনন্দকে স্মরণ করে কেঁদে উঠবে সেই দিনই মুক্তি।

ভূষণ বললঃ প্রভু, আমি আমার বুকের মধ্যে এক রহস্যময় আনন্দের সন্ধান মাঝে মাঝে পাই। কিন্তু তাকে ধরতে পারি না। আমি কবে সেই পরম আনন্দের সন্ধান পাব?

বাবাজী বললেনঃ আনন্দের অনুভব প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই আছে ভূষণ, কারো স্বচ্ছ, কারো অস্বচ্ছ। গোপীনন্দন তোমাকে করুণা করেছেন তাই তুমি আনন্দের স্নিগ্ধ স্বাদটি গ্রহণ করতে পেরেছ। কিন্তু সেই আনন্দসাগরে যেতে হলে যে অনেক পথ হাঁটতে হয়। নদী সাগরকে পায় বহু পথ অতিক্রম করে। গৃহচূড়ে উঠতে গেলে সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয়। তাকে পেতে হলেও যে একটু চলতে হবে।

—কোন্ তীর্থ, কোন্ দেশ ঘুরতে হবে প্রভু?

—কোন তীর্থ, কোন দেশ নয় ভূষণ। সব তীর্থ, সব দেশ কর্মের মধ্যেই রয়েছে, নিষ্কাম কর্মের মধ্যে। কাজ করে যাও, তাকে তুমি পাবে।

—কি কাজ প্রভু?

—যে কাজ তুমি গ্রহণ করেছ সেই কাজ। মানুষের সেবার কাজ। জানবে সমস্ত জীবের মধ্যে সেই পরম করুণাঘন মহান্ পুরুষই বিরাজমান। আমরা সবাই তাঁর দাসানুদাস। যদি সেই দাসের প্রবৃত্তি নিয়ে বিশ্বসংসারে সকল জীবের সেবা করতে পার, যদি চিনতে পার যিনি জীব তিনিই শিব, তবে সেইদিন তাঁর অনির্বাণ প্রেমের জ্যোতি চোখে ভাসবে। তখন মনে হবে, এই বিশ্বসংসার আর কিছুই নয়, সেই এক বিরাট আলোর ঢেউয়ে চঞ্চল। আমি তুমি সেই অনন্ত ঢেউয়ের অংশ মাত্র।

ভূষণ বলল ঃ প্রভু, আসমানের কি হবে?

বাবাজী বললেন ঃ কেন, তার মুক্তি! আমি তার চোখের মধ্যে যে প্রেমের দিব্য পুলক দেখতে পেয়েছি, তার অশ্রুর মধ্যে যে চন্দনের স্নিগ্ধ স্পর্শ দেখেছি! অনেক দূর পার হয়ে নদী যে মোহনার কাছে এসেছে! তার হৃদয়ের মধ্যে এক দুর্দান্ত প্রেমাবেগ লুকিয়ে ছিল। তোমার মধ্য দিযে তা মুক্তির সন্ধান পেয়েছে। পথটা যদি কর্দমাক্ত হয়, নদীর জল ঘোলা হয়। যদি স্বচ্ছ হয় তবে যমুনার জল নীল। নরনারীর প্রেমের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নিজের পরম সত্তাকে আবৃত রেখে সবাই কর্দমাক্ত হয়ে আছে। তাই চিরন্তন প্রেমপ্রবাহ যখন সেই পথের মধ্য দিয়ে সাগরে যেতে চায় নিজেকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। কর্দমে জড়ায়, মাটীর গন্ধে ভোলে। নদী মনে করে, পেয়েছি পেয়েছি। এই কর্দম আর এই মাটী দেহ। মন মোহনা। মন সমুদ্র। তোমার মত একটা আবেগে কেউ মনকে দিব্য আনন্দের সন্ধান দিতে পারে। সেই মনের প্রেমে পড়ে তাকে জানবার জন্য যারা তাকায় তারা যে আর কূলকিনারা খুঁজে পায় না। তখন অসীম বিস্ময়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে—দূরে সাগরের আনন্দকল্লোল শোনে সে। তোমার মধ্য দিয়ে আসমান সেই সাগরের ধ্বনি শুনতে পেয়েছে। সেও মুক্তি পাবে।

আমি ওকে দেখেই চিনেছি ভূষণ। জন্ম জন্মান্তরে ও ভক্তির প্লাবনে ভেসে আসছে—, সাগর আর ওর কাছ থেকে বেশী দূরে নয়।

ভূষণ বলল ঃ কিন্তু প্রভু তাহলে ওর এই ভাগ্যবিপর্য্যয় কেন? নটী হল কেন?

বাবাজী বললেন ঃ প্রভুর মাহাত্ম্য কে বোঝে। তিনি যে বড় খেলতে ভালবাসেন। বহু ছলনার মধ্য দিয়ে জীবকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যান। ঝুমঝুমি আর খেল্না দিয়ে মা শিশুকে ভোলান। কিন্তু যে শিশুর শুধুমাত্র মায়ের কল্পনা ছাড়া আর কিছু নেই—সে ভোলে না। সে মা মা বলে চিৎকার করে। আবার কেউ কেউ বা ভোলে। কিন্তু ভুলুক আর না ভুলুক, মা কিন্তু কাউকে ভোলেন না, সদাজাগ্রত দৃষ্টি তাঁর সন্তানের উপর। যাকে আমরা নিয়তির ছলনা বলে মনে করছি তা যে প্রভুর এমনি একটি খেলা মাত্র। অদৃশ্যে তার দুটো আঁখি যে প্রেমে ছলছল করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আসমান চতুর শিশু, সে খেলনাতে ভোলেনি। নর্তকী করে তাকে শেষ পরীক্ষা করলেন সেই প্রেমিক পুরুষ। ধর ও যদি গৃহিণী হত, স্নেহ প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়তে পারত। স্নেহ বড় বিষম বস্তু। লোভের হাত এড়িয়ে হয়তো মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু স্নেহের হাত এড়িয়ে মুক্তি পাওয়া বড় কষ্ট।

ভূষণ বলল ঃ সেই পরমপুরুষের লীলা বোঝা ভার। বুঝি না বলেই কখনো তাঁর

উপর আমাদের ক্ষোভ হয়। কিন্তু আমি বুঝেছি সুখে দুঃখে তার উপর বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হওয়াতেই লাভ। আনন্দেও যেমন চোখের জল ঝরে, তেমনি ঝরে ব্যথাতেও। তবে আর দুঃখ থাকে না।

বাবাজী বললেনঃ হ্যাঁ ভূষণ। আমরা বাস্তবে যাকে দুঃখ বলি তারই মধ্যে পরমানন্দ লুকিয়ে আছেন। দুঃখের বর্ষায় চোখের অশ্রু ঝরলে তার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবি তাই বলেছেনঃ "কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।"

ভূষণ শুনে শুনতে চোখ বুজল। মনে মনে বললঃ "হে পরম প্রেমময়, আমাকে তুমি দুঃখ দাও। আঘাতে আঘাতে আমার নয়নে অশ্রু ঝরুক, আমি অশ্রুর মধ্যে তোমার পরম স্নিগ্ধস্বাদের এতটুকু গ্রহণ করব।"

সতের

"বনের পাখি বলে, 'না',
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখি বলে 'হায়'!
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিক সন্ধ্যাবেলা দক্ষল দরওয়াজার উপর এসে বসল ভূষণ একা। বহুদিন একদল অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্পর্শসুখাভ্যস্ত সিঁড়ি আজ একা অপেক্ষা করছিল। সেই শূন্য সিঁড়িটা দেখে অন্য কোনদিন হলে হয়তো ভূষণের মনে পড়ত—একটি পাষাণ ধাপেরও হৃদয় আছে। যেন বিরহের হাহাকার ফুটে উঠছে তার বুকের মধ্যে। একা সে। নিজের মনের মধ্যেও সে এক বিরাট শূন্যতা অনুভব করত! কিন্তু হৃদয়ের শূন্যতা আজ তার অনাস্বাদিতপূর্ব এক অদ্ভুত রোমাঞ্চপরশে ভরে উঠেছে। সে হৃদয় আজ আপনিই আপনার মধ্যে পূর্ণ। হয়তো তার খেয়ালই হল না যে কোনদিন এই সিঁড়ির উপর তারা একদল বন্ধু এসে বসত—বা সে আজ একা রয়েছে। সেই বোধ আসবে কি—তার চতুষ্পার্শে যে অন্যান্য মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ সেই বোধই আর নেই ভূষণের। সব যেন দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেছে। সে শুধু তাকিয়ে আছে দক্ষল দরওয়াজার মধ্য দিয়ে যে পথটি বহু দূর থেকে গৌড়ে এসেছে সেই পথের দিকে। তার মনে একটা বিরাট প্রশ্ন জাগছেঃ এই পথ বাইরে থেকে গৌড়ে এসেছে না গৌড় থেকে বাইরে গেছে। বাইরে অসীম নিঃসীম আকাশ—উদার প্রকৃতি—মুক্তি। ভিতরে মাটির চার দেওয়ালের বন্ধনে বন্দীত্ব। একই পথের দুই সীমায় দুই রূপ। মানুষের ভাগ্যে এটা কিম্বা ওটা হয় তা হলে পথের জন্য নয়, মানুষের চলার ভুলে। জীবনের সর্বত্রই তাহলে মানুষের এক পথ, গতি ভিন্ন।

মানুষের রুচি আর আকাঙ্ক্ষার উপর তার গতি নির্ভর করে। যারা বসতে চায়, বিশ্রাম করতে চায়, তারা গৌড়ে আসে। অসীম যাদের টানে ত তারা বাইরে যায়। একই পথের মধ্যে তাহলে মুক্তি আর বন্ধন দুইই রয়েছে। সেই পরমেশ্বরের এইটেই খেলা। শিশুদের নিয়ে আমোদ করছেন তিনি। পথের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বলছেন—এবার যাও। যে চিনল না সে এসে খাঁচায় বন্দী হল, যে বুঝল সে চলল অসীমের দিকে। কিন্তু প্রভুর সজাগ দৃষ্টিতো সবার উপরই আছে? একদিন নিশ্চয়ই বন্দী আত্মাগুলোও মুক্তি পাবে?

গৌড়ের এই বহুদিনের পরিচিত পথটি আজ তার কাছে অপূর্ব রহস্যময় হয়ে উঠল যেন। ভূষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই পথটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

ঠিক এমন সময় বুরহান আর রিহান এল সেখানে। একটু অবশ্য দেরী করে, সন্ধ্যার ম্লান ছায়াতে। এই সন্ধ্যার মত ওরা দুজনেও যেন ম্লান।

এতক্ষণ ওরা নিজেদের ঘরে বসে যুক্তি করছিল।

বুরহান বলেছিল ঃ হঠাৎ তুমি এমন করলে কেন? তবে তুমিও কি আসমানের রূপে মুগ্ধ হলে?

রিহান বলেছিল ঃ না। তেমন কোন উন্মাদনাতেই আমি সেখানে যাইনি। ইচ্ছে ছিল আমরা সবাই যাব। চমনলালকেও নিয়ে যাব। কিন্তু হঠাৎ......।

বুরহান বলল ঃ দুনিয়াতে হঠাৎ থেকেই হঠকারিতা। এই পৃথিবীতে 'হঠাৎ' এক রহস্যময় জিনিষ। হঠাৎ কেউ সামান্য জিনিষ থেকে পরমার্থের সন্ধান লাভ করে, আবার হঠাৎই কেউ ঐশ্বর্য্যের সাদর সম্ভাষণ থেকে পথে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে। আমাদের জীবনেও এই 'হঠাৎ' একটা দৈব দুর্বিপাক হয়ে দেখা দিয়েছে দেখছি। নইলে হঠাৎ জালাল ত্রিন্দুতে যাবে কেন। আর ঠিক এই মুহূর্তেই হঠাৎ তুমি আর চমনলালই বা কেন গৌড়ে ফিরে আসবে। আর হঠাৎ ঐ আসমান বাঈয়ের কথাই বা আমার মনে পড়বে কেন। বহু তো বাঈজী দেখেছি জীবনে, চমনলাল তো গৌড়ের কোন নর্তকীর আসর বাদ রাখেনি। কোথাও আটকালো না, শেষে কিনা আসমানে? একেও 'হঠাৎ' ছাড়া আর কি বলব বলো? আর তাজুদ্দিন হঠাৎ কালই বা গৌড়ে এসে উপস্থিত হবেন কেন?

এই হঠাৎটা মানুষের জীবনে, এমন এক আকস্মিক বিপর্য্যযের সৃষ্টি করে যে আব ভেবে কূল পাওয়া যায় না।

রিহান বলেছিল ঃ আমি এখন কি করব বল?

বুরহান বলেছিল ঃ ভাবছি। কিন্তু বড় দুঃখ হচ্ছে। জালালের বিদায়ই আমাদের কাল হল। আমাদের তরুণ মনের যে একটি ঐক্যসৌধ গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে গেল। ঐক্যটা যেন একটা বিরাট জাদুকরের তৈরী বাড়ী। ইটগুলো তার এমনি করে সাজানো যে যতক্ষণ আছে তার মত শক্ত আর কোন গৃহ নেই। কিন্তু একটি ইট সরিয়ে নাও সমস্ত বাড়ীটা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। জালাল ছিল সেই ইট—সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ীখানা ভেঙ্গে পড়তে উদ্যত হয়েছে। বোধহয় তোমাকেও হারাতে হবে......।

একটা শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে রিহান তাকিয়েছিল বুরহানের দিকে।

বুরহান বলেছিল ঃ তুমি বরং গৌড় থেকে কয়দিন বাইরে থাক দোস্ত।

ভয় পেয়েছিল রিহান ঃ কোথায় ?

—আবার বাণিজ্যে যাও। গঙ্গার ঘাটে তো তোমার নৌকো বাঁধাই রয়েছে ?

রিহান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল ঃ দেখি, হায় চমনলালটা যদি এই সময় থাকতো !

বুরহান বলেছিল ঃ ওকে আর কোন দিনই পাওয়া যাবে না। যে মোহের আবর্তে ও পড়েছে তা থেকে আর কোনদিন ওর মুক্তি পাওয়া কষ্ট। ওর জীবনের এটা বর্ষা ঋতু। মনের আকাশ জুড়ে কারণে অকারণে মেঘের আনাগোনা চলবেই। ওর চেতনার সূর্য্য সহজে জাগবে না। কিন্তু তুমি চলে যাও। আসমান একটি অভিশাপও। তুমি যদি তাজুদ্দিনের বিপদ থেকে উদ্ধার পাও, ওর হাত থেকে হয় তো পাবে না।

রিহান বলেছিল ঃ সে ভয় আমার ছিল না বুরহান।

বুরহান বলেছিল ঃ কে জানে। আমরা আমাদের নিজেদের মনটাকে কি চিনি ? মনের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারেই কত আকাঙ্ক্ষা ঘুমিয়ে আছে। সমাজের শাসন, ধর্মশাসন তাদের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে— ঘুমো, ঘুমো। কিন্তু সব তারা ঘুমোয় না কখনো। লোভের একটু গন্ধ পেলেই আবার জেগে ওঠে। সুপ্ত কামনাগুলি এক এক খণ্ড লৌহ। বাইরে যদি হঠাৎ কখনো চুম্বক খণ্ডের মত এসে কিছু দাঁড়ায় তারা আকর্ষিত না হয়ে পারে ? আসমান সেই চুম্বক। আমার নিজেরই ভয় করছে, বুঝি আমিইবা কখন আবার তাকে দেখলে মোহে পড়ে যাব।

রিহনা মাথা নীচু করে ছিল। একটু নিজের মনের মধ্যে ভাববার চেষ্টা করেছিল। সত্যি কি আসমান তার মনের মধ্যে কোন কামনার বীজ বপন করেছে ? তাহলে আর এক দিন কি সে সেই অবচেতন কামনার আক্রমণেই আসমানের ওখানে ছুটে গিয়েছিল ? প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে—আসমানের দুটো চোখ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সারারাত সে সেই দুটো চোখের মুগ্ধ চাহনির কথা মনে করে ঘুমাতে পারেনি। তারপর অবশ্য হঠাৎ আবার পরদিন দিনের আলোতে বন্ধুদের সান্নিধ্যে এসে [illegible] সেই স্বপ্ন কেটে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে [illegible] ফারুকন্নিসাকে দেখেও তো তার এমনি হয়েছিল প্রথমটা। কিন্তু তারপর ধীরে [illegible] আনারউন্নিসারই জন্য, তার সাদি করা বেগমের জন্যই মনের একটি গোপন কোণে একটা মধুরতম স্পর্শের কথা আবিষ্কার করতে পেরে সে ফরুকের মোহকে ত্যাগ করতে পারে নি ? তাহলে আসমানের মোহে সে পড়বেই এমন কি কথা আছে ! আনারকে কি সে তবে ভালবাসে না ?

এই কথাটি মনে পড়তে আর একবার তার মনের মধ্যে একটা বিরাট সমস্যার উদ্ভব হল যেন। গুজরাটের বন্দরে দূরে থেকে আনারের জন্য অভাব অনুভব করেছিল রিহান—কাছে এসে যেন তার কিছুই সে পাচ্ছে না। আনারের সমস্ত রহস্যই যেন এখন আবিষ্কৃত রিহানের কাছে। তাই তাকে পুরানো মনে হয়। সংসারের জন্য তার প্রয়োজনে তাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু প্রণয়ের জন্য ? আনার কিছুতেই বুকের মধ্যে একটা উন্মাদনার সৃষ্টি করতে পারে না। রক্তের মধ্যে দোল্ খেয়ে যদি ফেনপুঞ্জের সৃষ্টি না হয়, তবে প্রেমের স্বাদ কোথায় ? আনার বড় শান্ত, বড় পরিচিত, বড় পুরানো। হৃদয় তাকে গ্রাস করে বসে আছে, বাইরে থেকে হৃদয়ে আঘাত করবার কিছু নেই আর।

রিহানকে চুপ করে থাকতে দেখে বুরহান জিজ্ঞাসা করল : কি ভাবছ?

রিহান বলল : খুঁজে দেখছি কোথায় মনের সেই দুর্বলতাটুকু আছে।

—পেয়েছ?

—না।

—সেই মনের দুর্বলতাটুকু আছে দোস্ত্, তুমি বাইরে চলে যাও।

—তাই যাব দোস্ত্।

রিহানের চোখের দৃষ্টিতে একটা ম্লান ছায়া ফুটে উঠল। সে বড় ভেঙ্গে পড়ল যেন।

সূর্য্য তখন পশ্চিম গড়ের পাশ দিয়ে ডুবে যাচ্ছিল। অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্র ঘরের দোরে উঁকি দিয়েছিল।

বুরহান বলল : যাক ওকথা রাত্রিতে ভেব। চল বেড়িয়ে আসি।

রিহান বলল : না, আর বাইরে যাব না।

বুরহান বলল : না গেলেই লোকের সন্দেহ আরো বাড়বে, চল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিহান উঠে এল।

বুরহান ভেবেছিল আজকে দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়ি শূন্য। সেখানে আর কেউ থাকবে না। কেউ মানে তাদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ থাকবে না। নইলে গৌড়ের নাগরিকদের কাছে দক্ষল দরওয়াজার আকর্ষণ যতদিন থাকবে, মানুষ এখানে আসবেই। কে জানে, কোন দিন যদি গৌড় ধ্বংসও হয়ে যায়, এই দক্ষল দরওয়াজা হয়তো বেঁচে থাকবে।

কিন্তু ওবা দক্ষল দরওয়াজায় আসতে বুরহান একটু চমকে উঠল। দেখল ভূষণ বসে আছে সেই সিঁড়ির উপর।

সে বলে উঠল : ভূষণ দেখি আজকে আমাদেরও আগে?

রিহান কোন কথা না বলে সেই সিঁড়িতে উপবিষ্ট ভূষণের দিকে তাকাল।

এক মনে বসে সে যেন কি দেখছে।

বুরহান এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল : কি ভাবছ্ দোস্ত্?

চমকে উঠল ভূষণ : ওহ্! এ্যাঁ! ওহ্ তুমি! এস।

বুরহান জিজ্ঞেস করল : কি ভাবছিলে?

ভূষণ বলল : ভাবছিলুম এই পথটার কথা।

—কি ভাবছিলে?

—পথটা গৌড় থেকে বাইরে গিয়েছে, না বাইরে . :ক গৌড়ে এসেছে।

বুরহান হেসে বলল : এ তো কবির প্রশ্ন নয়, এ যে দার্শনিকের প্রশ্ন বন্ধু?

ভূষণ বলল : তা জানি না, কিন্তু প্রশ্নটা আমার মনে এল।

—হঠাৎ এই প্রশ্ন তোমা: মনে এল কেন?

—কারণ পথটা কোন্ দিকে শেষ হয়েছে তা জানা প্রয়োজন।

—মনে কর না কেন গৌড়েই শেষ হয়েছে?

—তাহলে বন্ধন।

অবাক হয়ে বুরহান তাকাল ভূষণের মুখের দিকে। কি হয়েছে ওর? সেই নাচের

আসরের পর থেকে ওর মধ্যেও বিরাট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তবে কি আসমানের রূপের ফাঁদে ও ধরা পরেছে নাকি? না-পাওয়ার দরুন পাগলামী?

বুরহান জিজ্ঞেস করলঃ বন্ধন কি?

—বন্ধন মোহ। বন্ধন চার দেওয়াল।

—আর মুক্তি?

—মুক্তি অসীমের দিকে পথের যাত্রা।

হঠাৎ বুরহানের মনে পড়ল, কাল সে 'মুক্তি মুক্তি' বলে লাফিয়ে উঠে চলে গিয়েছিল। বললঃ তা দোস্ত্ কাল যে মুক্তির স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠে চলে গেলে, সে মুক্তির সন্ধান পেয়েছ?

ভূষণ বললঃ হ্যাঁ।

—কী সে মুক্তি?

ভূষণ পদটি আবৃত্তি করে শোনালঃ

গগন স্বাতীকি বিন্দুয়া চুয়ত
ঝিনুক হিয়া ভেল মুক্তা।
দিন দিন করি স্বপন স্বপন
উঠল উজলি মুক্তা॥
মরত স্বাতীকি অশ্রু বিগলিত
পায়লুঁ কবি হিয়া যুক্তি।
ভূষণ খাঁ ভনে রাখহ্ গোপনে
ফুটব মনে মন-মুক্তি॥

বুরহান বললঃ তা যাই বল বুঝতে পারলুম না দোস্ত্। তোমার কবিতাগুলো যেন কেমন একটু হেঁয়ালী হয়ে যাচ্ছে।

ভূষণ বললঃ তুমি কেঁদেছ বন্ধু কখনো?

—কেন?

—না কাঁদলে এ কবিতা বোঝা যায় না।

কৌতূহল হল বুরহানের, বললঃ তুমি কেঁদেছ?

—হ্যাঁ।

—কার জন্য?

—তা ঠিক জানি না, তবে বোধহয় অকারণেই।

বুরহান বললঃ তা নয়, বুঝি তুমি কাউকে ভালবেসেছ।

ভূষণ একটু চিন্তা করল। বললঃ ভাল? হ্যাঁ তা বাসতে গিয়েছিলুম।

একটু মুখ টিপে হাসল বুরহানঃ পাওনি—কেমন?

ভূষণ বললঃ মনে হয়েছিল পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার চোখের অশ্রুবিন্দুর মধ্যে এমন এক অসীম ইঙ্গিত পেলাম যে তাকেই আর খুঁজে পেলুম না। তারপর থেকে আমিও কান্নার প্রবাহে ভেসে গেলুম।

অবাক হল বুরহান ঃ সে কি ! ভূষণের সেই প্রণয়িনী তবে কে ? নিশ্চয়ই আসমানতারা নয়। আসমানতারার চোখে মোহিনী নটীর হাসির দ্যুতি ফুটে উঠতে পারে কিন্তু অশ্রুর মুক্তা গড়িয়ে পড়বে কি ? অসম্ভব।

তবে সে কে ?

এমন সময় ভূষণের দৃষ্টি পড়ল রিহানের উপর। সে বলল ঃ এই যে রিহান ভাই তুমি ! চমনলাল তোমাকে সকালবেলা কত খোঁজ করছিল এখানে।

চমনলালের নামটা শুনে ওরা দুজনে যেন কেমন চমকে উঠল !

বুরহান জিজ্ঞেস করেছিল ঃ কেন খোঁজ করছিল তুমি জান ?

—তা জানি না, কিন্তু তাকে বড় বিপর্য্যস্ত দেখাচ্ছিল। ঐ যে বললুম না, পথটা কোথায় গিয়েছে—গৌড়ে না বাইরে। এই পথ বেয়ে চমন এসেছে গৌড়ে, সে বন্দী।

—বন্দী মানে ?

ভূষণ বলল ঃ "কেন তোমরা দেখতে পাওনি ? কিন্তু দেখবে।" হঠাৎ কি খেয়াল হল, ভূষণ উঠে দাঁড়ালো। তারপর সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলতে লাগল।

বুরহান জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় চললে—দোস্ত্ ?

—মুক্তির সন্ধানে।

ভূষণ চলে গেল। বুরহান অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

মনে মনে ভাবল, পাগলই হল।

ওরা দুজনে শুধু বসে থাকল সেখানে। সন্ধ্যার অন্ধকার ওদের দুজনকে ঘিরে ধরল।

হঠাৎ এমন সময় কে যেন ছুটে এল ওদের দিকে।

এই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই ওদের কে চিনল ? চমন নাকি !

বুরহান সেই দিকে তাকাল।

সেই আলাউদ্দিন সে ওদের কাছে এসে হাঁফাতে লাগল।

বুরহান জিজ্ঞেস করল ঃ কি আলাউদ্দিন ? কি ব্যাপার ?

আলাউদ্দিন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল ঃ শুনেছেন, চমনলালকে সুলতানের ফৌজ ধরে নিয়ে গেছে।

—কোথা থেকে ?

—আসমান বিবির আস্তানা থেকে। এখন বোধহয় সে নহবৎখানার কাছে কারাগারে আছে।

চমক খেয়ে থ বেনে গেল বুরহান। ভূষণটা কি এসব জানতো ? ইঙ্গিতে এতক্ষণ সে কি সে কথাই বলে গেল !

সে উঠে দাঁড়াল। রিহানকে বলল ঃ ওঠ, যেতে হবে।

—কোথায় ?

—চল।

ওরা চলতে লাগল। জনান্তিকে বুরহান রিহানকে বলল ঃ ভূষণের ইঙ্গিত বোঝোনি ? বাঁচতে গেলে পথ যে দিকে ঘর ছাড়া সেই দিকে চলতে হবে। তুমি বেরিয়ে পড়।

রিহানের গৃহেই ওরা দুজন ফিরে এল।

বড় বিষণ্ন দেখাচ্ছিল রিহানকে। মনের মধ্যে একটা বিরাট অনুশোচনা যেন তাকে দহন করছিল। অন্তরটা তার ছোট নয়। তার নিজের পাপে তারই একজন বন্ধু কষ্ট পাবে এটা ভাবতে যেন কষ্ট হচ্ছিল। সে বুরহানকে জিজ্ঞাসা করল : কি হবে দোস্ত্?

বুরহান বলল : একটা কিছু করতেই হবে। দেখতে হবে কাজি কোন্ বিচার করেন। সম্ভবতঃ কিছু প্রমাণ না পেলে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন না। আর এ কোন রাজনৈতিক অপরাধও নয়। কখনও কোন কোন ক্ষেত্রে এমন উন্মাদনার মুহূর্তে খুনখারাবি হয়েই থাকে।

রিহান বলল : কিন্তু চমন কেন আমারই পাপে কারাযন্ত্রণা ভোগ করবে?

বুরহান বলল : কিন্তু এই ক্ষেত্রে তুমি যদি পাপ স্বীকার করতে যাও তবে মৃত্যু-দণ্ড সুনিশ্চয়। সুতরাং চমনলাল বরং কারাযন্ত্রণা ভোগ করুক। বন্ধুর জন্য কোন বন্ধু কি কখনো ত্যাগ স্বীকার করে না?

রিহান বলল : চমনলাল যদি স্বইচ্ছায এ ত্যাগ স্বীকার করত তবে কিছু বলবার ছিল না।

বুরহান বলল : তা না হলেও তারো কিছুটা শাস্তি ভোগ করা দরকার।

—কেন?

—পাপী সেও।

—কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো নয়!

—না হলেও এক্ষেত্রের সঙ্গেও সে কিছুটা জড়িত। আল্লা নিরপেক্ষ বিচারক। তাকে শাস্তি পেতেই হবে। চমন তাই শাস্তি পাচ্ছে।

রিহান বলল : কিন্তু আমি যে পাপ করেছি তার শাস্তিও নিশ্চযই আছে?

—আছে। নিক্তির ওজনে বিচার করেন সেই খোদা। পাপের চরিত্র বুঝে তিনি শাস্তি দেন। তুমি অনুশোচনার শাস্তি লাভ করছ। শাস্ত্রে বলে এর চেয়ে বড় শাস্তি নেই।

রিহান বলল : কিন্তু যাকে খুন করেছি তার জন্য তো কোনপ্রকার অনুশোচনা নেই!

—না থাকাই সম্ভব, কারণ তুমি যাকে খুন করা দরকার তাকেই খুন করেছ। কিন্তু আল্লার বিচারে বিচারক তিনিই, মানুষ নয়। রোজকেয়ামতের দিনে বিচার হবে। সেই বিচারের আগে কেউ বিচার করতে গেলে তার তেমনি শাস্তি হবে। আল্লারসুল কাউকে খুন করতে বলেননি, ক্ষমা করতেই বলেছেন। তুমি তার কথা শোননি।

রিহান বলল : তবু যেন কেমন আমার মন মানছে না।

বুরহান বলল : তবু তোমাকে চুপ করে থাকতে হবে। আমি তোমাকে চিনি। তুমি বিচারের চেয়ে আবেগ দ্বারা বেশী পরিচালিত হও। শোন দোস্ত্ আমাকে কথা দাও—

—কি?

—তুমি হঠাৎ কিছু করে বসবে না। চমনলালের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লা [illegible] বিনা দোষে কাউকে শাস্তি দেন না। ওর যতটুকু দোষ ততটুকু শাস্তিই ও পাবে। তার কোন রকম মৃত্যুদণ্ড যাতে ওর না হয় সেজন্য আমরা চেষ্টা করব। প্রয়োজন হয় সুলতানের দরবারে যাব।

রিহান বলল ঃ যা হোক তোমরা ভাব। আমি আর ভাবতে পাচ্ছি না। চমনলালটা কি সত্যি পাগল হয়েছে! এতবড় একটা ঘটনা শোনবার পরও ও কেন আসমানতারার ওখানে গেল?

বুরহান বলল ঃ মানুষ কামরিপুর তাড়নাতে পশু হয়। চমনলাল আজ পশু। ওর গতিটা মৃত্যুরই দিকে ছিল কিন্তু আল্লা ওকে বাঁচিয়ে দিলেন। মৃত্যু না হয়ে ও শুধুমাত্র একটু শাস্তি পেল। কারাগারের নির্জন অবসরে বসে ও আত্মসমালোচনার অবসর পাবে। হয়তো তখন মনের আলোতে সত্য মিথ্যা দেখবার দৃষ্টি ওর হতে পারে। এর ফলে হয়তো আমরা আমাদের নিজেদের এক পুরানো দোস্তকে ফিরে পাব। 'আল্লা রসুল' যা করেন ভালর জন্যেই করেন। আচ্ছা আমি উঠি দোস্ত, তুমি কিছু ভেবো না। হ্যাঁ, যদি পার, বাণিজ্যে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হও। পার কি, তোমার যাওয়াই উচিত। হয়তো কয়দিন গৌড়ে এ নিয়ে একটু ঝড় চলবে সেই মুহূর্তে তোমার বাইরে থাকাই উচিত।

রিহান ক্লান্তভাবে বলল ঃ দেখিঁ।

বুরহান চলে গেল।

টলতে টলতে রিহান জেননামহলে ঢুকল।

মহলের নির্জন কক্ষে বসেও কিন্তু সে ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেল না। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যে যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যহতি পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিহিংসা-পরায়ণ ডাইনিদের মত জিঘাংসু অন্ধকার যেন চতুর্দিক থেকে তার উপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। অন্ধকারে চিন্তা আরো বাড়ল, কমল না।

এমন সময় পাশেই কোত্থেকে যেন একটা করুণ ক্রন্দন ভেসে আসতে লাগল। রিহান উৎকর্ণ হয়ে শুনল—পশ্চিমের বাড়ীটা থেকে আসছে। চমকে উঠল সে। কে! কে কাঁদছে! ওতো চমনলালের বাড়ী? তাহলে কি পদ্মাবতী কাঁদছে? রিহান লুকোবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় লুকোবে? অন্ধকারের চেয়ে বড় আড়াল আর কি আছে? যদি অন্ধকারের দেহটা পাষাণ দেয়ালের মত হত? যদি তার কঠিনদেহ ভেদ করে কোন করুণ ক্রন্দন কোনদিন তার কানে না এসে পৌঁছুতে পারত? তবে?

অন্ধকারের এইটুকু দুর্বলতার জন্য অন্ধকারের উপরই যেন রিহানের রাগ হতে লাগল।

ঘরের জানালাগুলো সে বন্ধ করে দিল। তারপর প্রবলবেগে নিজের মাথাটা চেপে ধরে সে বসে পড়ল ঃ "হায় আল্লা, তুমি একি করলে! তার চাইতে আমাকে ধরিয়ে দিলে না কেন?" এই ভাবতে লাগল সে।

রাত্রির বক্ষভেদ করে করুণ ক্রন্দন অনেকক্ষণ ভেসে এল রিহানের কানে। মনে হল আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী যেন এক অফুরন্ত ক্রন্দনের বেগ ঢেলে দিয়েছে। পৃথিবীর উপর দিয়ে এ ক্রন্দনের স্রোত চিরকালের জন্য ভেসে বেড়াবে। এ কান্নার আর মৃত্যু নেই। মাঝে মাঝে তার মনে প্রশ্ন জাগতে লাগল ঃ এই কান্না কেন? তার মনে হলে লোভের জন্য। লোভই মানুষের সর্বনাশ করেছে। লোভের বশবর্তী হয়ে চমনলাল নিজের সর্বনাশ করেছে। পদ্মাবতী আজ বঞ্চিতা। রিহানের এই বিপর্য্যয়, তাজুদ্দিনের মৃত্যুর

কারণও এই লোভ। কিসের লোভ? নারীদেহের লোভ। রিহানের মনে হল, যার দেহের প্রতি পাকে পাকে মৃত্যু লুকিয়ে আছে তাকে দেখে এই লোভ কেন? রূপ কী দিল? উদ্যত সর্পের দংশন মাত্র। সেই মুহূর্তে আসমানের দেহটা কল্পনা করতেও তার ভয় হল। ঐ দেহের মধ্যে কোন যৌবনের উচ্ছল মাংসপেশী সে দেখতে পেল না। চোখের মধ্যে কোন আঙ্গুরের রহস্য সে দেখতে পেল না। তার শুধু বার বার মনে পড়তে লাগল, ঐ দেহের আচ্ছাদনের আড়ালে আছে মাত্র একটা কঙ্কাল। সে শিউরে উঠল। মনে মনে বলল ঃ না, না, আর নারী নয়। অর্থের জন্য সংগ্রাম চলতে পারে, সম্মানের জন্য, প্রতিপত্তির জন্য, কিন্তু নারীর জন্য কেউ যেন কখনো সংগ্রাম না করে। রিহান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ঃ জীবনে নারীকে এই সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। সহস্র যৌবনবতীর বিলোল কটাক্ষপাতও আর কোন দিন তার ধ্যান ভাঙ্গাতে পারবে না।

নিজের বেগম আনারউন্নিসার কথা মনে পড়ল তার। উপভোগের সেই চিত্রটিও মনে পড়ল। কি আছে সেখানে। শুধুমাত্র এক বিরাট ঘৃণা ছাড়া আর কি? নিশীথের অন্ধকারে নারীর কামনার দেহটা জ্বলে উঠতে দেখেও তাব তৃপ্তি হয়নি? তার সাধ মেটেনি? তবে? তবে কেন সে আবার গিয়েছিল আসমানতারার কাছে? ঐ রূপের অন্তরালেও কি বহুরাত্রি পরিচিত আনারউন্নিসার জঘন্য জৈবিক কামনা নেই? সেই মুহূর্তে তার আসমানের প্রতি এত ক্রোধ হল। যেন মনে হল—খুন করা উচিত ছিল ওকেই, তাজুদ্দিনকে নয়। অন্যায়ের কারণকে দূর করা উচিত—অন্যায়কে নয়।

বিরাট চিন্তার ভারে মাথাটাকে ভার বোধ হতে লাগল রিহানের। কত শত কথা, কত অজস্র কথাই সে ভাবল রাত ভরে। ঘুম হল না। রাত্রিশেষে শুধুমাত্র একটু তন্দ্রা এসেছিল। কিন্তু অবচেতন মনে সে বুরহানের অপেক্ষা করেই বসে ছিল। ভোরবেলা আবার সে আসবে। তার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। এই প্রেতনগরী গৌড়ে আর থাকা চলবে না, তাকে বিদায় নিতেই হবে। কোথায় যাবে সে?

রাত্রিশেষের তন্দ্রা মুহূর্তে পাখীর ডাকে তার ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি সে উঠে বসল। আর বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে উপস্থিত হল। পথের দিকে তাকিয়ে থাকল কাতর দৃষ্টি নিয়ে বুরহানের জন্যে। তাকিয়ে থাকল যেমন করে একটা খুদে পাখী খাবারের সন্ধানে গৃহস্থ বধূর উঠানে তাকিয়ে থাকে।

তখনো সূর্য্যের আলো ফোটেনি। কমলারোদ পর্য্যন্ত পড়েনি ছড়িয়ে। হঠাৎ একটা তাঞ্জাম এসে থামল রিহানের ঘরের সামনে। বুকটা দোল্ খেয়ে উঠল রিহেনের ঃ কে? বুরহানই কি এল তাঞ্জামে? তাহলে কি ঐ তাঞ্জামে করেই তাকে লুকিয়ে যেতে হবে? সমস্ত গোপন কথা কি প্রকাশ হয়ে পড়েছে? রিহানের বুকটা লাফিয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে তাঞ্জাম থেকে নেমে একজন বাঁদী দাঁড়ালো রিহানের বৈঠকখানার সামনে।

রিহান যেন কিছু বুঝতে পারল না। সে হতবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকল। বাঁদী বাইরে রিহানকে লক্ষ্য করে সালাম জানল ঃ মেহেরবান, আমাদের মালিকান একবার আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে চান।

রিহান আশ্চর্য্য হল। কে এই মালিকান! চমনলালের বেগম কি? বিপদে পড়ে বন্ধুর

সাহায্য চাইতে এসেছে? মনে হল ছুটে পালায় সে। কাল অন্ধকারের বক্ষভেদ করে যার করুণ ক্রন্দন তার বুকে শেল ফুটিয়েছে, তার উদ্গত অশ্রুরাশি বুঝি মৃত্যুবান্ হানবে তার প্রাণে। নিজেকে নিতান্ত অসহায় বোধ করল রিহান। কিন্তু সৌজন্যের প্রশ্ন, অপেক্ষাকাতর নারীকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাই রিহান ধীরে ধীরে বৈঠকখানা থেকে নেমে পথে দাঁড়ালো।

বলা বাহুল্য তাঞ্জামের আরোহিণী এ পথ দিয়ে যাবার সময় তাকে দেখেই হঠাৎ থেমেছিল। রিহানের কাছ থেকে কিছু তার জানাবার আছে। সেও কিছু খুঁজছে।

রিহান কাছে আসতে তাঞ্জামের ঝালর ফাঁক করে সে রিহানের দিকে তাকাল।

চমকে উঠে স্থির একটি প্রস্তরমূর্তির মতন হয়ে গেল রিহান। সে কি করবে বুঝতে পারল না। কি ভাববে বুঝতে পারল না। নিজেকে হারিয়ে দুটি চোখ দিয়ে শুধু সেই অনিন্দিত মুখখানি দেখতে লাগল। যেন এইমাত্র একটি কমলকলি পাপড়ি মেলেছে। আর রিহানের দুইটি মুগ্ধচোখ তাকিয়ে আছে সেই পুষ্পদলের মধ্যে কোথায় মধুভাণ্ড আছে তাই দেখবার জন্য।

প্রভাতের কোকিলের মত মধুর কণ্ঠে সেই তাঞ্জাম আরোহিণী প্রশ্ন করল ঃ আমাকে চিনলেন জনাব?

রিহান কোন কথা বলতে পারল না। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

—এ বাঁদীকে চিনছেন জনাব? আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। বাঁদীর ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, এ পথে চলতে গিয়ে আপনাকে দেখেই আমি তাঞ্জাম থামিয়েছি। আচ্ছা আপনাদের কবি ভূষণ খাঁর ঘর কোন দিকে বলতে পারেন মেহেরবানী করে?

শুধু আশ্চর্য্য হয়ে রিহান বলল ঃ আসমান!

—হ্যাঁ জনাব তাকে আমার বড় প্রয়োজন।

রিহানের মহল থেকে দূরে ভাঙা বাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যায়। রিহান কোন কথা বলতে পারল না—শুধু হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল।

—জনাবকে বহুৎ ধন্যবাদ। ঝালরখানি ফেলে দিল আসমান। বাহকেরা তাঞ্জাম উঠাল। আবার তাঞ্জাম চলতে লাগল। রিহান ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সেই দিকে তাকিয়ে।

গতরাত্রে তার যে সত্য দর্শন হয়েছিল, তা আর মনে থাকল না। আবার সেই যৌবনের লাবণ্যময় ত্বকের আড়ালে সেই বিকৃতদর্শন কঙ্কালখানি চাপা পড়ে গেল। সেই চোখে আবার বেহস্তের অমৃত মাধুর্য্য ফুটল। মনে হোল না কোনদিন কোন মুহূর্তের জন্যও এ রূপের ধ্যান রিহান বাদ দিয়েছে। রাতের আসমানের চেয়ে প্রভাতের আসমান আরো সুন্দর। জীবনভর রিহান যাকে কল্পনা করেছে, যার জন্য যৌবনের রক্তে দোলা লাগিয়ে ফেন পুঞ্জ তুলেছে, যাকে না পেয়ে বার বার সে ভুল করেছে, শুধুমাত্র যার সঙ্গে সাদৃশ্য হয়নি বলে মনে হয়েছে, এই তার সেই কল্পনার মানস প্রতিমা। মুহূর্তে রিহানের অন্তরখানা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে সে দাঁড়াল আবার বৈঠকখানার বারান্দাতে। তারপর একটি আসনে তার অলস দেহটি এলিয়ে দিল।

অপর দিকে তাঞ্জাম গিয়ে পৌঁছুল ভূষণের ভাঙা গৃহের সামনে। ভূষণের মনের মধ্যে

তখন অন্য কল্পনা। গৌড় মহানগরীর বুকের উপর দিয়ে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হত্যা, কামনা প্রভৃতিব যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে সে তারা সঙ্গে যুক্ত নয়। কোন বন্ধন নেই এই গৌড় নগরীর তার উপর। একটা হাল্কা পাখীর পালকের মত সে আজ বাধাবন্ধনহীন আনন্দের উচ্ছল আবেগে ভাসমান। আর তাই তার বিধৌত দেহে পবিত্র ধূপের সুরভি। একটা ভক্তিমূলক গানের শেষে ভক্তের তনুতে যে আবেগ জাগে সেই আবেগে সে কম্পমান। সে ঘরের বাইরে কোথাও আসছিল। বাইরের প্রকৃতি দেখবার জন্য কিম্বা আসমানের কাছে যাবার জন্য কে জানে! কারণ সেই মুহূর্তে তার ভাববিহ্বল মুখখানা দেখে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার সঠিক ধারণা করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

হঠাৎ সে বাইরে তাঞ্জাম ভিড়তে দেখে একটু আশ্চর্য হল হয়তো। কিন্তু তক্ষুণি সেই নিরাকর্ষণ আনন্দের দ্যুতি ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। সে শুধু তাকিয়ে থাকল। যেন একটি রঙীন পাখী দেখছে সে। কিন্তু তাঞ্জাম থেকে যখন আসমান নামল তখন সে একটু ভাবল ঃ একি! সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল আসমানের কাছে ঃ তুমি!

আসমান দ্রুত তার বাহু ধরল ঃ চল, ভেতরে চল, কথা আছে।

ভূষণ তাকিয়ে দেখল—সেই অশ্রুর আবেগ এখনো আসমানের মুখ থেকে যায় নি। ঘরেব ভিতর ঢুকেই সে ভূষণকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

ভূষণ এতটুকু বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ কি হল তোমার আসমান?

—সুলতানের চর আমার পেছনে লেগেছে।

—কেন?

—চমনলাল কাকে খুন করেছে তাব জন্য।

—সে জন্য তোমার দোষ কি?

—জানি না।

—দোষ যখন নেই, ভয় কি আসমান?

আসমান বলল ঃ নিজের জন্য আমি ভয় করিনা ভূষণ। আমার ভয় পাছে ওরা আমার সমস্ত অর্থ ছিনিয়ে নেয়। আমার যে তা হলে ধর্মশালার পবিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে!

ভূষণ হেসে বলল ঃ ব্যর্থ হবে? কেন? তাঁর যদি ইচ্ছে থাকে কেন ব্যর্থ হবে?

আসমান তার আঁচল থেকে একটি ছোট বাক্স বের করল ঃ এই নাও আমার সোনা, রূপা, হীরা সব। আর একটি ছোট বাক্স বের করে বলল ঃ এই নাও মোহর। আমি কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি—পাছে আমি তাদের সেবা করতে না পারি।

ভূষণ বলল ঃ কোন ভয় নেই। পরমানন্দদেব নিজে বলেছেন হবে। জান, তিনি বলছেন এ সব তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে। তিনি তোমার মধ্যে দৈবকরুণা দেখতে পেয়েছেন, তোমার ভয় কি আসমান?

আসমান প্রবল কৌতূহলে তাকাল ভূষণের দিকে ঃ 'বলেছেন! তিনি বলেছেন! প্রিয়তম, আমার প্রিয়তম', সে আবেগে ভূষণকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

ভূষণ বলল ঃ আসমান তুমি কাঁদ। তোমার কান্না আমার বড় ভাল লাগে। তোমার অশ্রু আমাকে শিশিরধৌত করে দেয়।

আসমান বলল : ওগো, তিনি কি বলেছেন আমি সেই পরম প্রেমময়ের করুণা লাভ করব?

—করবে আসমান।

—তাহলে এই পাপের পথ?

—পাপ নয়, তিনি বলেছেন মুক্তির। বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যই তিনি তোমাকে এই পথ দিয়েছেন। একদিন যখন ডাক আসবে তিনি নিজেই তোমাকে নিয়ে যাবেন। প্রভু তোমাকে শুধু অপেক্ষা করতে বলেছেন।

আসমান বলল : আর তোমাকে?

—আমাকেও।

অশ্রুর ধারার মধ্যেই হাসল একটু আসমান : আমার আর তোমার মুক্তি একই দিনে হবে প্রিয়তম?

ভূষণ বলল : আমরা পৃথিবীর দুটি আত্মা—আবার মহামরণ পারে যুক্ত হব, কারণ আমরা যে মূলত এক!

আসমান শুধু ভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অপর দিকে রিহান তার বৈঠকখানাতে নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে ভাবতে লাগল। তার শরীরটা পর্য্যন্ত কাঁপতে লাগল। সে চলে গেল! যেচেই সে এসেছিল। হয়তো রিহানের কাছেই তার প্রয়োজন ছিল। নইলে ভূষণের গৃহ খুঁজবার জন্য রিহানের মহলের কাছে তাঞ্জাম থামিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল না আসমানের। হয়তো কোন প্রয়োজন আছে তার রিহানের কাছে। কি প্রয়োজন? সুলতানের অনুচর তাকেও কি এই খুনের ব্যাপারে জড়াতে চায় নাকি? তাইকি আসমান বিব্রত হয়েছে? সকালবেলাতেই সে ছুটে এসেছে তার কাছে? অনুশোচনা হতে লাগল। কেন সে তাকে বসতে বলল না। সেটা তার সৌজন্যেরও প্রশ্ন ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন, কেমন যেন সব ওলট পালট হয়ে গেল। এমন একটা অবাক বিস্ময় হতচকিত করে দিল রিহানকে যে, সে কোন কথা বলতে পারল না। অন্ধকার রাতে হঠাৎ বিদ্যুৎচমক যেন অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে দিল। অন্ধকার যেন সামনে কিছু দেখতে দিল না তাকে। বিদ্যুতের চমকটা কেটে গেলে এখন পথ দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু সেপথে যার কাছে পৌঁছতে হবে সে তখন অনেক দূর চলে গেছে।

রিহানের মনে হল এখনো সময় আছে। এখনো হয়তো আসমান বহুদূর যায়নি। ভূষণের ওখানে যাবে কি রিহান? তার বুকটা কেমন কাঁপতে লাগল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বুরহান এল। রিহানকে বৈঠকখানায় দেখে বলে উঠল : এই যে তুমিও উঠেছ?

একটা ধীর আগ্রহহীন কণ্ঠে যেন রিহান তাকে ডাকল : এস।

বুরহান এসে পাশে বসল : একি! একরাতেই দেখি তোমার শরীর অনেকটা ভেঙে পড়েছে?

—হ্যাঁ, দোস্ত্।

া, না। তেমন চিন্তা কোর না।

বুরহান উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল—বাইরে থেকে যেন দেখা না যায়। সে বিহানের আরো খানিকটা কাছে সরে এল। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলল: রিহান, চমনের সংবাদ আমি নিয়েছি। ওর বিরুদ্ধে কোন রকম প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাই শুধু হাজতবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। সুলতান এ বিষয়ে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন নি। দরবার সন্দেহ করছে মালিক রজ্জাক এই খুন কারয়েছেন। কুচবিহারের শাসনভারটা তিনিই চেয়েছিলেন। সুতরাং সন্দেহের গতিটা ঘুরে অন্যদিকে গেছে। আপাতত ভয় নেই। কিন্তু খাজা আব্বাস আমীর-ই-দাদ নিযুক্ত হয়েছেন। অত্যন্ত চতুর লোক। তার দৃষ্টি এড়িয়ে ঘটনা চাপা পড়ে থাকবে এমন মনে হয় না। সুতরাং তুমি তাড়াতাড়ি কোথাও বাইরে চলে যাও। আর তাছাড়া চমনলালও সেদিনের ঘটনা কিছুটা বলে দিতে পারে।

একটুখানি যেন অধৈর্য্য হল রিহান।

বুরহান বলল: আমি বুঝতে পারছি তুমি চমনলালকে এখনো অত নীচুতে নিয়ে যেতে রাজী নও। আমাদের অন্তরঙ্গদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যত নীচুতেই নামুক এত নীচে নামতে পারে না—এইতো ! কিন্তু জানতো বন্ধু মৃত্যুর মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মানুষ একমাত্র নিজের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। এই যে চমনলালকে আসমানের জন্য পাগল হতে দেখেছ, নিজের জীবন রক্ষার্থে যদি প্রয়োজন হয সে আসমানের ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিতে ইতস্তত করবে না।

রিহান কিছু বলল না। কিন্তু এমনভাবে নীরব থাকল যাতে বুরহানের মনে হল যে সে তার সন্দেহকে অনুমোদন করছে না। তাই কথা ফিরিযে নিল। বলল: আচ্ছা না হয় বুঝলুম যে চমন কিছু বলবে না, কিন্তু অন্যকোন সূত্রেও তো ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে ? সুতবাং আমার মতে তোমার কালবিলম্ব না করে গৌড় ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। গৌড়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে আমরা তোমাকে পরে জানাব।

তবু রিহান কোন কথা বলল না। বুরহানের কথাগুলো যে তার কানে যাচ্ছিল এরকমই মনে হল না। সে ভাবছিল। নিজের মনের মধ্যেই ভাবছিল। মিথ্যে নয়, সে ভাবছিলই। ভাবছিল, গৌড় ছেড়ে যাওয়া আর কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আজকে তার জীবনে আবার নতুন করে দোলা লেগেছে! জীবনের অতৃপ্ত অনেক ক্ষুধা রয়ে গেছে তার মধ্যে। বহু কামান তার পূর্ণ হয়নি। অর্থের অভাব কি রিহানের ? কিন্তু যে সুন্দরীর কটাক্ষপাতের জন্য সে উন্মুখ, যার সুললিত কণ্ঠের জন্য সে আকুল—তাকে এতদিন কোথায় পেয়েছে সে ? পায়নি। সেই প্রত্যাশিতা নারীর দেখা যখন সে পেয়েছে, তাকে ছেড়ে দূরে পালিয়ে যাবার কোন প্রশ্ন আসে না,—বিশেষ করে আসমান যখন যেচে তার কাছে এসেছে। আবার সেই সকালবেলার সদ্যপ্রস্ফুটিত কমলসদৃশ্য অপূর্ব শ্রীমাখানো মুখখানা তার মনে পড়ল। মনের মধ্যে কামনার তাড়নাতে সে একটা কম্পন অনুভব করল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বুরহান আবার জিজ্ঞাসা করল: কী, তুমি কিছু বলছনা যে ?

বুরহানকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অবাক করে দিল রিহান। সে বলল ঃ না, বুরহান আমি গৌড় ছেড়ে যাব না।

বুরহান রিহানের মুখের দিকে তাকাল। রিহানের আবেগপ্রবণ মনটাকে সে জানে। এখনো বোধহয় রিহান সেই আবেগের ধাক্কাটাকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে বলল ঃ রিহান ভেবে দেখ, এটা আবেগের কথা নয়। জীবনমরণের প্রশ্ন এখানে জড়িত।

রিহান নির্বিকার ভাবে যেন বলল ঃ না বুরহান আমি গৌড় ছেড়ে যাব না।

বুরহান ভাবল এই মুহূর্তে রিহানকে বোঝানো যাবে না। আবেগের স্রোতে ভাঁটা পড়লে আবার তাকে বোঝাতে হবে। এখন রিহান ভাবুক। সে উঠে দাঁড়াল। বলল ঃ আচ্ছা তুমি ভাব। পরে আমাকে জানিও। বণিক বিজয় শেঠ এক সপ্তাহের মধ্যেই সিংহলে তার বাণিজ্য তরী নিয়ে যাবে। তুমিও সেইসঙ্গে যেতে পার।

বুরহান চলে গেল।

রিহানও আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়ল। সে চলল ভূষণের গৃহের দিকে।

ভূষণ তখন বেরুচ্ছিল। মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল। রিহান তাকে যেন ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল ঃ ভূষণ, আসমান এসেছিল এখানে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

ভূষণের কি মনে হ'ল সে একটু গভীর ভাবে রিহানের মুখের দিকে তাকাল। একটা কামনার আবেগে রক্তাভ হয়ে উঠেছে মুখখানি। এ মুখের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। চমনলালের মুখের মধ্যে এই মুখের ছায়া সে বহুবার দেখেছে। যদিও যে কোন আবেগের ছায়াই চমনলালের মুখে পড়ুক না কেন তা বীভৎস হয়ে উঠে, তথাপি সেই বীভৎসতার অন্তরালে কামনার রক্তিমাভা নজর এড়ায় না। ভূষণ চিনতে পারল রিহানকে। বলল ঃ হ্যাঁ, এসেছিল।

—কেন?

—খেয়ালের বশে। নইলে আমার মত দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে সে আসবে কেন?

রিহানের কথাটাকে অসম্ভব মনে হলনা। বাঈজী—যার সম্পর্ক অর্থের সঙ্গে, দরিদ্রের গৃহে তার কি প্রয়োজন? নিশ্চয়ই আসমান ভূষণের কাছে আসেনি, তার উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। কি সে উদ্দেশ্য? আসমান কি তাহলে জানতে পেরেছে যে বণিক রিহান গত পরশু তার নাচের মজলিসের জন্য আশা করে গিয়ে ফিরে এসেছে?

সে জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমাকে কি বলল আসমান?

—কিছুই না, সব খেয়ালী কথা।

—কিসের খেয়াল?

—একটি ধর্মশালা তৈরী করবে।

—কার জন্য?

—আমাদের মত অভাজনদের জন্য।

রিহান বুঝল প্রকৃতপক্ষে এটা কোন কথা নয়। একটি পাগল যুবককে খেয়ালের বশে সে অনুগ্রহ দেখিয়ে গেছে মাত্র। সে দেরী করল না। আবার পথে নামল। সামনে

একটি ফাঁকা এক্কা গাড়ী চলছিল। গাড়োয়ানকে ডেকে গাড়ী থামিযে উঠে পড়ল সে : পশ্চিমগড় চল।

গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষ্‌ল সপাং করে। ঘোড়া ছুটে চলল। সবটাই লক্ষ্য করল ভূষণ। মনে মনে একটু হাসল সে। বিশ্বজগতে প্রত্যেকটি জিনিষেরই যেন বিরাট ইঙ্গিত আছে। এই যে গাড়োয়ান আর ঘোড়া, এরও কি কোন অর্থ নেই? এরা কোন্ ইঙ্গিত বহন করছে? ভূষণের মনে হ্‌ল, এই গাড়োয়ান কাম স্বয়ং। প্রবৃত্তির অশ্বে সে চাবুক কষ্‌ল। এই প্রবৃত্তি রিহানের। সেই চাবুকের তাড়নায় রিহান ছুটে চলেছে আসমানের কাছে। হায় এই রিহানই যে ক্লান্ত পথিক! আনন্দের সন্ধানে সে মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কোথায় সেই মানুষ জগতে যিনি এদের জন্য ধর্মশালা তৈরী করবেন? এদেরও জন্য কোন আসমানের হৃদয় কাঁদবে না?

কিন্তু আর দেরী করবার উপায় নেই। সে চলল গুপ্তবৃন্দাবনের পথে।

অপর দিকে রিহানের গাড়ী গিয়ে পৌঁছুল পশ্চিমগড়ে আসমানের গৃহের কাছে। রিহান নামল। খাসনবিস দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে ছিল। রিহানাকে দেখতে পেযেই সে চিনল। আব একদিনের মোহরের তোড়াটি পর্য্যন্ত সে ফেরৎ নিযে যায় নি।

খাসনবিস তাকে সালাম জানাল : আসুন জনাব। আর একদিন আপনি আপনার অর্থ ফেরৎ নিয়ে যান নি।

রিহান বলল : সে অর্থ ফেরৎ নেওয়ার প্রয়োজন নেই আর। আমি আসমানতারার সঙ্গে দেখা করতে চাই, আপনি তাকে খবর দিন।

খাসনবিস বলল : আমাদের মালিকান তো এই সময় কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

রিহান বলল : আমার সঙ্গে করবেন। যান আপনি তাকে গিয়ে বলুন বণিক রিহানুদ্দিন এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করতে।

খাসনবিস বলল : কিন্তু এই সময় তার কাছে যাবার হুকুম নেই।

রিহান বলল : যান, আজকে সে দেখা করবে, কারণ এইমাত্র সে দক্ষল দরওয়াজাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

একটু আশ্চর্য্য হল খাসনবিস, সেকি! তবে কি আসমানতারা পাল্টালো! হতেও পারে। কারণ কিছু আগেই সত্যি সে তাঞ্জামে করে ফিরে এসেছে।

কোথায় গিযেছিল সেই জানে। কি প্রযোজন বণিক রিহানের সঙ্গে সে বুঝতে পারল-না। তবে কি তাজুদ্দিনেব খুনের ব্যাপারে সে রিহানের স্মরণাপন্ন হয়েছিল? সুলতানের আমীব-ই-দাদ আসমানকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। খাসনবিস রিহানের দিকে তাকিয়ে বলল : —জনাব বসুন, আমি মালিকানকে খবর দিচ্ছি।

রিহন বসল।

খাসনবিস ভেতবে আসমানকে খবব দিতে গেল।

আসমান তখন সেই পর্ণকুটীরের মেঝেতে নিবাভরণ দেহে শুয়ে ছিল। কেমন এক কল্পনাহীন দৃষ্টি মেলে সে বাইরে তাকিযে ছিল। খাসনবিসকে সে দেখতে পেল। উঠে বসল : কি খবব খাসনবিসজী?

—আপনি বণিক রিহানুদ্দিনকে সংবাদ দিয়েছিলেন?

আশ্চর্য্য হল আসমান ঃ কৈ, নাতো!

—কিন্তু তিনি বলছেন আপনি এই মুহূর্তে দক্ষল দরওয়াজাতে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন!

সকাল বেলার সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠল আসমানের চোখে। সে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

হায় কেউ মুক্তির জন্য পাগল, কেউ বন্ধনের জন্য! পদার্থের সত্যিকারের রূপ বুঝি মানুষের দৃষ্টির কাছে কোন দিনই ধরা পড়ে না। সে দেখে তার নিজের চোখে। একই মুখে কেউ অশ্রুর আবেগ দেখে, কেউ দেখে কামনার ইন্ধন। একই অগ্নিকে কেউ পবিত্র মনে করে দেখে, কেউ তাকায় দাহ্যমান একটি শক্তি মনে করে। নইলে আসমানের চোখ দুটো দেখে রিহান কি বুঝতে পারল না যে কোন পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে যায়নি? সবই তার ভাগ্য। সবই এক অদৃশ্য ইঙ্গিতের ফল। না, আসমান কিছু ভাববে না এ নিয়ে। সে একটি আগুনের শিখা। জ্বলছে। কেউ যদি তাকে নিয়ে কাজে লাগায়, লাগাক্। কেউ যদি এর মধ্যে পুড়ে মরবার জন্য আসে আসুক। এতে তার হাত কি? সে আগুন। তাকে যখন জ্বালানো হয়েছে সে জ্বলবেই। তার চরিত্রই জ্বলা। যদি কারো চরিত্র হয় সেই অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া সে হবেই কারণ তার চরিত্র দগ্ধ হওয়া। এখানে আগুনের কিছু করবার নেই।

কিন্তু আসমান তাই বলে ক্ষুধার্ত একটি মাছের মুখে টোপ ফেলে তাকে ধরবার চেষ্টা করল না। সে খাসনবিসকে বলল ঃ না, বণিক রিহানুদ্দিনকে আমি দেখা করতে বলিনি। যদি নৃত্যের আসরের প্রয়োজন থাকে তার তবে আপনার সঙ্গে তাকে কথা বলতে বলুন। একমাত্র নৃত্যের আসর ভিন্ন আমার দেখা পাওয়া যায় না।

তাকে দেখে রিহানের বুকটা কাঁপতে লাগল। তাহলে তার স্বপ্নের সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তার কাছে ধরা দেবে? খাসনবিসের পেছনে নিশ্চয়ই সেই মুর্তিমাতী যৌবন, বেহস্তের অপ্সরা কামনার মধুভাণ্ড হাতে নিয়ে আসছে? কিন্তু খাসনবিস তাকে হতাশ করল। বলল ঃ জনাব, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমাদের মালিকান এই মুহূর্তে কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। আপনার যদি প্রয়োজন হয় আপনি সন্ধ্যাবেলার নৃত্যের আসরের জন্য আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

যেন সপাৎ করে রিহানের পৃষ্ঠে একটি চাবুক পড়ল—আসমানের চাবুক। দেখতে দেখতে তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল।

—আচ্ছা, সালাম। সন্ধ্যার আসরই আমার জন্য রইল। আমি আসব।

একটু নত হয়ে অনুমোদনে ভঙ্গী করল খাসনবিস। রিহান গিয়ে অপেক্ষমান এক্কাতে উঠল।

এক্কা চলতে লাগল। সেই চলার তালে তালে রিহান ভাবতে লাগল—আসমান এমন করল কেন? এটাকি নর্তকীদের কৌশল? বানের জলকে ঠেলে রেখে তার বেগকে প্রবলতর করা? আকাঙ্ক্ষা তো বানেরই মত। কিম্বা আসমান সত্যি ভূষণের কাছে গিয়েছিল? ভূষণকে কি ভালবাসে আসমান? রিহান শুনেছে কবিদের প্রতি নারী জাতির

একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কিন্তু সে আকর্ষণ অর্থের প্রলোভনকে কাটিযে উঠতে পারে কি? সেই মুহূর্তে ভূষণের উপর কেমন একটা ঈর্ষা বোধ করল রিহান। কী লেখে ভূষণ? তার কী গুণ আছে? নেহাৎ তারা কয়টি বন্ধু তাকে একটু প্রশ্রয় দেয় তাই বলেই না! নইলে রিহানদের পর্য্যায়ে আসবার তার কী যোগ্যতা আছে? কিন্তু সেই মুহূর্তে ভূষণের মুখখানা তার মনের দর্পণে ভেসে উঠল। সেখানে এতটুকু আবেগ নেই, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। ভূষণ কি আসমানের প্রেমে পড়েছে? নিশ্চয়ই নয়। নইলে তার মধ্যে এতটুকু ব্যাকুলতা নিশ্চযই দেখা যেত। হঠাৎ তার মনে পড়ল, ব্যাকুলতা কি তাব মধ্যে সত্যি নেই? সেই প্রথম দিন নৃত্যের আসরের পর থেকে সেওতো কেমন উন্মনা হযে আছে। তার কাব্যে প্রেমের একটা ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেন সব কবিতাই এক অদৃশ্য প্রেমিকার উদ্দেশে নিবেদিত। তাহলে কি তার কাব্যজগতের প্রিয়া আসমানতারা? আবার রিহনেব বুকের ভিতরটা কেমন গুমরে উঠল। উহ্! জগতে কী যে সম্ভব, কী যে সম্ভব নয় আল্লাই জানেন। ভদ্রতাব মুখোসের আড়ালে মানুষ কত বকমই না হয়! ভূষণটা প্রকৃতপক্ষে একটা আস্ত বদমাস। সে সব জানে। জাদু করেছে সে আসমানকে। নইলে মালিক আমীবদের যে দুর্লভ বস্তু, সে কি যেচে আসে একজন উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের কাছে?

জাদুর কথাটা মনে পড়তে হঠাৎ তার আর একটি কথা মনে পড়ল—জ্যোতিষী। হিন্দুগুলো এই শাস্ত্র রপ্ত কবেছে মন্দ নয়। অনেক কথা বলতেও পারে। এমন কি সুলতান পর্যন্ত নানাক্ষেত্রে জ্যোতিষীদের পবামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। তক্ষুণি রিহানের মনে হল সে জ্যোতিষীর কাছে যবে। গাড়োয়ানকে ডাকল সে ঃ এই গাড়ী রোখ।

গাড়েযান গাড়ী থামাল।

রিহান বলল ঃ কোন সাধু সন্তের খবর জান? ফকির?

গাড়োয়ান বলল ঃ মুসলমান ফকির মহিউদ্দিন দরবেশের কথা জানি হুজুর।

রিহান বলল ঃ না, না, ,কোন মুসলমান দববেশের প্রয়োজন নেই। আমি চাই হিন্দু পণ্ডিত যিনি হাত দেখতে জানেন।

গাড়োয়ান বলল ঃ এমন এক গুণীর কথা জানি জনাব। থাকেন উত্তর গড়ে।

রিহান বলল ঃ আমাকে সেখানেই নিয়ে চল।

গাড়ীর মুখ ফেবাল গাড়োয়ান।

রিহানের উন্মাদ অনুসন্ধিৎসা ছুটে চলল সেই উত্তরগড়ের পণ্ডিতের কাছে। গাড়ী চলতে লাগল।

রিহানের মন গাড়ীরও আগে সেই পণ্ডিতের দরবারে গিয়ে পড়তে লাগল। বেশ কিছুকাল চলবার পর গাড়ী এসে উত্তর গড়ে থামল।

গাড়োয়ান বলল ? জনাব আমরা এসে গেছি।

রিহান যেন লাফিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

সামনেই একটি প্রাসাদানুপম অট্টালিকা। বৃহৎ প্রবেশপথ। সেখানে কয়েকজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে। রিহানের আকৃতি দেখেই তারা বুঝল যে, কোন ধনকুবের হবেন। এবং

তিনি যে মুসলমান্ এটা বুঝতেও তাদের বিলম্ব হ'ল না। শাসকের জাতের প্রতি তাদের দারুণ শ্রদ্ধা। প্রায় কুর্ণীসের ভঙ্গীতে তারা রিহানকে অর্ভ্যথনা জানাল।

রিহান জিজ্ঞাসা করল ঃ এখানে হস্তরেখা বিচার হয়?

—আজ্ঞে মহেরবান্।

—পণ্ডিতের নাম কি?

—শ্রী ভাগ্যেশ্বর বাচস্পতী ব্যাকরণতীর্থ।

—তিনি আছেন?

—আছেন জনাব। আসতে হুকুম হোক।

অভ্যর্থনা করে ওরা রিহানকে ভেতরে নিয়ে গেল।

রিহান দেখল কাঠের তক্তপোষের উপর হিন্দু-ধরনের বিরাট ফরাস পাতা। তার উপর মুণ্ডিতমস্তক রুদ্রাক্ষধারী একজন বয়স্ক পণ্ডিত বসে অছেন। রিহানকে দেখে তিনিও অভ্যর্থনা জানালেন—আসুন জনাব।

রিহান জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি হস্তখো বিচার করেন?

—আজ্ঞে জনাব, এটাই আমার পেশা।

—আপনার সেলামী কত?

—পাঁচ স্বর্ণ মোহর।

পাঁচটি স্বর্ণ মোহর তার দিকে ছুড়ে দিয়ে রিহান বলল ঃ আমি হস্তরেখা বিচার করাতে চাই। আপনি হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন?

—পারি জনাব।

—তবে আমার হাত দেখে বলে দিন।

রিহান নিজের হাত বাড়িয়ে দিল পণ্ডিতের দিকে। পণ্ডিত গভীর মনোযোগের সঙ্গে রিহানের হাত দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ দেখাবার পর তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বিরাট আগ্রহে রিহান তার মুখের দিকে তাকিযে থাকল। দুরু দুরু বক্ষে তার একটি মুখের কথার অপেক্ষা করতে লাগল। নিঃশ্বাস পর্যন্ত যেন সে রুদ্ধ করে থাকল। যেন তার 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর উপর তার জীবনমরণ নির্ভর করছে।

পণ্ডিত রিহানের মুখের দিকে তাকালেন।

কম্পিতবক্ষে রিহান জিজ্ঞাসা করল ঃ কি দেখলেন?

—আপনার রাহু প্রবল।

—তাতে কি হয়?

—মানসিক চাঞ্চল্য।

কথাটা রিহানের মনে লাগল। সে মানসিক উদ্বেগেই ভুগছে।

—আপনর উপর রাজরোষ পড়তে পারে।

রিহানের মুখখানা বেশ একটু শুকিয়ে গেল ঃ কি রকম?

—রাজ-কর্মচারীর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে।

রিহানের বুকটা দুলে উঠল।

পণ্ডিত বললেন ঃ বন্ধু নির্বাচনে সাবধান হবেন। বন্ধুরাই আপনার ক্ষতি করবে।

—বন্ধুরা !

—হ্যাঁ, বন্ধুরা। কোন বন্ধুর আপনার প্রতি গোপন ক্রোধ আছে ?

—আমার বন্ধুর !

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এমন কি সে আপনার প্রাণ হন্তারকও হতে পারে।

—প্রাণ হন্তারক !

—হ্যাঁ ! তবে....

—তবে ?

—তবে আপনি বিপদ এড়িয়ে যেতে পারবেন। কারণ বৃহস্পতি আপনার তুঙ্গে। গুরুর শুভ দৃষ্টি আছে। তিনিই আপনাকে রক্ষা করবেন। আপনার রাশী বৃশ্চিক। আপনি সরল প্রকৃতির লোক। আপনি মনের কথা সকলকে বলে ফেলেন। সাবধান হবেন, আপনার এই সরলতার সুয়োগ অনেকেই নেবে।

রিহানের গভীর শ্রদ্ধা জন্মাল জ্যেতিষীর উপর। তিনি সত্যিকথা বলেছেন। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ আচ্ছা যে বন্ধুটি আমার উপর বিদ্বেষ পোষণ করছে, সে কেমন হবে বলতে পারেন ?

পণ্ডিত বললেন ঃ হ্যাঁ, তিনি বিধর্মী।

—বিধর্মী !

তাহলে ! তাহলে ভুষণ ! সেই মুহূর্তের ভূষণের বাহ্যিক সরলতার অন্তরালে তার মনের জঘন্য রূপটা যেন প্রকাশ হয়ে গেল রিহানের কাছে। সে বলল ঃ "সত্যি বলেছেন পণ্ডিত, একজন হিন্দু বিধর্মীই আমার শত্রু।" সে আরো পাঁচটি সোনার মোহর জ্যোতিষীর দিকে সন্তুষ্ট হয়ে ছুড়ে দিল। বলল ঃ এবার আবার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলুন।

—সুলতানের দরবারে কি আমার কোন শাস্তি হবে ?

একটা ছক কেটে পণ্ডিত কি বিচার করলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য্যেকে দেখলেন। লগ্ন বের করলেন। তারপর বললেন ঃ না।

—না ! সত্যি ?

পণ্ডিত জোর দিয়ে বললেন ঃ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উল্টে গেলেও রাজ দরবারে আপনার কখনো শাস্তি হবে না।

রিহান বলল ঃ আর একটি প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলুন।

—আমি যাকে চাইছি তাকে পাব কি না।

—নারী ?

—হ্যাঁ।

কর গুণলেন জ্যোতিষী। তারপর কি ভাবলেন। বললেন ঃ পাবেন।

—পাব ?

—হ্যাঁ, তবে...

—তবে?

—মন পাবেন কি না সন্দেহ।

—মানে?

—ঠিক আপনার মন সেই পাওয়ায় সন্তুষ্ট নাও হতে পারে।

—এর কোন প্রতিবিধান নেই?

—আছে।

—কি?

—আপানাকে একটি গোমেদ ধারণ করতে হবে। তাতে চিত্তচাঞ্চল্য দূর হবে। মনের দিক থেকে যে কষ্ট তা থাকবে না।

রিহান বলল ঃ আমাকে গোমেদ দিন। গোমেদের মূল্য কত?

সে পাঁচটি স্বর্ণ মোহর বের করে দিল জ্যোতিষীর হাতে।

পণ্ডিত বললেন ঃ শনিবার দিন এই অঙ্গুরীয় ধারণ করবেন। আমি মন্ত্রপুঃত করে দেব।

—তাহ্লে আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে?

—হবে। তবে যেদিন এই গোমেদ ধারণ করবেন সেদিন আমিষ ভোজন করতে পারবেন না।

—করব না।

পণ্ডিত জিজ্ঞেস করলেন ঃ আর কিছু জানবার আছে?

রিহান বলল ঃ আপাততত নেই। আমি আবার আসব। আপনার কথা সত্য হলে আপনাকে প্রচুর ভাবে পুরুস্কৃত করব।

পণ্ডিত বললেন ঃ আবার নিশ্চয়ই আসবেন জনাব।

রিহান উঠে দাঁড়াল। বাইরে এল সে। এক্কায় গিয়ে উঠল। এবার এক্কা চলতে লাগল দক্ষল দরওয়াজার দিকে। রিহানের মনটা অনেক হাল্কা বোধ হল। মুহূর্তমাত্র পূর্বে আসমান তাকে যে আপমান করেছে সে অপমানের কথা পর্য্যন্ত আর মনে থাকল না। মনে হল, যেন কি পেয় গেছে। সেই পাবার আনন্দে তার মনটা ভরে থাকল।

সারাটা দিন রিহান এক উদ্বেগাকুল অবস্থার মধ্যে কাটাল। বুরহানের সাবধানবাণীর কথা ভুলে গেল। চমনলাল কোন কারাগারে যে রিহানেরই আন্যায়ের জন্য বসে যন্ত্রণা ভোগ করছে, সে কথা তার মনে এল না। একটি অত্যাকর্ষণীয় সুন্দর নারীমুখ সে বার বার নিজের কল্পনার মধ্যে টেনে আনল। সন্ধ্যার আভা রৌদ্রের মধ্যে ফুটে উঠতেই, আর দেরী করল না—বেরিয়ে পড়ল। আজ আর দক্ষল দরওয়াজা নয়। জীবনের সঙ্গে গৌড় নগরীর যে প্রবেশপথ অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হয়ে আছে তার কথা রিহানের মনেও পড়ল না। দূর গুজরাট থেকে যে দরওয়াজা, তার মাটীর উপর শ্যামল ঘাস, তার অদূরে শ্যামল আম্রশীর্ষ তাকে আকুল আহ্বানে টানতো, গৌড়ের বুকের উপর থেকেও সেই দরওয়াজার ঘ্রাণ আজ সে নিতে পারল না। মুহূর্তে সমগ্র পরিচিত পরিবেশ তার কাছে

অপরিচিত হয়ে গেল আর শুধুমাত্র মাত্র দুটি রহস্যময় চঞ্চল চক্ষু অতিপরিচয়ের গভীর আশ্বাস দিয়ে তাকে ডাকতে লাগল। রিহান গিয়ে এক্কায় উঠল।

এক্কা চলল পশ্চিম গড়ের দিকে।

যখন সে পশ্চিম গাড়ে গিয়ে পৌছুল, সূর্য্যের রূপালী রোদ তখন স্বর্ণাভা ধারণ করেছে। গৌড়ের অতিকায় গৃহচুড়াগুলিতে সেই স্বর্ণাভা মায়ার অঞ্জন মেখে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সে সব কোনদিকেই রিহানের দৃষ্টি গেল না। সে শুধু পশ্চিম গড়ের একটি নৃত্যশালার দিকে আকুল নয়নে তাকিয়ে থাকল। সূর্য্য মাটির দেয়ালের আড়ালে গিয়ে পশ্চিম গড়ে ছায়া ফেললে রিহান গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল।

আসমানের নৃত্যশালায় তখন আলোর নক্ষত্র ফুটেছে। খাসনবিস সেই প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে। রিহানকে দেখে সে অভ্যর্থনা করে নামাল। সকালবেলায় তার যে রূপ ছিল, বিকেলবেলায় তা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। কিন্তু রিহান তার অভ্যর্থনার দিকে দৃষ্টিপাত্ পর্যন্ত করল না—সে বরাবর নৃত্যশালায় গিয়ে প্রবেশ করল।

মূল্যবান কার্পেট বিছানো মেঝে। দেওলে মোমের আলো। উর্ধ্বে আলোর ঝাড়। বাদ্যকারেরা আসর সাজিয়ে বসে আছে। রিহান গিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসল। বাঁদী এসে তাকে দামী পানীয় দিল। সুগন্ধি তাম্বুল এল। তারপর মূল্যবান মস্‌লিনের ঝালর সরিয়ে নৃত্যনাট্যের নায়িকা আসমান স্বয়ং প্রবেশ করল।

আবার তার নতুন রূপ। তার আয়ত চোখের পারে কাজলের রেখা। উজ্জ্বল হীরার হার। কপালে স্বর্ণচিকের উপর পাথরের কাজ করা। হস্তপৃষ্ঠগুলি মণিমুক্তো খচিত। উন্নত পীনপয়োধর কাঁচুলিতে আঁটা। জাফরাণী রংয়ের ওড়ানাব ফাঁকে পুষ্ট বক্ষদেশে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায। পরনে ঘাঘ্‌রা। আসমান এসে তাকে সেলাম জানিয়ে আসরের মাঝখানে বসল। হাতে তানপুরা তুলে নিল। তাবপর মোহিনী নটীর চঞ্চল কটাক্ষপাতে তাকাল রিহানের দিকে। রিহান নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আসমান তার বীণানিন্দিত কণ্ঠে বলল ঃ হুকুম করুন জনাব, গান আরম্ভ করি। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই দেখে যে, জনাবের ইয়ার বন্ধুরা কোথায়? জনাব অভিজাত ঘরের ছেলে, বাঈজীর আসরের নিয়ম-কানুন নিশ্চয়ই জানা আছে।

রিহান বলল ঃ না আসমান, আমি একাই এসেছি, আমি শুধু তোমায় দেখতে এসেছি।

আসমান হাসল ঃ সে কি জনাব! নটীর কাছে এসে গান শুনবেন না, নাচ দেখবেন না, শুধু তাকেই দেখবেন?

রিহান বলল ঃ আসমান তুমি গান এবং নাচের চেয়ে অনেক বড়।

আসমান আর একবার রিহানের দিকে কটাক্ষপাত করে বলল ঃ তাহলে জনাব আমি পুতুলের মত বসে থাকব? তবে পটে আকাঁ ছবি কিনলেই তো ভাল করতেন। আসমানের চেয়েও দেখতে বহুত খুবসুরত তসবীর নিশ্চয়ই গৌড়ের বাজারে বিক্রী হয়?

রিহান বলল ঃ কিন্তু আসমান সে তসবীর যে কথা বলতে পারে না।

—জনাব কি তবে আমার সঙ্গে শুধু কথা বলতেই এসেছেন?

—হ্যাঁ আসমান।

আসমান বলল ঃ জানেন তো জনাব যে, আমারা তোতাপাখীর মত। শুধু শেখানো বুলি গানের সুরে আওড়ে যাই। শেখানো বুলির বাইরে কিছু জিজ্ঞেস করলেই আমরা বোবা।

রিহান বলল ঃ তুমি কথা না বললেও তোমার নীরব সান্নিধ্যে যে অকথিত কথা শোনা যায় তা কোন মুয়াজ্জিন পর্য্যন্ত ধর্মশিক্ষার আসরে বলতে পারবেন না।

আসমান বলল ঃ জনাবের উপমা জ্ঞানে সন্তুষ্ট হলুম। মুয়াজ্জিনের সঙ্গে নর্তকীর তুলনা!

রিহান বলল ঃ আসমান তুমি বাদ্যকরদের যেতে বল।

আসমান ইঙ্গিত করল। বাদ্যকারেরা উঠে বাইরে চলে গেল।

রিহান বলল ঃ আসমান তোমায় একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব?

আসমান বলল ঃ আপনি যখন গান শুনবেন না, নাচ দেখবেন না, শুধু কথা শুনবেন, তাহলে প্রশ্ন না করলে কথা হবে কি করে বলুন। তটের বুকে আঘাত না খেলে তো আর নদীর জলে কলতান ফুটবে না।

রিহান বলল ঃ সকালবেলা তুমি দক্ষল দরওয়াজাতে কেন গিয়েছিলে?

আসমান বলল ঃ কেন গিয়েছি সে প্রশ্ন আমার ব্যক্তিগত। আমার ব্যবসায়ের সঙ্গে আশা করি তার কোন সম্পর্ক নেই?

রিহান বলল ঃ ও কথা যাক্। আমার সঙ্গে তুমি হঠাৎ ওভাবে দেখা করলে কেন?

—হঠাৎ আপনাকে দরওয়াজায় দেখতে পেলুম তাই।

—কিন্তু ভূষণের গৃহ তো তোমার অজানা ছিল না।

আসমান বলল ঃ কিছুটা ছিল নিশ্চয়ই। সেই গরীব ব্রাহ্মণ জনাবের মত কোটিপতি নন। লোকে তাকে তত চেনে না। তাই তার পরিচিত বন্ধুজনের কাছেই তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিলুম আমি।

কথাটা শুনে রিহান একটু দুঃখিত হল এই ভেবে যে তাহলে মোটেই তার জন্য দক্ষল দরওয়াজাতে যায় নি আসমান! আবার একটু আনন্দও হল এই ভেবে যে আসমানের কথায় ভূষণের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছে। 'গরীব ব্রাহ্মণ' বলে তাকে উল্লেখ করেছে আসমান।

রিহান আর হঠাৎ তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল না। মুখোমুখি কাছাকাছি নিভৃতে বসে মনের আকাঙ্ক্ষিত রমণীর সঙ্গে যে সে কথা বলতে পেরেছে তার একটা বিরাট প্রসাদেই কিছুকাল তৃপ্ত থাকল যেন।

তা দেখে আসমানই প্রশ্ন করল ঃ জনাবের প্রশ্ন ফুরিয়ে গেল?

রিহান একটা আকাঙ্ক্ষাকাতর দৃষ্টি নিয়ে আসমানের দিকে তাকাল। বলল ঃ তোমাকে দেখে প্রশ্নের শেষ নেই।

—তবে প্রশ্ন করুন?

—তুমি কেন হঠাৎ নটী হলে আসমান?

আসমান তৎক্ষণাৎ জবাব দিল ঃ নইলে আমার সঙ্গে আপনি কথা বলতেন কি করে জনাব?

রিহানের আর কোন উত্তর দেবার থাকল না। সে মাথাটা একটু নীচু করে নিল। একটা প্রবল দীপ্তি মাখানো দৃষ্টিতে আসমান রিহানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

একটু পরে রিহান আবার মাথা তুলে আসমানের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা আসমান এ পথ তোমার ভাল লাগে?

আসমান বলল : আগুন জ্বালাবার পর তাকে জিজ্ঞেস করে লাভ আছে কি যে, 'হে অগ্নি, তোমার জ্বলতে কেমন লাগে?'

রিহান বলল : আসমান তুমি এ পথ পরিত্যাগ কর।

আসমান বলল : জনাব তা নির্ভর করে আপনার উপর অর্থাৎ আপনাদের উপর।

—কি রকম?

—আপনারা যদি আর এ পথ না মাড়ান তবে আমাদের ব্যবসা চলবে কি? অপরকে উপদেশ দেবার আগে নিজে নিজের কথাটা একবার ভাবুন।

রিহান বলল : আমারা যদি এ পথে না আসি তোমরা কি করবে?

আসমান বলল : আমার যারা এ পথে আছি হয় তারা মরব নয় ভিক্ষে করব। কিন্তু নতুন নটী আর সৃষ্টি হবে না।

রিহানের মনে তখনো আবেগ জমা হয়ে আছে। হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল : আসমান তুমি চল, আমি তোমাকে বেগমের মর্য্যাদা দেব, তোমাকে ভালবাসব।

আসমান উত্তর দিল : আপানার গৃহে যিনি বেগম আছেন তিনি মর্য্যাদা পেয়েছেন কি? তাকে ভালবেসেছেন কি? জানেন তো বদান্যতটা আগে গৃহেই আরম্ভ হয়।

রিহান বলল : না আসমান তোমার কথা ভিন্ন।

আসমান বলল : সর্বত্র নতুন রঙলাগা চোখে নারীরা এমনই ভিন্ন হয়ে থকে।

রিহান শপথ গ্রহণের ভঙ্গীতে বলল : না আসমান আমি আল্লার নামে বলছি—তোমাকে..." সে উঠে আসমানের হাতখানা ধরতে গেল।

আসমান তৎপরতার সঙ্গে একটু পিছিয়ে গেল। বলল : জনাব ভুল করবেন না। আমি নটী বটে কিন্তু দেহপশারিণী নই।

রিহান একটা অসহায় চোখে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকল। আসমান কি একটি যন্ত্র? হৃদয় বলে তার কোন পদার্থ নেই!

সেই মুহূর্তে বাঁদী প্রবেশ করল নৃত্যশালায়। রিহানকে সালাম জানিয়ে বলল : জনাব আপনার সময় হয়ে গেছে। এবার আমাদের মালিকান বিশ্রাম করবেন।

রিহানের চৈতন্য হল—হ্যাঁ, সমস্ত রাতটাই সে কিনে নেয় নি। সে কিনেছে একটি মাত্র নৃত্যের আসর। রিহান উঠে দাঁড়াল। আসমান তাকে সালাম জানাল। রিহান বাইরে চলে এল। প্রবেশপথে খাসনবিস দাঁড়িয়ে ছিল। রিহান তার হাতে একটি মোহরের তোড়া তুলে দিয়ে বলল : আসমানের সমস্ত নৃত্যের আসরগুলিই আমি কিনে নিলুম।

খাসনবিস বলল : সমস্ত নৃত্যের আসরের অনেক দাম।

রিহান বলল : নতুন চুক্তির সময় এলেই আমাকে জানাবেন।

খাসনবিস কুর্নিশ জানিয়ে বলল : জনাবের মর্জি অনুযায়ীই কাজ করা হবে।

রিহান বেরিয়ে গিয়ে এক্কায় উঠল।

আঠার

"Tears idle tears, I know not what they mean
Tears from the depth of some divine despair,
Rise in the heart and gather to the eyes."

Lord Tennyson

বহু মানুষের ভীড়ের মধ্যেও কাল প্রথম একা নিঃসঙ্গবোধ করেছিল বুরহান। যথারীতি গিয়ে বসেছিল দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়ির উপর। গৌড়ে অগণিত মানুষের স্রোত। গৌড়ের দরওয়াজাতেও সকাল সন্ধ্যায় বহু মানুষের ভীড়ের কমতি নেই। কালও সেখানে তেমনি জনতা জড় হয়েছিল। গৌড়ে সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। গৌড়ে ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই। তবু কতগুলো মানুষ নিত্য কেন গৌড়ের দরওয়াজার কাছে ভীড় করে? বুরহান একা বসে ভাববার চেষ্টা করছিল।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির চিরন্তন সম্পর্ক। প্রথম এ জগতে মানুষ এই প্রকৃতির মধ্যেই এসেছিল। প্রকৃতি তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে মানুষ প্রকৃতিকে ভালোবেসেছিল। রক্তের মধ্যে তার প্রকৃতির একটি ছাপ পড়ে গেছে। শুধুমাত্র প্রকৃতির বিশাল পরিবেশের মধ্যে যারা মানুষ হয়েছিল, সে-সব মানুষের পর বহুযুগ কেটে গেছে। মানুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। প্রকৃতিকে তার আশ্রয়ে আনার চেষ্টা করেছে বাড়ী তৈরী করেছে, শহর তৈরী করেছে, নগর তৈরী করেছে। কিন্তু তবু তার অধস্তন্ পুরুষের মধ্যে সেই প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়নি। কখনো মানুষ রক্তের মধ্যে এতটুকু সেই প্রকৃতির আহ্বান অনুভব করে। তাই গৃহবিলাসী মানুষ মাঝে মাঝে প্রকৃতিপাগল হয়ে বেরিয়ে পড়ে। গৌড়ের ঐশ্বর্য্যের বিলাস সেই প্রাচীন মানুষের অধস্তন পুরুষকে তাই আটকে রাখতে পারে না। মানুষ বেরিয়ে পড়ে। তাই নিত্য দক্ষল দরওয়াজার বাইরে মুক্ত অঙ্গনে এত মানুষের ভীড়। এখানে উদার আকাশের নীল আহ্বান একদিন বুরহানদের কয়েকটি বন্ধুকেও বিহ্বল করেছিল। ঐশ্বার্য্যের বাইরে তাই দক্ষল দরওয়াজার এই বিশাল প্রসার শৈশব থেকে তাদের আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই আহ্বানের বেগ কি দুর্বল হয়ে পড়েছে? নইলে আজ তাতে ভাঙন ধরেছে কেন? ধীর ধীরে বন্ধুরা সেই প্রকৃতির আহ্বান ভুলছে।

চমনলাল এক উন্মাদনার মধ্যে পড়ে নিজেকে হারিয়েছে। আর রিহান! সেও কি করল? গৌড় ছেড়ে যেতে সে রাজি নয়। হ্যাঁ, গৌড়ের আকর্ষণ বড় মায়াময়। তাকে ছেড়ে যাওয়া কষ্টকর। কিন্তু সে কি সত্যি এই গৌড়কে ভালবেসেই পূর্বদেশের মহানগরীকে ত্যাগ করে যেতে রাজী হয়নি? তা যদি হত তবে সে আজ এল না কেন? এই প্রকৃতির চেয়ে বড় আকর্ষণ আর কোথায় আছে? নারীর? হ্যাঁ, তার আকর্ষণও কম নয়। কিন্তু সে আকর্ষণ চমনলালকে ছোট করেছে। নিজের বিশাল প্রসারের যে সম্ভাবনা তার ছিল,

তা আর নেই। রিহানও কি তবে সেই সীমিত আহ্বানে মুগ্ধ? বুরহান ভাববার চেষ্টা করল। আর একবার সে আকাশের দিকে তাকাল। দেখল—অসীম। অসীম দিগন্ত ব্যাপী আসমান অনন্ত ভাবে প্রসারিত। ঊর্ধ্বে নীলাঞ্জনের এক অপূর্ব মোহ। সেই দিকে তাকালে ধীরে ধীরে সীমার বাঁধন হারিয়ে যেতে চায়। এত দ্রুত সে শেষহীন এক অনন্তবিপুলতার মধ্যে মনটাকে টেনে নিতে চায় যে, শেষপর্য্যন্ত ভয় করে। যখন আর তার সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না, চমকে উঠতে হয়। নিজের মধ্যে ফিরে আসতে হয়।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করে মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণা হয়েছে। নিজেকে সে ভালবেসেছে তাই বুঝি প্রকৃতির আকর্ষণ তার কাছে আর তত নেই। যেখানে সে নিজেকে দেখতে পায় না সেখানে সে বুঝি তাকাতে চায় না। যেখানে নিজের অনুভব নেই, সেটা বুঝি তার কাছে কিছু নয়। তাই সীমার মধ্যে তার আনন্দ বেশী। কিন্তু এই সীমা তাকে কি দিয়েছে? দিয়েছে হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ, হত্যা রক্তারক্তি। প্রকৃতপক্ষে কি মানুষ তার মধ্যে নিজের সত্তার কোন সন্ধান পেয়েছে? পায়নি। শুধু বিভ্রান্ত হয়েছে। যন্ত্রণা লাভ করেছে। এই দক্ষল দরওয়াজার আকাশকে ভুলে চমনলাল কি পেল? কারাগার। রিহানও যদি ভুলে থাকে সে কি পাবে? একই সীমাবদ্ধতা। অথচ এই ভুল মানুষের কি সহজে ভাঙবে? ভাঙবে না। দুনিয়াতে শয়তানের রাজত্ব। আল্লার দান যদি আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি; শয়তানের দান তবে ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, লোভ, রূপের প্রতি আকর্ষণ। ঈশ্বর অনেক ঊর্ধ্বে রয়েছেন, শয়তান কাছাকাছি। মানুষের কানে কানে তার মন্ত্র জপবার অফুরন্ত অবসর। মানুষ তার সেই দুষ্ট পরামর্শে ভুলেছে। তাই পারস্যের সিরাজীর মত একবার পান করলে তার প্রতি মোহ ভোলা দায়। অসীম কোরাণের প্রার্থনার মত, সহজে সেখানে কেউ আকৃষ্ট হতে চায় না। এই সভ্যতাটাই মানুষের চুড়ান্ত অভিশাপ। এই সভ্যতার মদগর্বে মানুষ নগর তৈরী করেছে, বিলাসের সরঞ্জাম তৈরী করেছে, তারপর নিজের হাতে রচিত ফাঁদে সে ধরা দিয়েছে।

বুরহান মনে মনে বলেছিলঃ এই ঘর বাড়ী ভেঙে দিয়ে মানুষ আবার প্রকৃতিতে ফিরে আসুক। এখানে বিরাট শক্তির সে যে বিপুল স্পর্শ লাভ করবে তা তার মনের অনুদারতাকে নাশ করবে। আপনবোধের যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি লাভ করবে। আমার হৃদয় এই অসীমের সঙ্গে যুক্ত, আমার সঙ্গে প্রকৃতির একটা যোগ আছে, একথা ভাবতে ভাবতে সে প্রকৃতির স্নিগ্ধ প্রসাদে পুষ্ট হবে।

বুরহান তাই আবার তাকিয়ে দেখল দিগন্তের দিকে। যতদূর প্রকৃতিকে দেখা যায় সে দেখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সীমাময় শক্তির একটা আকর্ষণ আছে, তাকে সহজে ভোলা যায় না। ভোলা যায় না, যদি না এক অলৌকিক প্রেমের স্পর্শ মানবাত্মাকে পাগল করে দেয়। বুরহান দুই রাজত্বের মাঝখানে। তাই আবার নিজের নিঃসঙ্গতা-বোধ তার মধ্যে জাগল। আবার সে নিজের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখল। দেখতে পেল বন্ধুরা কেউ আসেনি।

মৃত্যু মাথার উপর উদ্যত তা জেনেও রিহান গৌড়ে কিসের আকর্ষণ পেল? নারী কি নিজের জীবনের চাইতেও বড়? চমনলাল বোধহয় আজ সেটা বুঝতে পারছে। মৃত্যুর ঠিক মুখোমুখী না হলে মোহের অঞ্জন নয়ন থেকে মুছে যাবার নয়।

কেউ নেই। ভূষণটাই বা কোথায়? বুরহান তার কথা ভেবেছিল। কিন্তু ঐ লোকটাকে বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে ধরা যায় না। পাষাণবেষ্টনীর কঠিন আড়াল তার অন্তর থেকে প্রকৃতির শ্যামল ছায়াকে মুছে দিতে পারেনি। ঘরে থেকেও সে মুক্ত। সে যেন একখণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি। একক থেকে, বিচ্ছিন্ন হয়েও প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যায় নি—যেমন গৌড়ের আমীরদের বাগিচার বৃক্ষশ্রেণী। যেখানেই তাকে বসাও, প্রকৃতির সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হবে কি? মিনাকরা বাড়ীর আঙ্গিনাতে পুঁতলেও সুপারী গাছ আকাশের দিকেই তাকাবে। ভূষণ আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছে। আর জালাল? সে যেন স্থির স্নিগ্ধ মৃত্তিকা। সে মানুষকেও ধরেছে, বৃক্ষকেও ধরেছে। তাই ভূষণকে সে চিনেছিল সব চাইতে বেশী।

ভূষণের মধ্যেও একটা উন্মাদনা এসেছে। যেন একটা অসীমের ডাকে সে চঞ্চল। ঠিক তাকেও ধরা যায় না।

ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতা আর অসীম দুই-ই আজ বুরহানের হাতের বাইরে। তার মনে হল মধ্যমের কোন স্থান নেই। হয় উঁচুতে উঠতে হবে নয় নীচুতে থামতে হবে। নইলে জীবন একক, নিঃসঙ্গ।

সাধু সন্তদের সঙ্গে পরস্পরের যোগ আছে—তা সে সাগরের পারেই থাকুক আর মরুভূমির প্রান্তেই থাকুক। মাতালেরাও জটলা করে, ভীড় করে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে যারা?—তাদের কোন ঐক্য নেই। যে কেন্দ্রীয় আকর্ষণ সবাইকে ধরে রাখতে পারে সেই কেন্দ্রীয় আকর্ষণ সেখানে থাকে না।

এই কয়েকটি মধ্য-অবস্থার আত্মাকে একত্রিত করে রেখেছিল জালাল। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐক্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে। আলোর ঝাড়ের শেকলটা ছিড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ে ভেঙে তা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে।

সীমিত জীবনের শুভবুদ্ধি জালাল। সেই শুভবুদ্ধি বড় দোদুল্যমান। কোন একটি প্রবল আকর্ষণের মুখে তা আর ধরে রাখতে পারেনা-তা সে যে আকর্ষণই হোক। উঁচু হোক, নীচু হোক। সন্ধ্যার ম্লান ছায়া আরো গাঢ় হয়েছিল। নিশীথের কালো বসন পরেছিল পৃথিবী। বুরহান নিজেকে আরো নিঃসঙ্গ বোধ করেছিল। আর থাকে নি সে। উঠে এসেছিল।

তক্ষুণি গিয়ে রিহানকে খোঁজ করেছিল সে, পায় নি। কোথায় যে বেরিয়ে গেছে কেউ বলতে পারল না। কিন্তু বুরহানের মনে হয়েছিল সে গেছে আসমানের কাছে। একবার মনে হয়েছিল সেখানেই যাবে সে। বোঝাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আবার মন ফিরিয়ে নিল। লাভ নেই। যে ঝরণা পাহাড় থেকে লাফিয়ে নীচে নেমেছে, তাকে কি আর ফেরানো যাবে? যাবে না। উপলখণ্ডের উপর খতবিক্ষত হওয়াতেই তার আনন্দ। পাহাড় যদি বলেঃ "ও ঝরণা তুমি নেমোনা, ব্যথা পাবে, পাচ্ছ" সেকি শুনবে? শুনবে না।

ওরা উপলখণ্ডের উপর লাফিয়ে পড়েছে। আঘাত পেয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে পাচ্ছে আনন্দের অনুভব। এখন তাকে ফেরানো যাবে না। চমনলালকে যায়নি, রিহানকেও যাবেনা।

সে গিয়েছিল ভূষণের কাছে। ওকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। হয় দক্ষল দরওয়াজায়—নয়

ঘর, এ দুই ছেড়ে সে কোথায় যাবে? অবশ্য এ দুইই তার কাছে এক। ঘরের তার দেওয়াল নেই,—দক্ষল দরওয়াজাও অসীমতর নয়।

সে গিয়ে সত্যি ভূষণের দেখা পেয়েছিল। সেই রেড়ীর তেলের স্নিগ্ধ আলোকে বসে লিখছিল ভূষণ। সেই ম্লান প্রদীপের আলোতে ভূষণকে এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, বুরহানের মনে হয়েছিল, নৃত্যের আসরে আলোর ঝাড়ের নীচেও তাকে এমন স্পষ্ট ভাবে দেখা যাবে না। এক মুহূর্ত তন্ময়দৃষ্টিতে ভূষণকে তাকিয়ে দেখেছিল বুরহান। নিবিষ্টচিত্ত হয়ে সে যেন কি লিখ্ছে। মাঝে মাঝে তার অনাবৃত অঙ্গ থর থর করে কাঁপছে! কি এক আনন্দের অভিব্যক্তি তার দেহময় ফুটে উঠেছে। ঘরের মধ্যেও যেন অনন্ত প্রকৃতির ইঙ্গিত।

হঠাৎ ভূষণ মুখ তুলে তাকিয়েছিল। বুরহান অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিল, তার দুইচোখে অশ্রুর ধারা।

—একি দোস্ত্, তুমি কাঁদছ?

স্মিত হাসি হেসে ভূষণ বলেছিল ঃ এস দোস্ত্ বোস।

বুরহান ওর পাশে বসেছিল ঃ তুমি কাঁদছ কেন?

ভূষণ বলেছিল ঃ আমি কাঁদছি? তাই নাকি?

—হ্যাঁ, দোস্ত্, তোমার চোখে পানি।

ভূষণ বলল ঃ কি জানি কেন দোস্ত্ আপনিই আমার চোখে জল আসে। দুঃখ থেকে নয়, বেদনা থেকে নয়, একটা পুলকের স্পর্শ থেকে।

—কী সে পুলকের স্পর্শ দোস্ত্?

—আমি দাসানুদাস। এই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি জীবের দাসানুদাস। আমি ছোট, খুব ছোট। আমি সবার ভৃত্য। একথা ভাবতেই আমার চোখে জল আসে।

বুরহান একটু ভাবল। সেকি! কেউ তবে দরিদ্র বলে ভূষণকে অপমান করল নাকি? তাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেউ? বোধহয় আঘাত পেয়েছে ভূষণ, তাই সে কাঁদছে। সে বলল ঃ ভূষণ, তোমাকে কি কেউ অপমান করেছে?

ভূষণ বলল ঃ আমাকে কেউ অপমান করেনি বলেই আমি কাঁদছি ভাই। আমাকে অপমান করুক সবাই, দীনের থেকে দীন করে দিক। আমার চোখে অশ্রুর প্রবাহ থাকুক। জাননা, কী শান্তি, কী স্নিগ্ধতা এই অশ্রুর মধ্যে। শিশু সুন্দর কেন, জান দোস্ত্? কারণ তার মধ্যে একটি অশ্রুর হ্রদ আছে। যখন তখন সে কাঁদতে পারে। মানুষ বড় হলে অসুন্দর হয় কেন জান—অশ্রুর সেই উৎস তার মধ্যে শুকিয়ে যায় ব'লে। কান্নাতে বড় আনন্দ দোস্ত্। কান্নাতে বড় আরাম। আমি কাঁদতে চাই বলেই আমার চোখে একটু অশ্রু দেখা দেয়। পথে যেতে যেতে তরু দেখি, আমি বলি, ওগো বৃক্ষ আমার অশ্রুর প্রবাহ তুমি খুলে দাও। ঊর্ধ্বে আকাশ দেখি, আমি বলি, হে আকাশ তোমার নীলবেদনা আমাকে দিয়ে আমার অশ্রু ঝরাও। আমি যদি অশ্রুর প্রবাহে ভাসতে পারি তবেই তো সাগরে গিয়ে পৌঁছুবো গো।

বুরহান দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ঃ হায়! ভূষণ অনেক দূর চলে গিয়েছে, তাকে আর

পাওয়া যাবে না। চমনলাল আর রিহান যদি গেছে দোজাখের অগ্নিকুণ্ডে, ভূষণ গিয়েছে নীল স্নিগ্ধতায়। ওরা পুড়ে ছাই হবে। ভূষণ আসমানের নীলে একাত্ম হয়ে হারিয়ে যাবে। কাউকে আর পাওয়া যাবে না। দক্ষল দরওয়াজাতে সেই সম্মিলিত কয়েকটি আনন্দধ্বনি আর কেউ কখনো শুনবে না।

সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছিল।

রাত্রিটা ভাল করে ঘুমাতে পারেনি বুরহান। কি এক বিষণ্ন বেদনা তার মনের উপর জমে ছিল। গৌড় তখনো চঞ্চল, কর্মমুখর। তখনো সে মোহিনী নটীর বিলোল কটাক্ষে তাকিয়ে আছে মানুষের দিকে। কিন্তু সেই উৎসবমুখর গৌড়ের মধ্যেও বুরহানের কেমন বেদনা অনুভব হ'ল।

পরদিন ঘুম ভেঙে সে আর একবার চেষ্টা করল রিহানকে ফেরাবার জন্য। রিহানের বৈঠকখানায় গিয়ে উপস্থিত হল। সেদিন রিহান তখনো বাইরে আসেনি। আনন্দ-আঘাতের দ্বন্দ্বে কাল সমস্ত রাত দুলেছে রিহান। আসমানের সান্নিধ্যের আনন্দ, তার প্রত্যাখ্যানের বেদনা। কিন্তু তবু তার মধ্যে একটা আশা প্রবল হয়েছে। পণ্ডিত তাকে বলেছেন, তুমি পাবে। সেই সমস্ত কিছু গতরাত্রে এক বিরাট উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে। সে ঘুমাতে পারেনি। সকাল বেলাতেও সে স্বপ্ন দেখছিল গত সন্ধ্যার।

সে বসে বসে ভাবছিল, এমন সময় বান্দা এসে জানাল ঃ মেহেরবান, জনাব বুরহানুদ্দিন আপনার জন্যে বসে আছেন।

বীণার তারটা যেন ছিঁড়ে গেল রিহানের। সে বিরক্ত হ'ল। বুরহান! কেন? আবার সেই উপদেশ দেবার জন্য? কেন, হঠাৎ রিহানের জন্য তার এত মাথাব্যথা কেন? গৌড় থেকে তাকে সরিয়ে দেবার এত চেষ্টা কেন তার? রিহান গৌড় থেকে চলে গেলে কি তার কোন সুবিধে হবে? আসমানের উপর কি তারো নজর পড়েছে? মানুষ চিনতে তার বাকী নেই। সুন্দরী ললনাকে দেখে কে না ভোলে? তাকে কে পেতে না চায়? ভূষণের মত ভিখারীও যদি চাঁদের স্বপ্ন দেখতে পারে তবে বুরহানের আর দোষ কি। কিন্তু আজ যদি কোন অযাচিত উপদেশ দিতে আসে সে তাহলে রূঢ় কথা শোনাতে বাধ্য হবে রিহান। একটু বিরক্তি নিয়ে সে বাইরে এল।

বুরহান আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখল রিহানের। ডাকল ঃ এস, বোস দোস্ত্।

গম্ভীর হয়ে রিহান বসল।

বুরহান বলে ঃ কাল কোথায় ছিলে দোস্ত্? তোমার দেখা পেলুম না? দক্ষল দরওয়াজাতে অনেক আশা নিয়ে বসে ছিলুম।

রিহান বলল ঃ একটু বাইরে গিয়েছিলুম।

—কেন?

—প্রয়োজনে।

বুরহানের দুটো চোখ যেন জ্বল জ্বল করে উঠল—তাহলে কি রিহান বাইরে যাবে বলেই ঠিক করেছে? মেহেরবান আল্লা! তাই কর খোদা। সে বলল ঃ কেন দোস্ত্? তাহলে বাইরে যাওয়া ঠিক করলে?

একটা বিদ্রূপের দৃষ্টি নিয়ে রিহান তাকাল বুরহানের দিকে। মনে হল একটি কঠিন কথা বলে—"তাতে তোমার সুবিধে হবে?" কিন্তু অতটা রুক্ষ হতে পারল না, কারণ তাকে চটানো চলে না। অনেক গোপন কথা সে বুরহানকে বলে ফেলেছে। শুধু বলল: না।

যেন হতাশায় ভেঙে পড়ল বুরহান: না! কিন্তু দোস্ত্....

একটু বিরক্তির ভাব এবার ফুটেই উঠল রিহানের কণ্ঠে: না, না, আমি যাব না গৌড় ছেড়ে। বুরহান, তুমি আমাকে বোল না।

বুরহান একটু আঘাত পেল। বলল: না আর বলব না দোস্ত্। আল্লা তোমাকে রক্ষা করুন। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর আর কোন কথা না বলে বাইরে চলে গেল।

রিহান একটুও দুঃখ পেল বলে মনে হল না। যেন সে খুশীই হল। সে একটু নিরিবিলি থাকতে চায় এখন। মনের সঙ্গে তার অনেক কথা।

বুরহান বেরিয়ে দক্ষল দরওয়াজার দিকেই চলল—দক্ষল দরওয়াজার আকাশ যদি তাকে একটু শান্তি দিতে পারে, বাতাস যদি তাকে একটু স্নিগ্ধ করতে পারে।

অপর পক্ষে ভূষণ চলল পশ্চিম গড়ের দিকে। কেন, আসমানের সঙ্গে দেখা করতে কি? মনে হল না। কারণ সে যেভাবে পথ চলছিল তাতে মনে হল না কোন দিকে লক্ষ্য তার ছিল। পথের যে দিকেই তাকায় তার চোখে অশ্রুর আবেগ আসে, অশ্রু ঝরে। সমস্ত কিছুর মধ্যে কি এক অসীম প্রেমের সে স্বাদ অনুভব করে আর কাঁদে। এমনি ভাবে চলতে চলতে সে গিয়ে উপস্থিত হল আসমানের ঘরের কাছে।

আজ বড় স্থির, বড় স্নিগ্ধ আসমানের দুটি আযত চোখ। সে তাকিয়ে দেখল: আসছে তার কবি। তার চোখে দরবিগলিত ধারা।

সেই অশ্রুসিক্ত চোখেই ভূষণ তাকাল আসমানের দিকে।

আসমান ডাকল: হে বন্ধু এস।

ভূষণ শুধু স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—কি দেখছ কবি?

—অশ্রুসাগর। আসমান, অশ্রুর বন্যা যে তোমার চোখে ছল ছল করছে! তুমি কাঁদ। আসমান তুমি আমার মধ্যে অশ্রুর আবেগ দিয়েছ। কী শান্তি, কী শান্তি আমি পেয়েছি। আসমান, কী ভাল লাগছে আজকে তোমায়। তুমি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছ। কী তোমার অনন্ত ব্যাপ্তি! কি শুভক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল!

আসমান বলল: কবি, কোন্ শুভ মুহূর্তে তুমি আমার চোখের সম্মুখে ধরা দিয়েছিলে। কি ভেবেছিলুম, কি হল। তোমার চোখের মধ্য দিয়ে কী অসীমের স্বাদ পেলাম। আমি যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। কবি, কখনো কি এমন হয়? কেউ কি শুনেছে?

ভূষণ বলল: কখনো হয়, কখনো কেউ শোনে! তার বাণী যে বিশ্বের সর্বত্র উদাত্ত ধ্বনিতেই প্রচারিত হচ্ছে। তার উপস্থিতি যে জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, সর্বত্র। কেউ তা দেখে। চিতাগ্নি দেখে গৃহি সন্ন্যাসী হয়। আবার রমণীর কটাক্ষপাতে সন্ন্যাসী

ধর্মত্যাগ করে। রমণী-বিলাসীর চোখের মধ্যেই যে কেউ মুক্তির আলোক দেখতে পাবে না একথা কি বলা যায়?

আসমান বলল: অমন বোলো না, অমন বোলো না। তুমি কখনো রমণীবিলাসী ছিলে না। পরম রমণীয়ের বিলাস তোমার। তাই তো তোমাকে ভুলাতে গিয়ে আমি হেরে গেলাম। সরোবরের পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে থমকে দাঁড়ালুম আমি।

—আবার তোমার মধ্যে আমার প্রতিবিম্বকে দেখে আমি নিজেকে চিনলুম। আসমান আজকে আমার এত ভাল লাগছে কেন?

—তুমি যে মধুরের সন্ধান পেয়েছ।

ভূষণ বলল: তা জানি না। কিন্তু এক বিস্ময়ের সন্ধান পেয়েছি। শুধু নিজেকে কেন দীন হতে দীনতর বলে ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে। আর নিজের দীনতায় চোখে জল আসতে চাইছে। তাতেই এত ভাল লাগছে।

আসমান জিজ্ঞেস করল: প্রভু তোমায় কিছু বললেন না?

—হ্যাঁ, বললেন।

—কি বললেন?

—বললেন ভূষণ তোমার উপর সেবার নির্দেশ এসেছে। জীবে সেবা কর, এই প্রভুর নির্দেশ। কিন্তু আমি আজ শুধু জীব নয়, অজীবের মধ্যেও আমার চাইতে শ্রেষ্ঠের সন্ধান পাচ্ছি, আর সবার কাছে মাথা নত করে বলছি—'ওগো আমার সেবা নাও তোমরা।'

ভূষণের কাতর ভাব দেখে আসমানের চোখে জল এল। সে বলল: আর প্রভু আমার কথা কিছু বললেন না?

—বললেন।

—কি বললেন?

—বললেন ও যে পরম সেবিকা। আর্ত বিশ্বসংসার আসছে ওর কাছে সেবা পেয়ে ধন্য হবার জন্য।

আসমান বলল: ভূষণ, আজ আমারও মনে হচ্ছে দীন হতে দীন হয়ে যাই। আমার চোখেও অশ্রু ঝরুক।

অশ্রুসিক্ত চোখে ভূষণ আর আসমান দুজনে দুজনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর ভূষণ বলল: যাই।

আসমান বলল: আমার কাছ থেকে কি তুমি দূরে যেতে পার! আমি-তুমি যে এক! আমরা একটি পুষ্পশাখায় দুটি ফুল একই পূজার জন্য সৃষ্টি হয়েছি। তুমি এস।

—আসি তবে।

—এস

ভূষণ আবার হাঁটতে লাগল। গুপ্ত বৃন্দাবন তাকে ডাকছে। সেখানে প্রভু পরমানন্দ গ্রহণ করেছেন আসমানের দীন দান। ধর্মশালা তৈরী হচ্ছে। শ্রমিক খাটবে। তাদের শ্রম লাঘব করতে হবে, তৃষ্ণায় জল দিতে হবে। সেবার অধিকার যে তার হাতের কাছে

এসে গেছে। আবার সে হাঁটতে হাঁটতে চলল দক্ষল দরওয়াজার দিকে। যেন সে হাঁটছে না—কে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে চলতে চলতে সে দক্ষল দরওয়াজার কাছে এসে উপস্থি হল।

বুরহান অনেক আগেই সেই দক্ষল দরওয়াজার কাছে বসে ছিল। বড় ব্যথা পেয়েছে সে আজ। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলছিল: হে আসমান! তুমি আমাকে শান্তি দাও। আমার মনের মধ্যে তোমার গভীর প্রভাব বিস্তার কর। তোমার অসীম নীলিমায় আমার নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে ডুবিয়ে দাও। যদি ব্যথা পেযে থাকি তবে সেই দুঃখ তোমার নীলবেদনার মত মহত্ত্বর হোক।

যে মুহূর্তে সে এই প্রার্থনা জানাচ্ছিল আকাশকে লক্ষ্য করে সেই মুহূর্তে ভূষণ যাচ্ছিল দক্ষল দবওয়াজা দিয়ে। বুরহান লক্ষ্য করে দেখল সেই অশ্রুবিগলিত ধারা নিয়েই সে চলেছে। নরের পৌরুষ নয়, নারীর কমনীয়তা নয়, শিশুর সারল্যে ভরে আছে সে মুখ। সেই মুহূর্তে পাশাপাশি রিহানের মুখখানিও তার চোখের উপর ভেসে উঠল। রৌদ্রদগ্ধ, কর্কশ। সে মুখ যেন পুড়ছে।

ভূষণকে ডেকে ফিরালো না বুরহান। ওকে ডেকে ফেরানো যায় না। প্রকৃতির আহ্বানে সে আজ ব্যাকুল। গৌড় ছেড়ে সে বাইরে যাচ্ছে অর্থাৎ নীচতা ছেড়ে সে যাচ্ছে উদার জীবনের দিকে। অপরপক্ষে রিহান আর চমনলাল? ওরা ঢুকেছে গৌড়ে।

দক্ষল দরওযাজার উপর ভূষণের এক দিনের কথা মনে পড়ে বুরহানের!

বিরাট কৌতূহল নিয়ে সে রাস্তাটাকে বিচার করেছিল। রাস্তাটা গৌড় থেকে বাইরে গিযেছে না বাইরে থেকে গৌড়ে এসেছে। যদি গৌড় থেকে বাইরে যায়—মুক্তি, যদি বাইরে থেকে গৌড়ে আসে— বন্ধন। কথাটা সত্যি। গৌড়ে এসেছে রিহান আর চমনলাল ওরা বন্দী। বাইরে চলেছে ভূষণ সে মুক্ত। রাস্তাটায় মহান আল্লার দুনিয়ার মুক্তি এবং এবং বন্ধন দুইই আছে। নিজের বুকের উপর তিনি মানব সন্তানদের ছেড়ে দিয়েছেন। যাও, যে দিকে খুশী যাও। মুক্তি এবং বন্ধন তোমার কাছে।

ভূষণ চলে গেল। বুরহান সেই দিকে তাকিয়ে থাকল।

ক্রন্দনের মধ্যে বিরাট শান্তি আছে, সত্যই শান্তি আছে।

উনিশ

"For what wears out the life of mortal men?
'Tis that from change to change their being rolls"

—*Matthew Arnold*

"যদি মানুষবন্ধু চলে যায় আকাশকে বন্ধু করো। যদি স্নেহের স্পর্শ হারিয়ে যায় তবে বাতাসের স্পর্শ নিও। প্রিয়ার মুখচন্দ্রিকা হারালে সরোবরের কমল কলি কি নেই? তুমি

তাই দেখ।" কে লিখেছিল এ কবিতা? বুরহান মনে করতে পারল না। কিন্তু মর্মার্থ সে গ্রহণ করেছে। সে আজ প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। তার সমস্ত বন্ধুবান্ধবই আজ হয় দূরে গেছে নয় হারিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতি আছে। দক্ষল দরওয়াজার কাছে শুধুমাত্র রিহান, জালাল, ভূষণ আর চমনলালই তো ছিল না—ছিল আকাশ, বাতাস, পরিখার স্থির জলে কমলকলি, শ্যাম তৃণাস্তরণ আর সবুজ বৃক্ষশীর্ষ। ওরা চলে গেছে কিন্তু এরা আছে। বুরহান সেই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকল। সন্ধ্যার মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। তার দেহে যেন স্নেহের করস্পর্শ পড়তে লাগল। আত্মবিভোরভাবে সে কিছুকাল বসে থাকল।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চমকে তাকাল।

কে যেন ডাকছেঃ এই যে জনাব আপনি একা?

বুরহান দেখল আলাউদ্দিন। সে ডাকল তাকেঃ এই যে এস, বোস।

আলাউদ্দিন সসঙ্কোচে গিযে ববহানেব পাশে গিয়ে বসল। বুরহানকে সে চেনে। তাদের দলশুদ্ধো সবাইকে সে চেনে। এদের সে বড় শ্রদ্ধা করে চলে। বুরহান কিন্তু আলাউদ্দিনকে পাশে বসিয়ে হঠাৎ অন্য কথা ভাবল। পৃথিবীতে কিছুই শূন্য পড়ে থাকে না। পুরানো পাতার কোলে নতুন পত্রোদ্গম হয়। দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়িটাও শূন্য পড়ে থাকবে না। নতুন বুরহান, নতুন রিহান, নতুন চমনলাল আসবেই।

কালের গতি কাউকে মনে করে বসে থাকে না। কারো জন্য তার অনুশোচনাও হবে না। শুধু সেই কালপ্রবাহে এক সঙ্গে যে কয়টি বদ্‌বুদ উঠেছিল তাদের মধ্যে সবশেষে যে মিলিয়ে যাবে, সেই অন্যান্যদের সান্নিধ্য বর্জিত হয়ে ক্ষণকালের জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে। যে কালের বুকে এই বুদ্‌বুদ উঠবে সেই কাল হযতো সেই বেদনার কথা জানতেও পারবে না। দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়ি শূন্য থাকবে না। সেই আনন্দ, আবার সেই দুঃখ। দুঃখ এই কারণে যে, বুরহান এর মধ্যে থাকবে না। আজ যে নবাগন্তুক আলাউদ্দিন, কাল তার সঙ্গে আর একজন সঙ্গী আসবে। বুরহান কি তাদের সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন করতে পারবে? না, পারবে না। সে আগের স্রোতের ঢেউ, পেছনের স্রোতের ঢেউকে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পারে শুধু, হাত বাড়িয়ে ধরা সম্ভব হবে না। দেখতে হয় তো সে পাবে, কিন্তু অন্তরের যোগ স্থাপন আর সম্ভব হবে না।

বুরহানকে চুপ করে থাকতে দেখে আলাউদ্দিন আবার জিজ্ঞাসা করলঃ জনাব একা কেন?

বুরহান বললঃ ভাই, জীবনসমুদ্রে কর্মের ঢেউ। সেই তরঙ্গে কি সবসময় একত্র থাকা সম্ভব হয়? হয় না। প্রত্যেকেই যে যার কাজে বেরিয়েছে। জান তো জালাল আজ ত্রিহুতে।

—জানি জনাব। কিন্তু মালিক রিহানুদ্দিন? তিনি কি আবার বাইরে গেছেন নাকি?

বুরহান বললঃ না যাননি, হয় তো যাবেন। ব্যবসায়ীদের জীবনে এতটুকু অবসর নেই জান তো। সবসময় তাদের কাছে পাওয়া কষ্ট।

আলাউদ্দিন বললঃ তা ঠিক। কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে আপনাদের এখানে

চিরকাল একত্র দেখে আসছি কি না। একদিন এখানে আপনাদের না দেখলে মনে হয় কিসের একটা ব্যতিক্রম যেন। ঠিক দক্ষল দরওয়াজাটা আমাদের চোখের কাছে পূর্ণ হয়ে ওঠে না।

বুরহান বলল ঃ কিন্তু এই ব্যতিক্রম দুদিনেই সহ্য হযে আসবে। অনেকটাই অভ্যাস, বুঝলে! দুদিন যখন দেখবে সেই পুরানো দলটি আর রোজ এসে দক্ষল দরওযাজার সিঁড়িতে বসে আসর জমাচ্ছে না, চোখ সওয়া হযে যাবে। তারপর একদিন আর তাদের কথা মনেই থাকবে না।

আলাউদ্দিন বলল ঃ না জনাব, আমরা যারা এতকাল আপনাদের দেখে আসছি, তারা কখনও ভুলব না আপনাদের।

বুরহান বলল ঃ বুঝলে আলাউদ্দিন, এটা তোমার আবেগের কথা, সত্য নয়। কাবণ এটা দুনিয়ার নিয়ম। ঝরা পাতার দুঃখ যদি বৃক্ষ চিরকাল স্মরণ করে রাখতো তবে পুবানো পাতাব কোষে নতুন পাতা আর গজাতো না। বৃক্ষশীর্ষে এতদিন পত্র দেখতে না পেয়ে আমরা শুধু অশ্রুবিন্দু দেখতুম। তাহলে বিশ্বদুনিয়া শুধু কান্নার বেগেই ভেসে যেত। ভুলে যাওযাটা এই সৃষ্টির নিয়ম। নতুন সৃষ্টি হবে বলেই এই নিয়ম। পুরানোকে না ভুলতে পারলে নতুন সৃষ্টি সম্ভব হোত না।

এই দুনিয়ার কাছে আমরা কতগুলো গল্পকথার কেতাব মাত্র। পড়া শেষ হলে আর তার জন্য কোন আগ্রহ থাকে না। যে কেতাব ভাল লাগে কিছু দিন তার সুর মনের মধ্যে বাজতে থাকে, তারপর সে সুরও নতুন সুরের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। দু একটি কেতাব আছে যার কথা ভোলা যায় না। যেমন কোরাণ, হাফিজ, ওমর, ফিরদৌসী, হিন্দুদের বামায়ণ, মহাভারত। মানুষের মধ্যেও তেমনি দু একটি মানুষ আছে যাদের কথা লোকে ভোলে না, তারাই মহাপুরুষ। নইলে আর সবাই সস্তাদরের গল্পের কেতাব। একটুখানি পড়, একটুখানিই তার আবেগ, অত্যন্ত কম ও অত্যন্ত সীমিত।

আলাউদ্দিন বলল ঃ জনাব আপনি অনেক এলেমদার ব্যক্তি, আমি জানি আপনার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করা ধৃষ্টতা।

বুরহান বলল ঃ দেখ আলাউদ্দিন, এসব কেতাবের কথা নয়, অনুভূতির কথা। কোনদিন নির্জনে যদি কোথাও মুক্ত পরিবেশে বসতে পার, কিম্বা অন্ধকার রাতে একা নিজের মনের মধ্যে তাকাও, তাহলে এমন অনেক সত্য তুমি জানতে পারবে।

আলাউদ্দিন বলল ঃ আল্লার মেহেরবানী না হলে সকলের মধ্যে সেই অনুভব আসে না জনাব।

বুরহান বলল ঃ আল্লার মেহেরবানী সবার উপরই আছে আলাউদ্দিন। কিন্তু আমরা তাঁর দয়াকে বুঝতে পারি না। আল্লা অনেকটা এই পথের মতন জান আলাউদ্দিন।

ভূষণের সেই কথাটা কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছে না বুরহান। দক্ষল দরওয়াজার পাশে বসে আবার সেই কথাটা মনে পড়ল তার।

আলাউদ্দিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ কি রকম জনাব?

বুরহান প্রশ্ন করল ঃ আচ্ছা তুমি বলতো এই পথটা গৌড়ে এসেছে, না গৌড়ে থেকে বাইরে গিয়েছে?

—সে কথা তো বলা শক্ত জনাব। যিনি এই পথ তৈরী করেছেন তিনি ছাড়া আর কে বলতে পারবেন?

বুরহান বলল: এই পথের একদিকে গৌড়, আর একদিকে শুধু পথ আর পথ। কোন যাত্রী এই পথে গৌড়ে আসে, কেউ বা গৌড় থেকে বাইরে যায়। সেটা নিশ্চয়ই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে?

—তা করে জনাব।

—ধর গৌড় বন্ধন, আর বাহির মুক্তি—

—তা হবে কেন জনাব?

বুরহান বলল: প্রকৃতপক্ষে তাইই তো। গৌড় ঐশ্বর্য্য দিয়ে, মোহ দিয়ে, উন্মাদনা দিয়ে মানুষকে আটকে রেখেছে। কিন্তু এপথ ধরে যে পথের সীমা খুঁজবার জন্য বাইরে গিয়েছে সে-ই পেয়েছে মুক্তি। তাহলে দেখ একই পথের উপর রয়েছে মুক্তি আর বন্ধন। মানুষ বেছে নিতে পারছে না। আল্লার মেহেরবানী আর শাস্তি দুইই ছড়িযে আছে। আমরা যে যেমন নিই।

আলাউদ্দিন বলল: অত গভীরে যাবার ক্ষমতা আমার নেই জনাব। আমি অত ভাবতে পারিনে।

বুরহান বলল: তোমাদের মত বয়েস যখন ছিল তখন আমরাও ভাবতে পারিনি। কিন্তু আজকে যেন এই সব কথা কেন মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। এই সিঁড়িতে একা বসে আমি সেইসব কথাই ভাবছিলুম আলাউদ্দিন।

আলাউদ্দিন বলল: তাই আপনাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

বুরহান বলল: তুমিও রোজ এখানে আস বুঝি?

—আজ্ঞে জনাব।

বুরহান বলল: ভাল। আসবে এখানে। এই মাটীর দেওয়ালের আড়ালে সব সময় বন্ধ হয়ে থেকো না। প্রকৃতির কাছে মাঝে মাঝে আসবে। প্রকৃতি বড় উদার। তার স্পর্শে অন্তরের জঞ্জাল অনেকটা দূর হয়ে যায়।

ওরা যখন কথা বলছিল তখন দেখা গেল আর একজন যুবক তাদের দিকে এগিয়ে এল। সদ্য যৌবন তার। আলাউদ্দিনের সমান বয়সী।

বুরহানেরও নজর পড়ল সেই দিকে। সে হেসে আলাউদ্দিনকে বলল: ঐ তোমার আর এক দোস্ত্ আসছে বোধ হয়।

আলাউদ্দিন বলল: আজ্ঞে জনাব। ওর নাম হরিহর ভট্টাচার্য্য। ছেলেটি বেশ গুণী। শিল্পী, পাথর কাটাতে ওস্তাদ। নানারকমের নক্সাও তৈরী করে।

বুরহানের মনে পড়ল ভূষণের কথা। ভূষণও একদিন এমনি করে তাদের বন্ধু হয়েছিল। ঠিক যেন একই জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

হরিহর যেন একটু দ্রুতই ছুটে এল। তাকে একটু ব্যস্ত দেখাচ্ছিল।

আলাউদ্দিন তার মুখের দিকে তাকাল: কি হল দোস্ত্?

—নহবৎখানার খবর শুনেছ তো?

—কি?

—নসরৎ খাঁও মারা গেলেন।

নামটা শুনে চমকে উঠল বুরহানঃ নসরৎ খাঁ! কোন্ নসরৎ খাঁ? সুলতানের মুতাস্‌সিব্?

একটু বিষণ্ন মুখে আলাউদ্দিন বলল ঃ আজ্ঞে জনাব।

—কি হয়েছিল তার?

আলাউদ্দিন একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাকাল তার মুখের দিকেঃ কেন, জনাব আপনি শোনেন নি?

—না তো। কি হয়েছিল তাঁর?

আলাউদ্দিন বলল ঃ শুধুমাত্র তিনি নন, নহবৎখানার কাছে অনেকেই মারা গেছেন। এক নতুন ধরনের রোগ এসেছে। হলে আর কেউ বাঁচছে না। প্রায় দশ বার জন মারা গেছে গত দুদিনে। তার মধ্যে পুরানো কোতোয়ালও আছেন।

বুরহান আশ্চর্য্য হল ঃ তাই নাকি! কিন্তু রোগ কি?

—হেকিমরা ধরতে পাচ্ছেন না। বড় হিন্দু বৈদ্যরাও কিছু ধরতে পারছেন না। বলছেন রোগটা এদেশের নয়।

বুরহান আশ্চর্য্য হয়ে বলল ঃ রোগটা এদেশে হয়েছে আর এ দেশের নয় মানে? রোগের আবার দেশ বিদেশ আছে নাকি?

আলাউদ্দিন বলল ঃ তা জানি না জনাব। তবে হেকিম সাহেব রহমতুদ্দিন বলছিলেন যে, কোন বিদেশী জাহাজে এ রোগ এসে থাকবে। গঙ্গার ঘাটে তো হরদমই বাইরের জাহাজ ভিড়ছে। এখন থেকে খুব সাবধান না হলে রোগটা ভয়াবহ হতে পারে।

বুরহান বলল ঃ নসরৎ সাহেব কতদিন অসুস্থ হয়েছিলেন?

আলাউদ্দিন বলল ঃ আজকে সকালেই। এ রোগ হলে বেশী দিন কেউ বাঁচছে না। বড় জোর দুদিন। কেউ বা একদিন। কেউ বা আরো কম। দুদিন তো মাত্র রোগ আরম্ভ হয়েছে, এর মধ্যেই কয়েকজন মারা গেলেন—তা খাঁসাহেবকে নিয়ে বারজন হবে, না হরিহর?

হরিহর কর গুণে দেখল, বলল ঃ না, তের জন।

বুরহান আশ্চর্য্য হযে বলল ঃ দুদিনে তের জন!

—আজ্ঞে জনাব।

—সেকি! এ তো আশ্চর্য্য রোগ!

বুরহানের মাথায় যেন আর এক চিন্তা ঢুকল।

বিশ

'দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যু দূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে ?'
—রবীন্দ্রনাথ।

চিন্তার স্রোতটাকে যেন রোগের সংবাদ এসে হঠাৎ ঘুরিয়ে দিল। দক্ষল দরওয়াজায় বসে বুরহানের নতুন কাজ হল সংবাদ সংগ্রহ করা। এবার সকাল এবং সন্ধ্যা দু'বেলাই। হঠাৎ আবার এ কেমন ধরনের রোগ এসে দেখা দিল গৌড়ে? পূর্ব দেশের এই স্বর্ণ নগরী গৌড়ের উপর কি কোন অভিশাপ নেমে এল? কি জানি হতেও পারে! গৌড় বেশ একটু বেশী এগিয়ে গেছে। গৌড়ের গৌরবের অন্ত নেই! গৌড়ের ঐশ্বর্য্যের অন্ত নেই। মানুষ দিনের পর দিন এখানে ঐশ্বর্য্যের অহংকারে যেন উন্মত্ত হচ্ছে। এই সৃষ্টির উর্দ্ধে যে একজন ঈশ্বর রয়েছেন, দুনিয়ার সব কিছুই তাঁর দান, একথাটা যেন মানুষ ক্রমে ভুলেই যাচ্ছে। সুখের দিনে মানুষের এটাই সব চাইতে বড় পরীক্ষা। ঈশ্বর দেখতে চান মানুষ কতটা সত্যপথের উপর দিয়ে চলতে পারে। এই সুখ যেন জলকণিকা—সূর্য্যের বহু বর্ণ এখানে প্রতিফলিত হয়। তার এমন মনভুলানো রঙের খেলা যে, তা দেখলে অনেক সময় যে সূর্য্যের রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে এই রঙ সৃষ্টি করেছে সেই সূর্য্যের কথা পর্য্যন্ত আর মনে থাকে না। আল্লা গৌড়ে ঐশ্বর্য্যের অন্ত রাখেন নি। তিনি গৌড়ে বিলাসের সরঞ্জামের অভাব রাখেন নি। মানুষ সেই রঙে লুব্ধ হয়ে বুঝি তাঁকেই ভুলে গেছে। তবে কি চরম সত্য মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নেমে আসবে আবার তাঁর কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য? তা যদি হয় মানুষের কী বিরাট পরাজয়! দুঃখের মধ্যে স্বার্থের প্রশ্নে, আল্লাহ্‌তালার কথা সবারই মনে পড়ে। সেই মনে পড়ায় কৃতিত্ব কি? তাঁর প্রতি নিঃস্বার্থ যে ভক্তি, তাইতো সত্য। কিন্তু সেই নিঃস্বার্থ ভক্তি গৌড়ের মানুষের মধ্যে আজ বড় দেখা যাচ্ছে না। কৈ বসুক তো মিলাদের আসর! মৌলভি সাহেব কোরাণ ব্যাখ্যা করুন, হিন্দু পণ্ডিতেরা ধর্ম ব্যাখ্যা করুন, কজন আসবে? কেউ আসবে না। কিন্তু মেলা বসলে? সহস্র মানুষের ভীড় হবে। হায়! বুঝি সেই কঠিন পরীক্ষার দিনই নেমে এল!

দক্ষল দরওয়াজায় সেই কথাগুলি মনে পড়ে বুক থেকে একটা দীর্ঘ শ্বাস বেরিয়ে আসে বুরহানের। একটা ব্যথাতুর দৃষ্টিতে সে বাইরে তাকায়! সবুজ বৃক্ষশ্রেণী তেমনি আছে। শ্যামল তৃণগুচ্ছ তেমনি শ্যামল। পরিখার স্থির জলে কমলকলিগুলি তেমনি ফুটে আছে। প্রকৃতিতে কিন্তু কোন ভীতির চিহ্ন নেই। ঐ বৃক্ষশীর্ষের উপর, এই শ্যামল তৃণাস্তরণের উপর কোনদিন কোন অভিশাপ নেমে আসবে না। কোন পাপের পঙ্কিল আহ্বানে এরা মুগ্ধ নয়, লুব্ধ নয়।

বুরহান এবার গড়ের দিকে তাকায়। কার যেন আশা করতে থাকে। গৌড়ের সংবাদটা জানবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব। সম্ভবত আলাউদ্দিনের অপেক্ষা করছে সে। কারণ দূরে কাকে দেখতে পেযে সে একটু চমকিত হল। দেখা গেল কে আসছে। সে আলাউদ্দিনই।

বুরহান লুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার প্রবল কৌতূহল যেন আলাউদ্দিনকে টানতে লাগল ঃ এস, এস। তাড়াতাড়ি এস।

আলাউদ্দিনও দ্রুতই আসছিল। সকালবেলায় দক্ষল দরওয়াজার নির্মল হাওয়া খেতে যেন সে আসছে না।

আলাউদ্দিন এসে দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল। বুরহানকে সেও দেখতে পেয়েছিল। বুরহানকে সে একা দেখতে পেল, বলল ঃ এই যে জনাব, আপনি আজও একা ?

বুরহান বলল ঃ হ্যাঁ ভাই, কোন লোভে তো আমি জড়িয়ে পড়তে পারি নি। আল্লাহ্-তালা আমাকে তেমন কোন কর্মের উন্মাদনার মধ্যেও রাখেন নি। তাই একা। কিন্তু একা থাকা বড় যন্ত্রণাদায়ক। একা থাকলে মনের দরওয়াজাতে সহস্র কল্পনা এসে ভীড় করে। সহস্র জিজ্ঞাসা যেন সৈনিকের হাতে উদ্যত বর্শার মত এসে দাঁড়ায়। তাদের প্রশ্নে যেন ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাই। কিন্তু কি খবর আলাউদ্দিন ? নতুন কোন সংবাদ পেলে ?

আলাউদ্দিন বলল ঃ হ্যাঁ জনাব, রোগটা যেন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। শুনেছি নহবৎখানার কাছে আরো ছ'জন কাল মারা গেল।

—আঁ. . . কি !

—হ্যাঁ জনাব।

— রোগটা ও'হলে হেকিমেরা কেউ ধরতে পারছেন না ?

—না। কিন্তু বড় হেকিম ফরাদুদ্দিন সাহেব বলেছেন যে একটু সাবধানে চললে খুব বেশী ছড়িয়ে পড়বে না এ রোগ।

বুরহান বলল ঃ আল্লা করেন তা যেন হয়! আচ্ছা, সুলতান এ রোগের সংবাদ শুনেছেন ?

আলাউদ্দিন বলল ঃ সম্ভবত নয়। শুনেছি তিনি আসাম আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন। আসমিয়ারা নাকি আবার বিদ্রোহ করেছে। দিল্লী থেকেও কে এসেছেন। সুলতান এখন তাই নিয়ে ব্যস্ত।

বুরহান বলল ঃ কিন্তু সরকারের দৃষ্টি যাওয়া উচিত এই দিকে।

আলাউদ্দিন বলল ঃ যুদ্ধ রয়েছে, বিগ্রহ রয়েছে, এদিকে সুলতান দৃষ্টি দেবেন কখন ?

ও.ন একটু ম্লান হাসল বুরহান। বলল ঃ যুদ্ধটার মূল অর্থই আমরা বুঝি না। যুদ্ধটা কার বিরুদ্ধে ! শত্রুর বিরুদ্ধে, এই তো ? এই শত্রু কে ?

এই শত্রু রোগ। বাইরে ঢাল তলোয়ার ধরলে কি হবে, যদি না ভেতরের এই শত্রুকে পরাজিত করা যায় ? এই রোগেরই বহু রূপ ঃ লোভ, মোহ, হিংসা, দ্বেষ। এই শত্রুকে যদি নাশ করা না যায় যুদ্ধ কোনদিন থামবে না। আসল শত্রুকে মানুষ চেনে না বলেই চিরকাল যুদ্ধ করে চলেছে। সেই আদিমকাল থেকে আজপর্য্যন্ত যুদ্ধ কম হল ? কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হল না। এবার বোধ হয়......সেই রোগের সম্পর্কেই বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল বুরহান। কিন্তু কোন অমঙ্গলসূচক কথা বলতে গিয়ে তার জিব দিয়ে বেরুল না। তার মন তাকে নিবৃত্ত করল। বলল ঃ থাক্, থাক্। এমন চরম সত্যের সম্মুখীন মানুষ না হোক।

বুরহান দরওয়াজার দিকে তাকিয়ে কি ভাববার চেষ্টা করল। হঠাৎ সে দেখল মৌলভি

নাসিরুদ্দিন সাহেব সেই দিকে আসছেন। বয়েস হয়েছে নাসিরুদ্দিন সাহেবের। বড় সৌম্য মূর্তি। ধার্মিক তিনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মের সত্যিকারের দিকটার প্রতি তাঁর আকর্ষণ। তাই অনেক সময় তিনি সত্যি কথা বলে ফেলেন। তাঁর অনুরাগী চেলা চামুণ্ডা তাই কম আছে। এমন কি তাঁর সেই নিরাভরণ সত্যপ্রকাশের জন্য সুলতানের কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর উপর কেউ সন্তুষ্ট নন। তাই তিনি মৌলভি সাহেব হয়েও দরিদ্র। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর মুখের স্মিত হাসি কেড়ে নিতে পারে নি। হয় তো এমন এক ঐশ্বর্য্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন যার কাছে বাস্তব ভ্রান্তি তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই গঞ্জনাতে ক্ষোভ নেই তাঁর। মুখে সর্বদা মধুর হাসি।

অনেক লোকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন না এ কথা বুরহান জানে, কিন্তু বুরহান নিজে তাঁকে বড় শ্রদ্ধা করে। জালালও করত।

মৌলভি দরওয়াজার কাছে আসতে বুরহান উঠে দাঁড়ালো ঃ এই যে আসুন, আসুন মৌলভি সাহেব! হঠাৎ আপনি এই দক্ষল দরওয়াজায়?

মৌলভি হেসে বললেন ঃ না বাচ্চা, আমি একটু আদিনাতে যাব। আদিনার মসজিদে এসেছেন এক এলেমদার ব্যক্তি—মৌলভি হেদায়েতুল্লা। বড় মুযাজ্জীন লোক। যাই একটু পুণ্য সঞ্চয় করে আসি।

বুরহান বলল ঃ কিন্তু হেঁটে হেঁটে আসছেন কেন? গাড়ী কৈ?

মৌলভি বললেন ঃ গাড়ী কোথায় পাব রে বাচ্চা? হেঁটেই চলেছি। আল্লাহ্‌তালা নিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই?

বুরহান বলল ঃ না মৌলভি সাহেব, আপনি অন্তত একটি এক্কা নিন। আমি এক্কা করে দিচ্ছি।

অত্যন্ত বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন মৌলভি সাহেব ঃ না বাচ্চা আমি এমনিতেই যেতে পারব।

বুরহান বুঝল বাধাটা কোথায়। দান গ্রহণ করতে তিনি রাজি নন।

বুবহান তাঁকে বলল ঃ মৌলভি সাহেব, আপনি এতে কিছু ভাববেন না। আমার কি সাধ্য আছে আমি আপনাকে এক্কা করে দেব। সবই খুদার ইচ্ছা। আমি খুদার একজন বান্দা বইতো নয়। খুদাই এ ব্যবস্থা করছেন। আপনি আর না করবেন না।

বুরহান আলাউদ্দিনের দিকে তাকাল ঃ একটা এক্কা ডেকে দাও না ভাই।

—দিচ্ছি জনাব, আলাউদ্দিন দক্ষল দরওয়াজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

বুরহান সিঁড়ি দেখিয়ে মৌলভি সাহেবকে বলল ঃ বসুন মেহেরবান!

বৃদ্ধ মৌলভি বসলেন।

বুরহানের মধ্যে তখন একটি বিরাট প্রশ্ন অনিবার্য্য কৌতূহলে ঘুরে ফিরে মরছে। মুয়াজ্জিন ব্যক্তি মৌলভি সাহেব। তার মুখের কথার একটা মূল্য আছে। এই নতুন রোগটা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না? সে মৌলভির দিকে ফিরে তাকাল।

—শুনেছেন জনাব?

মুখ তুলে তাকালেন মৌলভি ঃ কি বাচ্চা?

—নহবৎখানার কাছে এক নতুন রোগ দেখা দিয়েছে। দুদিনে প্রায় জনা বিশেক লোক মারা গেছে। হেকিমেরা রোগ ঠাওরে উঠতে পাচ্ছেন না।

—তাই নাকি? আহা! আল্লা রহমান! যেন মৃতের দিকে তাকান তিনি। রোজকেয়ামতের দিনে যেন সুবিচার পায় ওরা!

বুরহান বলল: মৌলভি সাহেব, রোগটার কথা শুনে বড ভয় পাচ্ছি, কোন ক্ষতি হবে না তো গৌড়ের?

মৌলভি সাহেব বললেন: ভয় পাচ্ছ কেন বাচ্চা, আল্লাহতালার উপর বিশ্বাস রাখ। তিনি যে শুধুই মঙ্গল করেন। ভয় কি?

এইটুকু অভয় বাণীই মৌলভির মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিল বুরহান। এইটুকুতেই তার অন্তর অনেকটা শান্ত হল।

দেখতে দেখতে একটা এক্কা নিয়ে এল আলাউদ্দিন। বৃদ্ধ মৌলভি সেই এক্কায় গিয়ে উঠলেন। বুরহানকে বললেন: আল্লাহ্‌তালার প্রতি তোমার ভক্তি আছে। খুদা তোমার মঙ্গল করুন!

গাড়ী চলল।

বুরহান সেই গাডীর দিকে তাকিয়ে থাকল। গৌড়ের মাটীর দেওয়ালের বন্ধন ত্যাগ করে সে গাড়ী বাইরে যাচ্ছে। গাড়ী যাচ্ছে আদিনাতে। কিন্তু আদিনার আদি নেই, অন্তও নেই। বুরহানের মনে হল এ গাড়ী সেই অনন্তের দিকে চলেছে। সবার কাছেই এই দক্ষল দরওয়াজার পথটা গৌডে আসেনি। কারো কারো কাছে এ পথটা গৌড় থেকে বাইরে গেছে। মৌলভি সাহেবও তাদের মধ্যে একজন। বুরহানের ভূষণের কথা মনে পড়ল। অনন্ত পথের এক ইঙ্গিতে সেও মুগ্ধ। এই পথ তাদের যে দূরদেশের ইঙ্গিত দিয়েছে সেখানে কোন আশ্চর্য্য রোগের প্রাদুর্ভাব নেই। কামনায় কম্পমান নয় সেখানে কোন পথযাত্রীর দেহ, মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত নয়। ভয়টা যারা স্থির তাদেরই ঘিরে ধরে, যারা চলমান তাদের ঘিরতে পারে না। সেখানে বুঝি মৃত্যুভয় নেই।

গৌড় সেই স্থির নগরী, এখানে বিশ্রামের স্থান। কিন্তু অনন্ত বিশ্রামের নয়। অনন্ত বিশ্রাম আর অনন্তগতি একই জিনিষ। সেখানে গতি এবং স্থিতি এক। সুতরাং সেখানে যা জীবন তাই মৃত্যু। মৃত্যু শুধু এই সাময়িক বিশ্রামের ক্ষেত্রে। গৌডে সেই মৃত্যুর করাল ছায়া পড়েছে।

কিন্তু সেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় আছে। মৌলভি সাহেব তার নির্মল পবিত্র মুখে সেই কথা কয়টিই অন্তরঙ্গ বিশ্বাসে বলে গেলেন। সে উপায় খুদাতালার উপর বিশ্বাস স্থাপন। বুরহানের তাই একটু ভাল লাগল।

মৌলভি সাহেবকে বিদায় দিয়ে তাই সে ফেরবার জন্য পা বাড়াল। আলাউদ্দিন তখনো দাঁড়িয়ে।

বুরহান তাকে জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি এখানেই বসবে?

আলাউদ্দিন বলল: হরিহরের আসবার কথা, আমি তার জন্য একটু অপেক্ষা করব।

আলাউদ্দিনের মুখখানা একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল বুরহান। একটা স্বপ্ন আছে।

এই স্বপ্ন গৌড়ের দক্ষল দরওয়াজায় একদিন তাদের সব কয়টি বন্ধুর চোখেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ লোভের কুশ্রী আক্রমণে অনেকের চোখ থেকে সেই স্বপ্নের লাবণ্যটা দূরে সরে গিয়েছে যেন। আবার কারো বা চোখে সেই স্বপ্নের লাবণ্য ঐশ্বরিক দীপ্তিতে ভরে উঠেছে। সে সেই বেহেস্তের অনুপম করুণা লাভ করেছে।

বুরহান নিজের মনে মনে বলল ঃ হরিহর সেই ভূষণ হোক। আর আলাউদ্দিন যে অপেক্ষার কথা বলল, সে অপেক্ষাটা যেন শুভ কিছুর জন্য হয়।

মানুষের অপেক্ষার মুখে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে, শুভ এবং অশুভ দুয়েরই। কী এক দুর্বার স্রোতে সেই আবির্ভাব মানুষকে হঠাৎ ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সেই হঠাতের স্পর্শ তাদের জীবনে বিপর্যয় এনেছে। কেউ দূরে গেছে আলোর ইঙ্গিতে পেয়ে, কেউ বিপর্য্যয়ের দিকেই এক উন্মাদ নেশায় ছুটে গেছে। আলাউদ্দিনের এই আবির্ভাব যেন পরম কল্যাণময় হয়।

বুরহান দক্ষল দরওয়াজা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল।

জনস্রোত তখনও চলেছে। সমস্ত গৌড় নগরী কর্মব্যস্ত। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। প্রত্যেকেই আত্মচিন্তায় মগ্ন। গৌড়ের কোন অংশে যে মৃত্যুর কোন আক্রমণ ঘটেছে, সে কথা কারো মনের মধ্যে কোনরকম রেখাপাত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কর্মব্যস্ত মানুষেরা অন্য সমস্ত কিছু সম্পর্কে উদাসীন। অথচ নহবৎখানায় কাল অশ্রুতপূর্ব এক রোগের কথা শোনবার পর বুরহানের কী চিন্তাই না হয়েছিল। আজো কত চিন্তাই না আছে।

বুরহান ভাবল ঃ কে সুখী? যে মৃত্যুর কথা ভাবে সে-ই, না যে ভাবল না সে-ই?

সেই কথা ভাবতে ভাবতে বুরহান নিজের গৃহের কাছে এসে পৌঁছুল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করে সে বান্দাকে তলব করল। কিন্তু বান্দা না এসে বাঁদী এল। বুরহান মুখ তুলে তাকিয়ে তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কেন? রহমান কোথায়?

বাঁদী বলল ঃ জনাব, বেগম সাহেবা আপনাকে তলব করেছেন। একটু আশ্চর্য্য হল বুরহান। কখনো বেগম সাহেবা বড় একটা তার খোঁজ করেন না। সে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। এই সমস্ত মহলটার পরিচালনার ভার প্রকৃতপক্ষে তার উপর। নিতান্ত কোন গুরুতর বিষয়ে পরামর্শের জন্য প্রয়োজন না হলে সে বুরহানকে ব্যস্ত করে না। দাম্পত্য জীবনে সে অসুখী নয়। বুরহান তার কোন অভাব রাখেনি। হঠাৎ তার খোঁজ কববার প্রয়োজন হয়েছে, নিশ্চয়ই কোন একটা সমস্যা ঘটে থাকবে। সেই সমস্যাটা কি, ভেবে বুরহান একটু আশ্চর্য্য হল। বাঁদীকে বলল ঃ তুমি যাও আমি আসছি। তারপর সে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে মহলের ভেতর প্রবেশ করল।

শয়নকক্ষে বেগম তার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল।

বুরহান জিজ্ঞাসা করল ঃ কি খবর খাদিজা?

অন্দর মহলেও খাদিজা একটু আবৃত অবস্থায় চলে। এটা তার একটা সংস্কার। বড় খানদানি ঘরের মেয়ে সে। সে খুব আস্তে আস্তে বলল ঃ শেঠ চমনলালের বেগম জনাবের জন্য অপেক্ষা করছেন।

চমনলালের বেগম! একটু যেন বুকটা কেঁপে উঠল বুরহানের। ব্যাপার কি! তাহলে কি কোন বিপদে পড়েছে চমনলাল। তবে কি মালিক তাজুদ্দিনকে খুন করবার সমস্ত দায়িত্ব এসে তার ঘাড়েই পড়ছে? এক মুহূর্ত যেন বুরহান কোন কথা বলতে পারল না। সে রকম যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তার কী করবার আছে? চমনলালকে নির্দোষ জেনেও যে তাকে নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। এ এক বিরাট সমস্যা। রিহান আর চমনলাল উভয়েই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাকে সে বাঁচাবে?

সে বলল ঃ কোথায় ভাবিজান? বুরহান চমনলালের স্ত্রীকে ভাবিজান বলেই সম্বোধন করে। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বেগমকে ভাবিজান বলে ডাকে। এটা তাদের আন্তরিকতার পরিচয়।

খাদিজা বলল ঃ সে আমার ঘরেই আছে। আমি তাকে ডাকছি।

বুরহান বাইরের কেদারাটায় বসল। অভ্যন্তরে ঝালরের আড়ালে খাদিজা চমনলালের বেগমকে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

ঘোমটার আড়ালে পদ্মাবতীর (চমনের স্ত্রীর) মুখ আবৃত। কিন্তু তবু যেন কল্পনার চোখে বুরহান দেখতে পেল, ক্রন্দনাতুরা একটি রমণী শোকের ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই মুহূর্তে মনে মনে চমনলালের উপর তার রাগ হল। তাকে আরো নীচ্ আর স্বার্থপর বলে মনে হল। সে যদি নিজে কামরিপুর তাড়নায় একা এগিয়ে যেত, বুরহানের কিছু বলবার থাকতো না। কিন্তু তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে যে আর একজন জড়িত। সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন দুষ্মনটার সেকথাও মনে পড়ল না? প্রখর শাস্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু তার শাস্তিতে বিনাদোষে আর একজন শাস্তি পাবে এটাই তাকে আঘাত করতে লাগল।

বুরহান স্পষ্ট শুনতে পেল, সেই আড়ালে লুকানো অশ্রুমুখী পদ্মাবতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মুহূর্তে সে পদ্মাবতীকে 'বহিন' বলে সম্বোধন করে ফেলল। বলল ঃ বহিন, বল তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?

ক্রন্দনের আবেগে জড়িত কণ্ঠে পদ্মাবতী বলল ঃ শেঠজীর কি হবে জনাব?

কি হবে সে কথা সুলতান আর কাজি জানেন। বুরহানের পক্ষে কোন কথা বলাই কি সম্ভব? কিন্তু তবু বলতে হল। সে বলল ঃ কেঁদো না বহিন, চমনলাল মুক্তি পাবে।

পদ্মাবতী কেঁদে বলল ঃ কিন্তু শুনেছি, লোকে বলছে কাজিসাহেব তাকে ফাঁসী দেবেন?

হঠাৎ বুরহান যেন একটু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। আবেগে সে বেফাঁস কথা বলে ফেলতে গেল ঃ কেন, ফাঁসী দেবেন কেন? বিনাদোষে? চমনলাল কোন দোষ করেনি। আমি জানি কে তাজুদ্দিনকে......"

হঠাৎ তার চৈতন্য ফিরে এল। সে থামল। একি করতে যাচ্ছিল সে! যাক, তবু ভাগ্যি যে কথাটা বলে ফেলেনি। কিন্তু পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা দিতে হবে। সে বলল ঃ তুমি ভেবো না বহিন। কাজির সাধ্য নেই চমনলালের কোন ক্ষতি করে। আমরা নেই? আমরা আছি কি করতে?

পদ্মাবতী সিক্তকণ্ঠে বলল ঃ জনাব আপনি আমার ভাই। আপনি ওকে বাঁচান। আমি খেতে পাচ্ছি না, রাতে ঘুমোতে পাচ্ছি না। একটুও শান্তি পাচ্ছি না আমি।

বুরহান বলল ঃ আমি তোমাকে কথা দিলুম 'বহিন' আমি চমনলালকে মুক্ত করে আনবই।

এই স্নেহভরা আশ্বাস বাক্যে পদ্মাবতীর অশ্রুর উৎস যেন আরো ফুলে উঠল। সে আরো কাঁদতে লাগল।

বুরহান কিছুকাল চুপ করে মাথা নীচু করে থাকল। তার যেন নিজেকেই দোষী মনে হোল। আসমানতারাকে সে-ই এখানে এনেছিল। কিন্তু হায়, তার যে এই পরিণাম হবে কে জানতো!

সে পদ্মাবতীকে বলল ঃ তুমি আর কেঁদোনা। আমি বড় ব্যথা পাচ্ছি। তুমি ঘরে ফিরে যাও, আমি এখনি চমনলালের খোঁজ করতে যাচ্ছি।

তখন ক্রন্দনাতুরা পদ্মাবতীকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে খাদিজা আবার আড়ালে গেল।

নেপথ্য থেকে বুরহান শুনতে পেল, খাদিজা তাকে বলছে ঃ বহিন, তুমি ভেবোনা। তোমার ভাইজান কথা দিয়েছেন। আমি জানি তার কথার কখনো খেলাপ হয় না। শেঠজী আবার ফির আসবেন।

পদ্মাবতী বলল ঃ ভগবান্ ভাইজানের মঙ্গল করুন।

বুরহান ধীরে ধীরে আবার বৈঠকখানার পথে বেরিয়ে গেল। বৈঠকখানাতে বসে আবার কিছুক্ষণ সে ভাবল ঃ আল্লাহ্তালার দুনিয়াতে এ কেমন বিচার? একের পাপে অপরের শাস্তি কেন? চমনলাল দোষ করতে পারে, সেজন্য পদ্মাবতী কেন দুঃখ পাবে? আর তার সমস্ত জীবনটাই বা কেন নষ্ট হয়ে যাবে? কামনার আবেগে অন্ধ চমনলাল নিজে শাস্তি পেতে পারে, কিন্তু পদ্মাবতী কেন? তাহলে সেও কি কোন......না, না, না। বুরহান খুদার ফজলে মানুষ চেনে। তার কণ্ঠস্বর শুনেই কি সে বুঝতে পারেনি? খারাপ বীণার তারে মধুর সুর ফুটতে পারে না। সে পদ্মাবতীর মুখ দেখেনি। দেখলে হয় তো তার মধ্যে একটি অক্ষত প্রস্ফুটিত নিষ্পাপ গোলাপ ফুলকেই দেখতে পেত। মানুষের মুখ দেখেও তার কথা বলা যায়, যেমন ফুল দেখে বলে দেওয়া যায় এ ফুল কীটদষ্ট কি না। পদ্মাবতী কখনো অন্যায় করতে পারে না। তবে?

তাহলে কি সেই হিন্দু পণ্ডিতটার কথাই সত্য? মানুষ পূর্বজন্মের কর্মের ফল ভোগ করে এ জীবনে? মানুষের জীবনটা কর্মের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, যেমন করে উপলখণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর সঙ্গে চলে। চলতে চলতে ক্ষয়ে যেতে যেতে শেষপর্য্যন্ত তার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। কালের নদীতে আঘাতে আঘাতে চলতে চলতে শেষপর্য্যন্ত মানুষ গিয়ে সেই তীর্থে পৌঁছায়। স্রোত অনুযায়ী কখনো এগোয়, কখনো স্থির থাকে। শেষ পরিণতি, একদিন না একদিন সেই পরম মুক্তি। যাত্রা পথ দীর্ঘ, সুতরাং মুক্তি এক জন্মে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হল ওদের ভগবান কি তবে নিষ্ক্রিয়? কর্মেই যদি সব, তবে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার দরকার কি? তাহলে ভগবান অসহায় একটি অস্তিত্ব মাত্র। তাঁকে আরাধনার কোন প্রয়োজন নেই। আর সবই যদি ওই হিন্দুদের মতো দৈবের দ্বারাই পরিচালিত হয়, তবে দৈবই প্রবল, কর্মের উপর

বিশ্বাস স্থাপন করবার অর্থ নেই। মানুষের কর্ম সেখানে দৈবের ইচ্ছাতে। নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য থাকে না।

ওদের এ নীতিটা গ্রাহ্য নয় যে, কর্মও করতে হবে ভগবানেও বিশ্বাস রাখতে হবে। দৈব দিলেই হবে না, কর্মদ্বারা তাকে অর্জন করতে হবে। কিন্তু ভাগ্যে যদি থাকে, তবে তো কর্ম আপনিই আসবে। দৈব করাবে। যদি না থাকে, দৈব কর্মের প্রেরণা দেবে না।

সুতরাং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার দোহাই সেখানে ভিত্তিহীন। কর্ম থাকলে দৈব নিষ্ক্রিয়। মেনে লাভ নেই। দৈব থাকলে মানুষের স্বীয় প্রচেষ্টায় কর্মের প্রশ্ন নিরর্থক। উভয়ের সামঞ্জস্য চলে না।

বুরহান নিজে মুসলমান, আল্লাতে বিশ্বাস। খুদাতালা আছেন। সবই তাঁর মর্জিতে হয়। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনেই সব শুভ। সেই খুদাতালা পদ্মাবতীর মঙ্গল করুন। ওর যদি নিজের ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকে ও নিশ্চয়ই এই বেদনা থেকে মুক্তি পাবে।

কিন্তু তার কি করবার আছে? আল্লার উপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যেতে হবে। তারপর তিনিই মালিক। রিহানের কথা মনে পড়ল বুরহানের। আর একটা সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। চমনলাল রিহানের দোষেই আজ আটক। সে কথা রিহানকে বুঝিয়ে বলতে হবে। পদ্মাবতীর করুণ আবেদন রিহানের মধ্যে পরিবর্তনের ভাব আনতে পারে। সেই কথা মনে পড়তেই বুরহান আর দেরী করল না, রিহানের ঘরের দিকে চলল।

রিহান তখনও ছিল। এই মাত্র কয়েকদিন পর রিহানের সঙ্গে দেখা। বুরহান চমকে উঠল। একি অবস্থা রিহানের! যেন বিপর্যস্ত। জীবন থেকে সমস্ত শৃঙ্খলা তার বিদায় নিয়েছে। যেন বহুদিন অনিদ্রায় ভুগছে সে। একটা দুঃস্বপ্ন যেন তাকে পেছনে তাড়া করে চলেছে। সেই মুখ থেকে কমনীয়তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। চোখ দুটো পর্যন্ত যেন তার ঘোলাটে। দুর্দান্ত এক কামনার আবেগ তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। সেই গতির বেগে কর্দম উঠেছে মাটী থেকে। স্বচ্ছতা হারিয়ে গেছে। বুরহানকে দেখে সে খুব খুশী হল বলে মনে হল না। কয়েকটা দিন আগে হলে যে খুশীর আবেগে সে ঝল মল করে উঠতো, তার বিন্দুমাত্র রিহানের মধ্যে দেখা গেল না। শুধু না বললে নয়, তাই বলল ঃ এস।

বুরহান গিয়ে বসল। কিন্তু বুঝল রিহান অসন্তুষ্ট। যেন কোন একটা মূল্যবান জিনিষ সে চুরি করে এনে দেখছিল। বুরহান আসাতে আবার সেটা লুকিয়ে ফেলতে হল। কি হতে পারে সে জিনিসটি! নিশ্চয়ই কল্পনার চোখে আসমানতারার মুখচ্ছবি! এমনিই হয়। যখন লক্ষ্যবস্তু কামনা-কলঙ্কে দূষিত হয়, তখন তা স্বার্থপর উপভোগের বিষয় হয়ে দেখা দেয়। তা উপভোগ করে কোন স্বর্গীয় সুখে মন ভরে ওঠে না। শুধু একটা উদগ্র লোভ যন্ত্রণার স্পর্শে অস্থির চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। রিহানের মধ্যে রয়েছে সেই চাঞ্চল্য, সেই অস্থৈর্য্য। সেই উৎক্ষিপ্ত চিত্তের স্বপ্ন দেখবার প্রয়াস।

বুরহান জিজ্ঞেস করল ঃ কেমন আছ দোস্ত্?

—আছি।

—গৌড়ের খবর শুনেছ তো?

—'বল।' যেন কোন আগ্রহ নেই।

—একটা অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছে নহবৎখানার কাছে। বেশ কয়েকজন মারা গেছেন।

—হুঁ।

—আমরা ভয় করছি সেই রোগ সমগ্র গৌড় নগরীর উপর ছড়িয়ে না পড়ে।

—পড়তেও পারে।

বুরহান আবার তাকিয়ে দেখল রিহানের দিকে। মৃত্যু ভয়ও যেন তার নেই। কি করে হবে, মৃত্যুর মধ্যে যে বাস করছে তার আবার মৃত্যু কি। নিজের সত্তা হারিয়ে বসে আছে ও। হারিয়ে বসে আছে বললে ভুল হবে, এক ভ্রান্তির আবরণে নিজেকে জড়িয়ে বসে আছে। এই আবরণ থেকে মেঘমুক্তি না ঘটলে নিজের আলো আর দেখতে পাবে না। সুতরাং ওর কাছে আর অবান্তর কথা বলে কোন লাভ নেই। বুরহান তাই কাজের কথা পাড়ল: চমনলাল সম্পর্কে কিছু ভাবলে?

—আমি কি করতে পারি বল?

বুরহান বলল: কি করতে পার বা না পার সেটা প্রশ্ন নয়। কর্তব্য আছে। কিছু করবার চেষ্টা করতে হবে। কারণ চমনলাল তো আর প্রকৃতপক্ষে দোষী নয়।

রিহান চুপ করে থাকল।

বুরহান বলল: শুনেছি ওর শাস্তি হবে।

রিহান তবু চুপ করে থাকল।

—কাল পদ্মাবতী এসে বড় কেঁদেছে আমার কাছে।

রিহান তবু চুপ থাকল।

—কৈ কিছু একটা বল!

—আমার কিছু করবার নেই।

—আছে। আমরা সব বন্ধু মিলে সুলতানের কাছে আবেদন করব।

—কি আবেদন?

—বলব, চমনলাল সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমরা তাকে চিনি। সে সৎ।

—আমি ওর মধ্যে নেই।

—সে কি!

—হ্যাঁ, চমনলালকে আমার কখনো সৎ বলে মনে হয় নি। ওর যেমন আকৃতি, প্রকৃতিও তেমনি।

বুরহান বলল: আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। গ্রীসের সেই পরম জ্ঞানী সক্রেটিসের কথা তো শুনেছ? তিনি দেখতে কুৎসিৎ ছিলেন।

—তবু তিনি সৌম্য ছিলেন। আকৃতিটা তো রূপের উপর নয়, ভাবের উপর।

বুরহান বলল: তা হলে দোস্ত, নিজের প্রতিবিম্বখানি একবার দর্পণে দেখেছ কি?

—কী......?

—হ্যাঁ, তোমার দেহটা সুন্দর বটে কিন্তু প্রকৃতিতে তুমিও……অথচ দেখ ভূষণকে।

যেন চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে গেল রিহানঃ ভূষণের কথা আমাকে বোল না। সে লম্পট।

আশ্চর্য্য হয়ে তাকাল বুরহান রিহানের দিকেঃ একি বলছ তুমি!

রিহান বললঃ হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলেছি। সে চরিত্রহীন। সে লম্পট। জান সে আমাকে পর্য্যন্ত খুন করতে চায়।

—খুন্। ভূষণ!

—হ্যাঁ।

বুরহান বললঃ জানি না দোস্ত্। আমি তো আর খুদা নই। এ যদি সত্য হয় তবে বলব—আমি কিছুই দেখতে শিখিনি। ভূষণের চোখে যে দৃষ্টি দেখেছি, তাতে খুন করবার কি প্রয়োজন আছে জানি না। খুন করতে পারি আমি তুমি, যারা রোগগ্রস্ত।

রিহান যেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললঃ রোগগ্রস্ত! আমি?

—হ্যাঁ, তুমি, আমি, চমনলাল সবাই। রোগ হল লোভ, বাসনা, আকর্ষণ। ভূষণ রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

চিৎকার করে বলল রিহানঃ ভূষণ একটা মস্ত বড় কামুক, শয়তান। মেয়েছেলের মন নিয়ে খেলা করে।

—'তাই নাকি!' একটুখানি বিদ্রুপের হাসি হাসল বুরহান।

—হ্যাঁ।

—শুনি?

—আসমানকে সে……

—বল।

রিহানের অন্তরের মধ্যে বিরাট একটা ক্রোধ ফুটে উঠল। এক মুহূর্ত সেই ক্রোধের আবেগে সে কোন কথা বলতে পারল না। তার ক্রোধের কারণ আছে। অল্প দিনের মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছে আসমানতারা ভূষণের ভক্ত। তার গান তাকে মুগ্ধ করেছে। ভূষণের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। তার চোখে একটা অন্য স্বপ্ন থাকে। সেই স্বপ্ন কার? নিশ্চয়ই ভূষণের। কারণ—রিহান সংবাদ নিয়ে জেনেছে যে, ভূষণ প্রায়ই সকালবেলা আসমানের কাছে যায়। যে আসমান অন্য কারো সঙ্গে একমাত্র নৃত্যের আসর ব্যতীত দেখা করে না, ভূষণের ক্ষেত্রে তবে এই ব্যতিক্রম কেন? নিশ্চয়ই কোন…ক্রোধের বেগটা তার আরো বেড়ে যায়।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বুরহান জিজ্ঞেস করেঃ কই, বল?

—আসমানকে সে ভালবাসে।

—আসমানকে ভালবাসা দোষ? তুমি বাসনা? আসমান নটী, দশজনের মনোরঞ্জন করা তার কাজ। তাকে কেউ ভালবাসলেই লম্পট হবে?…

—কিন্তু আমি তো সেখানে অর্থ দিয়ে……

—আর ভূষণ?

—সে এমনি যায়।

—একজন নর্তকী তাকে প্রশ্রয় দেয়?

—হ্যাঁ, দেয়, বেশী করেই দেয়। আসমানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা।

বুরহান বলল ঃ তাহলে সেটাকে ভূষণের কৃতিত্ব বলতে হবে। নিশ্চয়ই তার ভালবাসাটা সত্যিকারের, তাই একজন নটীর মনও সে জয় করেছে।

রিহান বলল ঃ জয় করেছে না ছাই, ও আসমানকে জাদু করেছে।

বুরহান বলল ঃ ভালবাসা তো একরকমের জাদু। যারটা যত খাঁটি তারটাতে তত আকর্ষণ। তোমরা ভালবাসতে পারনি। তোমরা রূপের আকর্ষণে ছুটে গিয়েছে তাই...

রিহান যেন প্রায় ধমকে উঠল ঃ তোমার কাছে আমি কোন উপদেশ শুনতে চাই না। আমি ওকে খুন করব।

বুরহান বলল ঃ একটি খুন তো করেছ। কিন্তু যে জন্য খুন করেছ তা পেয়েছ কি? আর একটি খুন করলেও কি তোমার সেই পরমার্থ লাভ হবে? এ কেমন হল জান? কল্জে কেটে মন বের করবার চেষ্টা করা। তুমি বুকটা কেটে যতই ভেতরে প্রবেশ কর না কেন, তাতে কিছু রক্তপাত হবে, মাংস নষ্ট হবে, কিন্তু মন পাবে না। মনটা পাষাণ দেয়ালের আড়ালে একজন বন্দী নয় যে, দরওয়াজার হাব্সি খোজাকে সরিয়ে দিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনবে। খুনের পথে কি প্রেমেয় সন্ধান পাওয়া যায়? তুমি আবার ভুল করবে। তার চেযে একবার যে পাপ করেছ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত্ব কর।

—আমি কোন পাপ করিনি।

—খুন্ করা পাপ নয?

—তাজুদ্দিনকে খুন করা পাপ নয়। ও একটা পশু ছিল।

—আর ভূষণ?

—ও শয়তান।

—কিন্তু জান কি দোস্ত্ ভূষণকে দেবদূত বলে মনে হয আমার কাছে? চোখের দেখাটাই দেখা নয়, মনের দেখাটাই দেখা। দেখতে হলে নিজের মনটাকে আগে শান্ত কর।

রিহান বিরক্ত হয়ে বলল ঃ আমি তোমার উপদেশ শুনতে চাইনা বুরহান।

বুরহান বলল ঃ আমি কোন উপদেশ দিতেও চাইনা। কিন্তু চমনলালের কি করবে বল।

—আমি জানি না।

—বিনা অপরাধে ওর শাস্তি হতে দিতে পাবি না।

—তা হলে তুমি বাঁচাও।

—বাঁচাতে হলে আর একজন যে মরে।

—মানে?

—তা হলে সত্য কথাটা আমাকে বলতে হয়।

চিৎকার করে উঠল রিহান ঃ বুরহান তুমি! দোস্ত্ বলে বিশ্বাস করে তোমাকে সব বলেছিলাম, তার এই প্রতিদান!

—তাহলে দোস্ত্ বলে তেমনি চমনের প্রতিও কি তুমি বিশ্বাসঘাতকা করছ না?

—না।

—তাহলে আমার কিছু করবার নেই। আমি উঠি। চমন যত অন্যায়ই করুক—খুনের দায়ে সে দায়ী নয়। তাকে বাঁচাতে হবে। বুরহান উঠে দাঁড়াল।

রিহান ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ যাও, আমি ভয় করিনে। তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা সব দুষ্মন।

বুরহান বেরিয়ে এল। অন্তরের মধ্যে তার খুব যে একটা বড় অনুশোচনা এল তা নয়। রিহানের উপর যে তার রাগ হল তাও নয়। শুধু একটু দুঃখ হল এই ভেবে যে, মানুষ কি করে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পাবে। রিপু কি এতই প্রবল যে, মানুষের শুভ বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে? রিপুর বশে মানুষ এমনি পাল্টে যায় যে, তাকে আর চেনা পর্য্যন্ত যায় না? নিজেই নিজেকে চিনতে পারে না? হিন্দুস্থানের একজন প্রাচীন সংস্কৃত লেখকের নাটকের কথা মনে পড়ে রিহানের। সে একটু সংস্কৃতও পড়তো পণ্ডিত রামজীবন ভট্টের কাছে। নাটকটির নাম "অভিজ্ঞান শকুন্তলম।" দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একটি অঙ্গুরী দিয়েছিল, অভিজ্ঞান অঙ্গুরী। সে অঙ্গুরী হারালে শকুন্তলাকে সে আর চিনতে পারল না। প্রকৃতপক্ষে এই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীটি আর কিছুই নয়, মানুষের শুভবুদ্ধি। এই শুভবুদ্ধিই অঙ্গুরীর ন্যায় নিজেব কাছ থেকে একে অপরের উপর [illegible]য়ে দেয়। এই শুভবুদ্ধির আলোকে সে যখন দেখে, সব পরিচিত বলে মনে হয, সকল জিনিষই প্রেমের মাধুর্য্যে সিক্ত হয়ে থাকে। যখন সেই শুভবুদ্ধি অদৃশ্য হয়, মানুষ নিজের নিতান্ত প্রণযাস্পদকে অর্থাৎ প্রেমকে, মঙ্গলকে পর্য্যন্ত চিনতে পারে না। রিহান আর চমনলাল দুজনেই সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরী হারিয়ে ফেলেছে। আবার যদি কোন মাছেব পেটে তাকে পাওয়া যায়, যদি গভীর জল থেকে সেই মাছ ওঠে অর্থাৎ অবচেতন মন থেকে যদি আত্মসমালোচনার জাল তাকে ধরতে পারে, তবে সেই দিন আবার নিজেকে বিশ্লেষণ করবার সময় (মাছ কাটবার সময) অভিজ্ঞান অঙ্গুরীর সন্ধান মিলতে পারে।

বুরহানের মনে হল সেই গল্পটা সে শুনিয়ে দেয় রিহানকে। আত্মসমালোচনার জালটা যদি সে বন্ধুরূপী ধীবরের হাতে তুলে দেয় (অর্থাৎ রিহানকে) তবে সে জাল নিক্ষেপ করে সেই হারাণো অঙ্গুরীর সন্ধান করা সম্ভব। কিন্তু এখনো অনেক দেরী, আগে ওরা সেই জাল বুনুক।

বুরহান বেরিয়ে গেল।

রিহানও সেই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ল, তবে অন্যত্র। বুরহানের কথার মধ্যে একটা অস্পষ্ট শাসানী ছিল। সে খুনের কথা ফাঁস করে দিতে পারে। তাই সে আবার চলল উত্তর গড়ে সেই পণ্ডিতের কাছে। ভাগ্যেশ্বর বাচস্পতীর কাছে।

মক্কেল একবারের বেশী দুবার গেলে জ্যোতিষীদের বড় ভয়। তারা বুঝতে পারেন যে, তাদের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়নি। মক্কেলের মানষিক যন্ত্রণার উপশম হয়নি। এবার থেকে মক্কেলের ব্যতিব্যস্ত করবার পালা। তাই ভাগ্যেশ্বর জ্যোতিষী একটু বক্র কটাক্ষে তাকালেন রিহানের দিকে। কিন্তু চোখেমুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তুলতে কসুর করলেন না। অভিনয়ের নায়কের মতন নকল হাসির আবরণ তাদের রেখে মেখে চলতেই হয়।

—এই যে খাঁ সাহেব আসুন, কি খবর? আপনার মত একজন গুণীলোকের সমাগমে আমার আশ্রম ধন্য হল।

রিহান বলল ঃ আপনার কাছে আবার এলাম পণ্ডিতজী।

—হ্যাঁ, বসুন, খবর বলুন।

—আপনারা কথাই সত্য হয়েছে।

বুকটা দুলে উঠল ভাগ্যেশ্বর পণ্ডিতের। বললেন ঃ জানেন জনাব, আজ ত্রিশবৎসরের উপরে হস্তরেখা বিচার করছি। কিন্তু কোন ভুল কোন দিন হয়নি। সুলতানের হাত দেখে কাশীশ্বর 'রাজ-জ্যোতিষী' আখ্যা পেল। কিন্তু কোন কথাটা ফলল শুনি? বলল, সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র হবে না, ষড়যন্ত্র লেগেই আছে। চমনলাল নামে আপনাদের দক্ষল দরওয়াজার একজন শেঠজী আছেন। সে হাত দেখালে কাশীশ্বর বলল কিনা, আপনার রাজদ্বারে কোনও ভয় নেই। আমার কাছে এসেছিল, আমি কপাল দেখেই বললুম ঃ আপনার কারাবাস।

শেঠজী অবশ্য বললেন ঃ আমার হাতটা একবার দেখুন।

আমি বললুম ঃ হাত দেখবার দরকার নেই।

বুঝলেন জনাব, গ্রহের তাড়নাতে কোন্ ব্যক্তি ভুগছে আর ভুগছেনা, আমি চোখ মুখ দেখলেই বলে দিতে পারি। তবে দুষ্ট গ্রহের প্রভাব যে ব্যক্তির উপর খুব বেশী, যাকে দেখে মনে হয় এর আর চিকিৎসা নেই, তার হাত দেখিনে। তা যদি করতুম, তবে আমার আজ গৌড়ের উপর তিনখানা বড় বড় মহল উঠতো।

রিহান বলল ঃ তাহলে চমনলালও আপনার কাছে একবার এসেছিল?

—ও, একশবার। না এসে পারে? ছেলে, মেয়ে, বোরখা পরা বেগম, কে না আসে আমার কাছে।

—মেয়েরাও আসে?

—আজ্ঞে জনাব।

—বাঈজীরা?

—আসে।

—আসমান কোনদিন এসেছিল আপানার কাছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ একটু বেটে মততো?

রিহান বলল ঃ আজ্ঞে না। ওর দেহে কোথাও খুঁত নেই। আল্লাহ্তালা ওকে সব দিক থেকেই মেপে মেপে তৈরী করেছেন।

জ্যোতিষী বললেন ঃ ঐ তো ঠিকই বলছি। সে আসমানই হবে। তবে আপনি একটু লম্বা কিনা, আপনার কাছে সবাইকে ছোট মনে হয়। আপনার সঙ্গে তুলনা করেই বলছিলুম।

রিহান বলল ঃ হ্যাঁ, তা আমার চেয়ে একটু বেটেই হবে।

জ্যোতিষী বললেন ঃ বললুম না, আমার কখনো ভুল হতে পারে না। আমি বুঝলেন, এঁদো পুকুরের পানা নই। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা জ্যোতিষী নই। ঢাকঢোল পেটাই না তাই। নইলে ভৃগু পড়ে কয়জন জ্যোতিষী করে শুনি? এক এক মরদের

ক্ষমতার কথা জানা আছে আমার। নেহাৎ জোচ্চুরি বিদ্যাটা রপ্ত করতে পারিনি তাই বড়লোক হতে পারলুম না।

রিহান বলল : তা সে কিছু বলল আপনাকে ?

—অনেক কথাই বলল।

—মানে ভালবাসর কথা ?

—হ্যাঁ, যৌবনের ঐ এক রোগ ছাড়া আর কি আছে বলুন।

যৌবনে প্রেমের খবরের জন্যই জ্যোতিষী। আর একটু বড় হলে ক্ষমতাটা কত হবে সেটা জানবার জন্য। একটু চরমে, গিন্নী আর বেগমদের অত্যাচারের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তাই জানার জন্য। লোক এলেই বলে দিতে পারি, কেন, কিসের জন্য। আমার গুরুর কৃপা। বুঝলেন না বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছি। মাথায় জটা ছিল। নিতান্ত আজ টাক পড়ে গেছে।

রিহানের বুকটা আবার একটু দুরু দুরু করে উঠল। তাহলে !

জিজ্ঞাসা করল : আসমান কি কাউকে ভালবাসে ?

একটু হাসলেন জ্যোতিষী : তা যৌবন যখন আছে, যৌবনের ধর্মটা আর কোথায় যাবে বলুন ? টিয়াপাখীর গায় রঙ লাগিয়ে হলুদ করে দিন না, তাতে কি ওর কণ্ঠের পরিবর্তন হবে ? মেয়েমানুষ বাঈজীই হোক, আর ঘরের বেগমই হোক, ভালবাসার টান যাবে কোথায় ?

রিহান মুগ্ধ দৃষ্টিতে জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে থাকল। আর একটি প্রশ্নের উত্তর শুনবার জন্য বুক টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল : আচ্ছা পণ্ডিতজী, আসমান কাকে ভালবাসে ?

একটু হাসলেন জ্যোতিষী : জানেন তো, এটা ব্যবসার গোপন কথা, বলতে পারি না। শুধু আপনি বলে বলছি। প্রকৃতপক্ষে তার টানটা আপনার উপর। তবে সাবধান, খুদার কসম, একথা যেন আসমানকে জানাবেন না।

স্বর্গের দেবদূতকে চোখের সামনে নেমে আসতে দেখলেও বুঝি রিহান এর চেয়ে বেশী চমকিত হত না। তার বুকটা দুলে উঠল ! নাচতে লাগল। আবেগের মুহূর্তে যে কটি স্বর্ণ মোহর তার কাছে ছিল, সব কয়টিই সে জ্যোতিষীকে দিয়ে দিল। বলল : কক্ষণো বলি !

অবলীলাক্রমে সেই স্বর্ণ মোহরগুলি কাঠের পেটরার মধ্যে ঢুকিয়ে পণ্ডিতপ্রবর বাচস্পতী হাসতে হাসতে আবার রিহানের দিকে তাকালেন : তবে কি জানেন, মেয়েটা রাহুর প্রভাবে ভুগছে। মঙ্গল নীচস্থ। তাই কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না। নইলে এতদিন আপনার বেগম হয়ে গলায় ঝুলে পড়ত।

রিহান বলল : কিন্তু আমার একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল। ভেবেছিলুম—ভূষণ...

—ভূষণ কে ? ভ্রূ কুঞ্চিত করে জ্যোতিষী রিহানের দিকে তাকালেন।

—একটা পাগলাটে ধরনের লোক !

—বিষয় বাড়ী আছে ?

—না।

—অনেক টাকাকড়ি আছে বোধ হয়?

—না, না, একেবারে নিঃস্ব। একবেলা দানাপানি জোটেতো আর একবেলা জোটে না।

জ্যোতিষী বললেনঃ মাথা খারাপ, আসমান ওকে ভালবাসতে পারে না। আপনার ঐ ভূষণ না কি, বর্ণনা শুনেই বুঝলুম, শনি নীচস্থ। ওকে কোন মেয়ে ভালবাসতে পারে?

রিহান বললঃ পণ্ডিতজী, আপনার দুটি কথা সত্য হয়েছে। সত্যি, দেখলুম বন্ধুরাই আমাব দুষ্মন।

জ্যোতিষী হেসে বললেনঃ বলিনি তখন? দেখুন মেলে কিনা। বুঝলেন না ত্রিশবৎসর এ পথে।

রিহান বললঃ আপনি বলেছিলেন, একজন হিন্দু দোস্ত্ আমাব প্রাণ হন্তারক হতে পারে। কিন্তু এখন দেখছি মুসলমান দোস্ত্ আমাব পেছনে লেগেছে।

জ্যোতিষী তখন আবেগে ভেসে যাচ্ছেন, আর কিছু বিচার না করে, জিজ্ঞাসাবাদ না করে চোখ বুজে বলে দিলেনঃ যান, ভাববেন না। আপনার কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না—হিন্দুই হোক্ আর মুসলমানই হোক্। যান।

নতুন জীবনের প্রেরণা নিয়ে রিহান উঠে দাঁড়ালঃ আসি তবে পণ্ডিতজী।

—আসুন।

রিহান চলে গেলে জ্যোতিষী আর একবার স্বর্ণমুদ্রাগুলির দিকে তাকালেন। মনে মনে ভাবলেনঃ আহা, প্রেমের জন্য কত মূল্যই না দিতে হয। বুকের শান্তি দিতে হয, রাতের নিদ্রা দিতে হয়, সিন্দুকের অর্থ দিতে হয। তাই প্রেমের চেয়ে বড দান নাকি আব পৃথিবীতে কিছু নেই। বিনিময়ে কি পাওয়া যায়? একটি রাঙা মূলো। দুদিন ঘরে রাখলেই শুকিয়ে যায়। তার শাঁসের আডালে শ্বাসপ্রশ্বাস আর কিছু থাকে না। অবশেষে দেখা যায় প্রাপ্তির ঘরে শূন্য।

একুশ

"যে জন প্রেম দিযেছে জাত কিবে তাব আছে?
জাতেব বাঁধন ভেঙে গেছে মুক্তির নিঃশ্বাসে।"

—অজ্ঞাত কবি

ধর্মশালা তৈরি হতে লাগল গুপ্ত বৃন্দাবনে। কাজ করতে লাগল শ্রমিকেরা। ভূষণই গিয়ে তাদের দূর দূর গ্রাম থেকে নিয়ে এল। কিন্তু রাজমিস্ত্রী নিয়ে সমস্যা। ভেদাভেদ নেই ভূষণের। জয়নালুদ্দিন শেখকে নিয়ে এল ধর্মশালা তৈরী করাবার জন্য। তা দেখে

পরমানন্দের বৈষ্ণব চেলা যারা ছিলেন, দুচার জন তারা ছি ছি করে উঠলেন। গিয়ে ধরলেন আচার্য দেবকেঃ প্রভু, আপনি একি করছেন?

—কি গো?

—যমন প্রবেশ করালেন মন্দিরের মধ্যে?

—যমন! কে যবন?

—'ঐ দেখুন' বলে দূরে ভূষণের সঙ্গে আলাপরত জয়নালুদ্দিনকে দেখিয়ে দিলেন।

একটু হাসলেন পরমানন্দদেব। কিন্তু কোন কথা বললেন না। মনে মনে শুধু ভাবলেনঃ এইতো সত্যিকারের বৈষ্ণব। মানুষে মানুষে ভেদ নেই। সব মানুষই সমান। সেই পরম স্রষ্টার দাসানুদাস সবাই। এখানে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই।

ভক্তেরা বললেনঃ আপনি প্রথমেই ভুল করেছেন বাঈজীকে প্রশ্রয় দিয়ে। পাপের সঙ্গে কখনও পুণ্যের কাজ হতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় বার যবনকে যদি গ্রহণ করেন, বিরাট ভুল করবেন।

ইতিমধ্যেই দু'চারজন বৈষ্ণব ভূষণ খাঁকে একটু বিশেষ নজরে দেখছিলো। যেন সমস্ত হৃদয়ের প্রেম উজাড় করে দিয়ে পরমানন্দদেব তাকে গ্রহণ করেছেন। কি আছে ওর মধ্যে! শুধুমাত্র একটি দুশ্চরিত্রা মেয়ের ভাবের পাত্র সে, আর কিছুই নয়! পরমানন্দদেবের তাকেই এত অনুগ্রহ কেন? আর এতদিন এরা যে তাঁর কাছে আছে, সেবা করছে, তার কোন মূল্য নেই? না ধর্মের চেয়েও বিত্তের প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে?

পরমানন্দদেব হেসে শিষ্যদের দিকে তাকলেনঃ যবন কোথায়?

—ঐ তো।

—ভুল করেছ।

পরমানন্দের অন্যতম শিষ্য দিব্যানন্দ বললেনঃ সে কি প্রভু! আমি যে ওকে চিনি—ও জয়নাল।

পরমানন্দ বললেনঃ না, চেন না। ও জয়নাল নয়, ও একজন শিল্পী।

—কিন্তু ও যে মুসলমান্! মন্দির প্রাঙ্গণে ওকে প্রবেশ করতে দেবেন?

পরমানন্দ জিজ্ঞেস করলেনঃ এধর্মের কাছে যে হিন্দু মুসলমান নেই। এখানে যার প্রেম আছে তিনিই বৈষ্ণব। যিনি প্রেমহীন তিনিই যবন। আমরা নিজেরাই যে যবন হয়ে যাব, যদি প্রেমের দৃষ্টিতে মানুষের দিকে তাকাতে না পারি।

দিব্যানন্দের কোন কথা যেন থাকল না। তবু তিনি বলবার চেষ্টা করলেনঃ অনেক সাধকপুরুষ বারবনিতার অর্থ গ্রহণ করেন নি।

পরমানন্দ বুঝলেন, দিব্যানন্দের ইঙ্গিতটা কি। তিনি বললেনঃ দেখ, বৈষ্ণবেরা বাইরেটাকে মূল্য দেন না। দেখতে হয় অন্তরটাকে। জীবনের পথ দিয়ে চলতে গেলে রথের গায়ে কাদা লাগেই, তাই বলে রথী অচল হয়ে যাবে? তোমরা রথটা দেখছ, আমি রথীকে দেখছি। তাই আসমানকে গ্রহণ করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। জানি না প্রভুর কি ইচ্ছা, আমার মধ্য দিয়ে তিনি কাকে মুক্তি দিতে চান। সেই প্রভুর লীলার যে অন্ত নেই! আমি মুগ্ধ হয়ে সেই লীলা দেখছি। আসমানের চোখের জল যে শিশিরের চেয়েও মধুর ছিল, দেখনি?

কোন প্রতিবাদ করলেন না দিব্যানন্দ, কিন্তু হয়তো মনে মনে ভাবলেনঃ সুন্দরী নারীর নয়নের জলে স্নিগ্ধতা লক্ষ্য করা তেমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। কিন্তু অনুমোদনের যে তার অভাব থাকল তা স্পষ্ট বোঝা গেল। শুধু তিনি বললেন ঃ তাহলে যবন মিস্ত্রী দিয়েই কাজ হবে?

—তুমি যবন দেখছ, আমি দেখছি মানুষ।

দিব্যানন্দ বললেনঃ কিন্তু আমাদের বহু শিষ্য সামন্ত আছে, একরকম হলে......

পরমানন্দ বললেনঃ শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই প্রেমিক। আমরা চাই কৃষ্ণগত যে প্রাণ, তাকেই।

—কিন্তু ঐ রাজমিস্ত্রী কি কৃষ্ণগত প্রাণ?

—রাজমিস্ত্রী তো উপলক্ষ্য মাত্র। যিনি এ-কর্মে ব্রতী তিনি কৃষ্ণে সমস্ত মনোপ্রাণ সমর্পণ করেছেন। তিনি এক অলৌকিক জগতের সন্ধান পেয়েছেন।

—তাহলে একজন নর্তকীর কাছে পড়ে রয়েছেন কেন তিনি?

—তোমরা যাকে নর্তকী দেখেছ, তিনি তাকে তেমন দেখেন নি। (শিল্পীর চোখ আর সাধারণ মানুষের চোখ যে এক নয়। সামান্যতম জিনিষের মধ্যে শিল্পী অসাধারণের সন্ধান পান। কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত কবি আর শিল্পীর চোখে অনন্তের দ্বার খুলে দিতে পারে।) আমার তোমার চোখের উপর দিয়ে সেই মুহূর্ত চলে গেলেও আমরা তাকে দেখতে পাই না।

—কিন্তু তবু কি আর একবার ভেবে দেখলে হোত না আচার্য্য?

পরমানন্দ বললেনঃ ভাবনার ভার আমাদের নয়, তাঁর। তিনিই করাচ্ছেন, তিনিই করাবেন। অবাঞ্ছিত হলে তিনিই সরিয়ে নেবেন। "হরিবোল, হরিবোল, জয়গুরু, জয়গুরু।" তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজলেন।

দিব্যানন্দ বুঝলেন—এখন আর কথা বলা চলে না। তিনি সরে এলেন। একবার দূরে ভূষণকে দেখলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন সতীর্থদের কাছে।

ভূষণ একবার ফিরেও তাকাল না কারো দিকে। রাজমিস্ত্রীকে সে বোঝাতে লাগল—কোথায় কি ভাবে সেই ধর্মশালা উঠবে। তার চোখে তখন সেই ধর্মশালার স্বপ্ন! সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, মরুভূমির মধ্যে একটা শ্যামল উদ্যানের সৃষ্টি হয়েছে; দলে দলে ক্লান্ত তীর্থযাত্রী এসে আশ্রয় নিচ্ছে সেখানে। তাদের ঘর্মসিক্ত কলেবরে স্নিগ্ধতা নেমে আসছে। কী শান্তি! কী শান্তি! করুণা! কী করুণা! জগৎ শুদ্ধ সর্বত্র সেই করুণা ছড়িয়ে আছে, মানুষ দেখতে পাচ্ছে না!

ভূষণের চোখে জল এসে গেল।

আশ্চর্য্য হয়ে জয়নাল তাকাল তার মুখের দিকেঃ জনাব আপনি কাঁদছেন?

ভূষণ বললঃ নাগো না, আমি কাঁদছি না, আমার বড় ভাল লাগছে। মিস্ত্রী তুমি মনের মত ধর্মশালা তৈরী করতে পারবে তো?

—পারব মেহেরবান। আপনি বিশ্রাম করুন। খুদার ফজলে আমি আপনার মনের মত করে ধর্মশালা তৈরী করে দিতে পারব।

ভূষণ আশ্চর্য্য হয়ে তাকাল জয়নালের মুখের দিকেঃ খুদার ফজলে! তাহলে ভগবানে বিশ্বাস আছে মিস্ত্রীর? আত্মবিশ্বাস বড় কথা। পারবে, এ পারবে।

সে মিস্ত্রীর হাত ধরলঃ দেখো মিস্ত্রী, যেন সুন্দর হয়, যেন স্নিগ্ধ হয়। দেখো ধর্মশালার প্রতি ইঁটে ইঁটে যেন চোখের জল লেগে থাকে।

জয়নাল আশ্চর্য্য হয়ে তাকালঃ সেকি জনাব, এতো খুশীর কাজ, চোখের পানি আসবে কেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোখের জল দিয়েই যে এ ঘর তৈরী হচ্ছে মিস্ত্রী। শ্রান্ত পথিক আসবে, চোখের জলের স্নিগ্ধতা না পেলে সে শান্ত হবে কি করে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি দেখো, দেখো, ওই যে কদম্ব ছায়া ওরই মত যেন হয়।

মিস্ত্রী একটু আশ্চর্য্য হল। আবার তাকিয়ে দেখল ভূষণকে। চোখের দৃষ্টির অর্থকে পরিষ্কার ধরতে পারল না। কিন্তু কেন যেন তার মনে হল, এর জন্য সমস্ত পরিশ্রম পাত করতে হবে। এখানে আরো, আরো কিছু আছে।

সে আর কালবিলম্ব না করে মজুরদেব কাজে লাগাল।

আরো দূরে দাঁড়িয়ে ইঁট ভাঙছে, ইঁট বইছে মজুবেরা। ভূষণ এবার তাদের দিকে তাকাল। ক্লান্তির স্পর্শ লেগেছে তাদের অঙ্গে। ঘাম ঝরছে। সে এগিয়ে গেল। নিজেই বইতে লেগে গেল ইঁট।

মজুরেরা আহা আহা করে উঠলঃ একি জনাব, আপনি, আপনি কেন?

ভূষণ বললঃ তোমাদের বড কষ্ট হচ্ছে। আমাকে করতে দাও। আমি যে সেবক।

তারা আশ্চর্য্য হয়ে ভূষণের দিকে তাকিযে থাকল।

—কি এক নেশার ঘোরে যেন ভূষণও কাজ করতে লাগল ওদের সঙ্গে, আর গুণ গুণ করে গাইতে লাগলঃ

"বড় বিশোয়াসে তুয়া
পন্থ নেহারি,
রহল যমুনা কুঞ্জ বনয়ারী।"

আপন মনে গান গেয়ে চলছিল ভূষণ চোখ বুজে। কোন দিকে তার খেয়াল ছিল না। এমন কি যে ইঁট বইতে শুরু করেছিল সেই ইঁট পর্য্যন্ত আর সে বইতে পারল না। নিজেকে ভুলে, কাজ ভুলে, সে যেন কেমন হয়ে গেল। পরমানন্দদেব মন্দিরের বারান্দা থেকে মুদ্রিত নয়নে সেই সুরের মধুর সিক্ত ভাবটি গ্রহণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই গানের মধ্যে যেন একটা জাদু ছিল। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে একটা শান্ত শ্রী ফুটিয়ে তুলল। শ্রমিকরা পর্য্যন্ত কাজে উৎসাহ পেল। তাদের মনে হল, কে যেন অপেক্ষা করে আছে, তাদের কাজ শেষ হলে সে এখানে আসবে। তার এই পরম আবির্ভাবের জন্যই এই কাজ। এই গুপ্ত বৃন্দাবন সেই অপেক্ষায় উৎসুক। বৃক্ষ, তরু, লতা, পাতা সব। এমন কি ইঁটগুলোর মধ্যেও যেন সেই পরম প্রাণের স্পন্দন ফুটে উঠেছে। সেই অদৃশ্য চরণের ইঙ্গিত পেয়েছে তারা। উদ্বেগাকুল সবাই। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি সে আসবে।

সেই মুহূর্তে সবার অলক্ষ্যে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল। একজন বৈষ্ণবী এসে দাঁড়িয়েছিল ভূষণের পেছনে। সে এ দেশের নয়, পরদেশিনী। গুপ্ত বৃন্দাবনের নাম শুনে এসেছে। বৃন্দাবন যাবার পুণ্যের চেয়েও গুপ্ত বৃন্দাবন দর্শনের পূণ্য বেশী। সেই শ্যাম নাগরকে পেতে হলে এই গুপ্ত বৃন্দাবন না এসে নাকি উপায় নেই। তাই সে চাতকের মত মেঘের জলের প্রত্যাশায় তাকিয়ে ছিল। এতদিনে আসতে পেরেছে। বৈষ্ণবী এসেছে একজন হিন্দু বণিকের নৌকাতে। নৌকা এসেছে গৌড়ের ঘাটে পূর্ব বাংলা থেকে।

গুপ্ত বৃন্দাবনে প্রবেশ করতেই একটি তন্ময় সুরের নিবিড় ঝঙ্কার তার কানে প্রবেশ করল। বৈষ্ণবী সেখানে থামল। দেখল, একজন যুবক চোখ বুজে গান গাইছে। আহা! কি মধুর কণ্ঠস্বর, কি ভাবের আবেগ! বৈষ্ণবী তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখতে লাগল।

গান শেষ হলে সে এগিয়ে গেল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। নিজেকে সে ধূলায় লুটিয়ে দিল। তখনো পরমান্দদেব সেই সুরের মায়াতে জড়িয়ে আছেন। বৈষ্ণবীকে দেখতে পেলেন না তিনি। কিন্তু বৈষ্ণবী তার মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল: কেগো ঠাকুর তোমার মন্দিরের পথে গান গায়?

পরমানন্দ চোখ খুললেন। দেখলেন একজন বৈষ্ণবী। কিন্তু যুবতী। সর্বাঙ্গে তিলক কাটা। গলায় কণ্ঠী। তুলসীর মালা। বগলতলায় খমক নিয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে ভিক্ষাপাত্র। কিন্তু যৌবনের বেগ সেই ধর্মের বাঁধকে অতিক্রম করে যেন বেরিয়ে আসতে চায়।

পরমানন্দ জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কে গো?

—তিলক কাটা দেখে বুঝতে পারছ না ঠাকুর, আমি যে বৈষ্ণবী, কৃষ্ণদাসী।

—এই বয়সে ঘর থেকে বেরিয়েছ?

—প্রেমের ঠাকুর টানলে তা আবার বয়েস অবয়েস আছে নাকি? শ্রীরাধিকা যে কিশোরী ছিলেন গো, যখন সেই কালার বাঁশী তাঁকে আকুল করল। অসময়ে যদি রসময় ডাকে, কি করি বল ঠাকুর? সবাই এই পোড়া যৌবনটাকে দেখে সন্দ করে। কিন্তু কি করি বল। তোমার কালা বড় রসিক, ডাকল যে। সে গান ধরল—

"অসময়ে রসময় কেন বাঁশী বাজালে বনে,
এই না সবে দুপুরের বেলা, আমার ভাত রইয়াছে উনানে।
কেন বাঁশী বাজালে বনে।।"

সুরটা শুনে চমকে উঠল ভূষণ! কে, কে গান গায়? সে মন্দিরের প্রাঙ্গণের দিকে তাকালো, দেখল একজন বৈষ্ণবী বসে গান গাইছে। পরমানন্দ শুনছেন সে গান। ভূষণ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেদিকে। বৈষ্ণবীর মুখের দিকে সে তাকিয়ে থাকল।

গান শেষ হলে বৈষ্ণবী তাকাল ভূষণের দিকে। বলল: কি গো কালাচাঁদ কি হয়েছে?

ভূষণ বলল: তোমার একি গান গো?

—কেন?

—অসময় এগান কেন? কৃষ্ণের বাঁশী কি অসময়ে বাজে? তাঁরা বাঁশী যে সময় হলে তবেই কানে শোনা যায়।

বৈষ্ণবী হেসে বলল: সে কি গো কালাচাঁদ তুমি পুরুষের পক্ষে। মেয়েমানুষের অন্তর

চেন না। যন্ত্রণা দিয়ে ভাল লাগে। শ্রীরাধিকা আমার কাঁচা কিশোরী তাকে যমুনার তীরে অঝোরে কাঁদালেন রসের নাগর। কুলবালাকে কুল ছাড়ালেন। তোমাদের প্রেমের রীতি নীতি আছে নাকি গো? দেখ না আমার যৌবন। আমাকেও ঘর ছাড়া করেছেঃ "কানুর পীরিতের রীতি বোঝা দায়। কাঁদিয়ে ভালবাসে।"

ভূষণ বলল: সেই তো প্রভুর লীলা। তার মোহন বাঁশী তো কাঁদাবার জন্যই। মানুষ তো কাঁদতে পেলেই ধন্য হয় গো। ক'জনের ভাগ্যে সেই কান্না জোটে?

বৈষ্ণবী তাকালো পরমানন্দের দিকে। বলল: নাগরটি রসের আছে দেখছি। নাম কি কালাচাঁদের?

পরমানন্দ বললেন: নাম আছে নাকি আবার তাঁর ভক্তদের? সবাই যে কৃষ্ণদাস, আমরা দাসানুদাস। ও বৈষ্ণবী তোমার যে এখনো অহংবোধ ভাঙেনি, কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর তবে কি শুনলে তুমি?

বৈষ্ণবী গাইল:

"মুই শুনন্যাছি শুইন্যাছি কালা বাঁশী তার,
কুল ছাড়্যাছি ঘর ভাঙ্যাছে তাই আমার।
তোমরা শুধায়ও না, শুধায়ও না আমার নাম,
মুই কৃষ্ণ প্রেমের যমুনাতে ডুব দিলাম—
এ দরিয়ার নাইরে বধুঁ কূল কিনার॥"

পরমানন্দ বললেন: আহাঃ সুন্দর! সত্যিই গো বৈষ্ণবী কূলকিনারা নেই সেই কৃষ্ণপ্রেমের। তাতে ডুব দিয়ে নিজেকে হারাতে না পারলে কৃষ্ণপ্রেমের অসীমতার স্বাদ মেলে না।

বৈষ্ণবীর দৃষ্টি কিন্তু তখন ভূষণের দিকে। বলল: আশ্রম কোথায় গো বৈষ্ণবের?

ভূষণ বলল: এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তো বৈষ্ণবের আশ্রয়। যেখানে থাকি সেই আমার ঠাঁই।

—বৈষ্ণবী আছে গো ঠাকুরের?

—বৈষ্ণবী! হাসল একটু ভূষণ। আমি যে নিজেই বৈষ্ণবী গো। সেই পরম পুরুষের কাছে আবার দ্বিতীয় পুরুষের কোন সত্তা আছে নাকি গো?

সেই কথা বলেই ভূষণ আবার ফিরে তাকাল যেখানে কাজ চলেছে সেই দিকে। শ্রমিকরা কাজ করছে। ভূষণ চলে এল সেখানে।

বৈষ্ণবী কিছুকাল তাকে তাকিয়ে দেখল। তারপর পরমানন্দ বাবাজীর দিকে তাকিয়ে বলল: কেমনতর বৈষ্ণব গোঁ, মাথা ন্যাড়া নয়, গলায় তুলসীর মালা নেই,—

পরমানন্দ বললেন: বৈষ্ণব কি বাইরে না অন্তরে?—

—দুই-ই দরকার।

—দুইয়ের দরকার নেইগো, অন্তরেই বৈষ্ণব।

—ভেক্ নেয়নি বল?

—কিসের জন্য ? ভিক্ষার জন্য ? তণ্ডুল ভিক্ষা ও করে না। ভিক্ষা করে শুধু করুণা, সেই পরম পুরুষের করুণা !

—এখানে কি করে ঠাকুর ?

—এসেছে তোমাদের জন্যে। দূর দূরান্ত থেকে আসবে তীর্থযাত্রী তাদের সেবা করবার জন্য। ঐ দেখছ না ?

বৈষ্ণবী ওদিকে তাকিয়ে কাজ দেখল। বলল ঃ নতুন মন্দির তৈরী হচ্ছে ?

—হ্যাঁ, সত্যিকারের মন্দির। পূজারী যাঁরা তাঁরা দেবতার চেয়ে ভক্তের পূজা করে। সেই ভক্তের মন্দির তৈরী করছে ও, ধর্মশালা। ভক্তের চরণধূলা পাবার ব্যাকুলতা দেখে বুঝলে না।

কি জানি কেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৈষ্ণবী। ও প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলল না। বলল ঃ তা ঠাকুর এখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে তো ?

পরমানন্দ বললেন ঃ কৃষ্ণের ইচ্ছায় পথে বেরিয়েছ, থাকবার ভয় কি। তাঁর দয়ায় কেউ নিরাশ্রয় নাকি ! তিনি ডাকলেন ঃ ওরে কে আছিস্ ?

ওধার থেকে দিব্যানন্দ তাকিয়ে দেখছিলেন সব। তাকিয়ে দেখছিলেন বৈষ্ণবীকেও। তিনি এগিয়ে এলেন ঃ আদেশ করুন।

—বৈষ্ণবীকে থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।

দিব্যানন্দ বৈষ্ণবীর দিকে তাকালেন। দু'জনের চোখে চোখে হয়ে গেল।

দিব্যানন্দের চোখের দিকে তাকিয়ে বৈষ্ণবী কি দেখল, সেই জানে। সে একটু হাসল। বলল ঃ এইতো বোষ্টম। দিব্যি তুলসীর মালা, মাথা ন্যাড়া। এতক্ষণ কোথায় ছিলে গো ? আহা ! কেষ্টভজন হোল, তুমি থাকলে না ?

দিব্যানন্দ বললেন ঃ শুনছিলুম তোমার গান, আপন মনে শুনছিলুম। অনেক দিন পরে ভক্তির গান শুনলুম। বৈষ্ণবীর ঘর কোথায় গো ?

বৈষ্ণবী তার দিকে আর একবার কটাক্ষপাত করে বলল ঃ ঘর ছেড়েছি বাঁশীর টানে, ঘর আর কোথায় গো ? ছিলুম নদীর দেশে, এলাম যমুনার কূলে। দেখি কোথায় যাই। শুনেছি গুপ্ত বৃন্দাবন এলে কৃষ্ণলাভ হয়।

দিব্যানন্দ বললেন ঃ মিথ্যে শোননি। আমাদের প্রভু সাক্ষাৎ দেবতা। দিব্যানন্দ পরমানন্দের দিকে তাকালেন। বললেন ঃ গুরুর দয়ায় কৃষ্ণানুভব হয়েছে ওঁর। যাক তুমি মুক্তি পাবে।

বৈষ্ণবী বলল ঃ জীবন সার্থক হয়গো যদি পাই কৃষ্ণ দরশন। চল বৈষ্ণব, যমুনার তীরে কোন্ কদম্ব ছায়া রয়েছে চল দেখি বসব সেখানে।

দিব্যানন্দ বৈষ্ণবীকে নিয়ে ধর্মশালার দিকে চললেন।

বাইশ

দুলেরে দুলেরে অশ্রু দুলেরে
আঘাত করিয়া বক্ষ কূলেরে।"

—রবীন্দ্রনাথ

গৌড়ে ফিরল তিনদিন পরে ভূষণ। কেন জানিনা মনটা তার ব্যাকুল হল। সে ফিরে এল সন্ধ্যার ছায়ায় ছায়ায়। দুই পাশের তরুরাজি আর মৃত্তিকার শ্যামল তৃণের আস্তরণ দেখতে দেখতে এল সে। এসব কিছুর মধ্যেই যেন সেই শ্যামল কিশোরের ছায়াপাত ঘটেছে। সবাইকে আজ ভাল লাগে, সবাইকে আজ অন্তরে সপ্রেমে গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয়। এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একসময় তার নজর এসে গৌড়ের দক্ষল দরওয়াজাতে ঠেকে গেল। গৌড়ের মানুষেরা বাইরে এসেছে। তেমনি করে জটলা তৈরী করেছে নগরের দ্বারদেশে? ভূষণের আবার মনে হল, সে বন্ধনের মধ্যে যাচ্ছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার মনে পড়ল দেওয়ালের আবেষ্টন সৃষ্টি হলেই কি বন্ধন হয়? তবে সেই অসীম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজা হয়েছিলেন কি করে? সীমার মাঝেও অসীম ধরা দিতে পারে। যদি চোখ থাকে তবে তাকে দেখা যায়। যদি চোখ না থাকে, তবে অসীমকে বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ বলে মনে হয়। আকাশটা তো অসীম। তবু চারপাশে নুইয়ে পড়ে একটি সীমার বৃত্ত রচনা করেছে কেন সে? অসীমকে সেই সীমার মধ্যেই তো সকলের চোখে পড়ে। শুধু সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে সে-ই যে অসীমে মিশে যেতে পারে, অন্তরে যে তাকে অনুভব করতে পারে। গৌড়ের আসমানতারা সেই অসীম। কারো কাছে সে সীমার আকাশ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে তাকে সীমার মধ্যে দেখেছে, সেই আবদ্ধ হয়েছে। যে আকাশের দিগন্তসীমায় তার এই ন্যুব্জ হয়ে ভেঙে পড়াটা শুধুমাত্র দৃষ্টিবিভ্রম বলে জানতে পেরেছে, সে অসীমত্বকে অনুভব করেছে। আসমান সীমাবদ্ধ হয়ে গৌড়ে আছে, আবার এই আসমানই সীমার বাঁধনকে ছিড়ে বাইরে চলে এসেছে। যে আসমান গৌড়ের নাটমহলে নটী সেঁজেছে, সেই আসমানই গুপ্ত বৃন্দাবনে গোপীভাবে ধর্মশালার মধ্যে স্বপ্ন নিয়ে বিরাজ করছে। যে আসমান মোহিনী, সেই আসমানই সেবাদাসী। অপর পক্ষে ওই নতুন বৈষ্ণবী? বাইরের বাঁশী শুনে ঘর ছেড়েছে বটে, কিন্তু কিছুতেই দেওয়ালের সীমা পার হতে পারছে না। হ্যাঁ, ও পারেনি দেওয়ালের সীমা পার হতে। ওর চোখের দৃষ্টিই তা বলে দেয়। পাল তুলে দিলেও নোঙর ত্যাগ করেনি—আশা আছে নতুন ঘাটে ভিড়বে। চোখে সেই নোঙরের নেশা। অশ্রু পারাবারের অসীম ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস কোথায় সেখানে? যে আসমানের একবিন্দু চোখের জল ভূষণকে অর্থের বন্ধন থেকে ভাবের জগতে নিয়ে এল—সেখানে বৈষ্ণবীর কণ্ঠে প্রেমের গানও একটু অশ্রুর সিক্ততা সৃষ্টি করতে পারল না। মনে হল না আকাশ কাঁদছে, বাতাস কাঁদছে, তরুলতা হাহাকার করছে। সেই আকুল ক্রন্দনের আবেগ বোধহয় তার মধ্যে এখনো আসেনি।

ঠিক গানই গেয়েছে বৈষ্ণবী ঃ "অসময়ে রসময় কেন বাঁশী বাজালে বনে।" সময় ওর কবে হবে ? হবে, যেদিন প্রেমের পালে হাওয়া লাগবে। মানুষের মধ্য দিয়েই অতিমানুষের দিকে অগ্রসর হতে হয়। ভূষণও কি কোনদিন এই নতুন জীবনের স্বাদ পেত—যদি আসমানের চোখের তারায় সেই প্রেমের ইঙ্গিত ফুটে না উঠতো ?

কোন এক শুভ মুহূর্তে সেই প্রেম আসে। সেই শুভ মুহূর্তের সন্ধান বৈষ্ণবী পায়নি।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ভূষণ এসে দাঁড়াল দক্ষল দরওয়াজার কাছে। তার আজন্ম স্বভাব হিসেবে সে একবার সেখানে দাঁড়াল। তারপর আকাশের দিকে তাকাল। কি দেখবার চেষ্টা করল।

সেই মুহূর্তে দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়ির উপর বসে ছিল বুরহান, একা। একে একে তার অপর সঙ্গীরা বিদায় নিয়েছে। রিহান অন্ধ আবেগে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে। চমনলাল কারাগারে। জালাল দূরে। বুরহান যেন একক, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। সেও একা বসে ভাবছিল দক্ষল দরওয়াজার উপর। রিহানের ব্যবহার তাকে অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছে। তার শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে। এতটা আত্মবিস্মৃতির মধ্যে একটা মানুষ ডুবে যেতে পারে যেন ভাবতেও পারা যায় না। সেই ব্যথাটা বুরহানের বুকে এতবেশী করে লেগেছিল যে "দিনের জন্য সে গৌড়ের সেই নতুন রোগটার কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিল। কখনো সেই রো-াের কথা মনে পড়তে তার আর ভয় হোত না। মনে হোত, গৌড়ের এটা প্রাপ্য। রোগটা শুধু নহবৎখানার পাশেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা, ছড়িয়ে পড়বে। সমগ্র গৌড়কে সে গ্রাস করবে। নতুন রোগটা আর কিছুই নয়, মৃত্যু। রোগ হয়েছে আগেই। অন্ধতার রোগ, কামনার রোগ, আত্মবিস্মৃতির রোগ, ঈশ্বর বিস্মৃতির রোগ। গৌড়ের প্রত্যেকটা মানুষকেই যেন সেই মুহূর্তে বুরহানের পাপক্লিষ্ট বলে মনে হয়েছিল। ঐশ্বর্য্য গৌড়ের মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। জীবনকে তারা ভুল বুঝেছে, উপভোগই আজ তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। এবং সেটা এতটাই স্বাভাবিক আজ প্রতিটি মানুষের কাছে যে, পাপ বলে আর তাকে মনে হয় না। নর্তকীবিলাস জীবনের একটি অঙ্গ। ঘরে অবহেলায় বন্দিনী স্ত্রী স্বাভাবিক। প্রেম একমাত্র দেহসৌন্দর্য্য রসপান ব্যতীত কিছুই নয়। মুক্তি কোথায় ? রোগ জর্জরিত প্রত্যেকটি মানুষ। তার "া স্বাভ"িক পরিণতি তাই আজ গৌড়ে দেখা দিয়েছে।

বুরহান একা বসে এইসব কথা ভাবছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, দক্ষল দরওয়াজাতে ভূষণ দাঁড়িয়ে। যেন খুঁজতে খুঁজতে একটা পরশ পাথর সে পেয়ে গেছে। হঠাৎ সেই পরমপ্রাপ্তির স্পর্শে যেমন মনটা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে বুরহানের বুকটাও তেমনি লাফিয়ে উঠল। বহুদিন পরে আবার একজন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। সে প্রায় লাফিয়েই সিঁড়ি থেকে নেমে ভূষণের কাছে ছুটে গেল। তাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ঃ এই যে দোস্ত্ কোথায় ছিলে এতদিন ? ভূষণের মুখের দিকে একটা আগ্রহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে সে তাকাল। ভূষণ একটু ক্ষীণদেহ হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি অপূর্ব শান্ত শ্রী ফুটে উঠেছে।

ভূষণও তাকাল বুরহানের দিকে। তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে এক অসীম নিবিড়তা।

বুরহান আবার জিজ্ঞাসা করল ঃ কোথায় ছিলে এতদিন দোস্ত্ ? আমাদের ভুলে গেলে ? বুরহানের চোখে একটা অভিমানের আভাষ।

ভূষণ ফিরে তাকাল বুরহানের দিকেঃ ভগবান যেখানেই রাখেন সেখানেই ছিলুম।

বুরহান বলল ঃ না গৌড়কে বন্ধন ভেবে গৌড় ত্যাগ করলে? যে পথ গৌড়ের বাইরে গিয়েছে সে পথ ধরলে?

ভূষণ বলল ঃ না, দোস্ত্ আমার ভ্রান্তি ভেঙেছে। যে পথ গৌড়ের বাইরে গিয়েছে, তা যেমন অসীম, যে পথ গৌড়ের মধ্যে এসেছে তাও চার দে'য়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অসীম যে সীমার মধ্যে আছে, আবার সীমা রয়েছে অসীমের মধ্যে। এই দে'য়ালের মধ্যে যদি অসীম না থাকতে পারে, তাহলে মানুষের এই দেহের বন্ধনের মধ্যে ভগবান কি করে আছেন? সীমার মধ্যেই অসীমের ইঙ্গিত আছে, আমরা ধরতে পারিনা তাই।

বুরহান বলল ঃ তাই হোক বন্ধু তাই হোক। এই সীমার মধ্যে তুমি অসীমের সন্ধান কর, তবু তোমাকে আমরা পাই। কিন্তু শুনেছ তো......

ভূষণ তাকাল বুরহানের দিকে। বুরহান বলল ঃ রিহানও সেই একই আকর্ষণে পড়েছে।

—মানে?

—আসমানতারার আকর্ষণে।

শুনে একটু দুঃখিত হল ভূষণ।

বুরহান বলল ঃ রিহানের মত ছেলে এই ভুল করবে এটা ভাবতে পারিনি।

ভূষণ বলল ঃ এই ভুল স্বাভাবিক। অন্তরের দৃষ্টি না ফুটলে এমনই হয়। ঐ যে আকাশ, দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—মনে হয় দিগন্ত ঘিরে একটি সীমা রচনা করে রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তো সে অসীম। যে দেখতে পায় না সে ঐ দিগন্তের নত আকাশকেই শেষপ্রান্ত বলে ভাবে। কিন্তু যদি সে অনবরত ঐ দিগন্তের দিকে চলতে থাকে তবে বুঝবে আকাশের সীমা নেই। কিন্তু যদি বসে থাকে দেখবে আকাশ সীমিত। চমনলাল আর রিহান বসে থেকে আসমানের রূপ দেখেছে, তাই তাকে সীমিত করে দেখেছে। আসমানের দিকে যদি আরও একটু এগিয়ে যেত দেখতে পেত আসমান অসীম। তখন আকর্ষণ অসীমের ইঙ্গিতে ভাবের রাজ্যে, অরূপের মাধুরীর রাজ্যে গিয়ে পৌঁছতো। ওরা আসমানের কাছে এগুবার চেষ্টা করেনি। একমাত্র প্রেমের পথ ব্যতীত যে সে দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। যতক্ষণ এই বিশ্বপ্রকৃতির রূপের দিকে তাকিয়ে থাক, এই বৃক্ষ আর এই ফুল, এই লতা আর এই পাতা, এমনি করেই দেখ, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়ের স্বাদ। যখনই এর মধ্যে একটা রসের উচ্ছল প্রবাহ দেখ, যখনই তার মধ্যে একটা অশ্রুর প্রবাহ লক্ষ্য কর, দেখবে সব অতীন্দ্রিয়। ওরা আসমানের অশ্রু দেখেনি, তাই সীমার বন্ধনে আকর্ষণের দে'য়ালে বার বার আঘাত খাচ্ছে।

বুরহান বলল ঃ রিহানটা এতই দুষ্মন হয়েছে যে, চমনলালটা যে ওরই জন্য ধরা পড়েছে এটা ও স্বীকার করতে চায় না। নিজের দোষটা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়।

ভূষণ বলল ঃ এও স্বাভাবিক। যতক্ষণ আমরা সীমার দে'য়ালে আঘাত খাই, ততক্ষণ 'আমি' আছি; যখন দে'য়াল আর থাকে না তখন নিজেকে কোন কিছুর মধ্যে হেলিয়ে

রেখে দেখতে গিয়ে শুধু হারিয়েই যাই। হারাতে হারাতে তখন আর নিজের বোধ থাকে না।

—চমনলালের বৌটা আমার কাছে কাঁদছিল।

ভূষণ বলল : চোখে যদি অশ্রু এসে থাকে তবে আর দুঃখ নেই। সেই অশ্রু আমার কৃষ্ণের জন্য ঝরুক।

বুরহান বলল : চমনলালকে বাঁচাবার কি উপায় করা যেতে পারে বলতে পার?

—কোথায় বাঁচাবে তাকে? আমরা আজ তাকে কারাগারে বন্দী দেখছি, কিন্তু সে কি মুক্ত ছিল বাইরে থেকেও? ওর চেয়ে ছোট একটি কারাগার দেহের কারাগার। আসমানের দেহের কারাগারে সে এতদিন বন্দীই ছিল। আজ প্রাচীরের আড়ালে সে হয়তো আকাশ দেখতে পায় না, কিন্তু সেদিন আকাশের নীচে থেকেও কি সে আকাশের দিকে তাকাতে পেরেছে? বন্দী যে হতে চায় তাকে মুক্তি দেবে কে?

—কিন্তু ওদের কি মুক্তি নেই?

—মুক্তি আছে। সেই মুক্তি আসবে নিজের মধ্যে তাকাতে পারলে তবে। কিন্তু অশ্রুর বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে না পারলে যে সেই বোধ আসবে না। নিজেকে দীন হতে দীন ভাবতে হবে। শুধু 'তুমি' 'তুমি', এইটুকু ভাবতে হবে, কাঁদতে হবে। নিজেকে হারিয়ে নিজের যে বিরাট রূপের সন্ধান মিলবে তার তুলনা নেই।

—সে বোধ কি করে আসবে?

—আঘাতে।

—আঘাতে?

—হাঁ। আঘাতের মধ্যেই মানুষ উদার হয়। দুঃখের মধ্যে মানুষ মহত্তর কিছুর সন্ধান পায়।

বুরহান বলল : বন্ধু, তাহলে বুঝি সেই দুঃখের দিন এসেছে।

ভূষণ তাকিয়ে থাকল বুরহানের মুখের দিকে।

বুরহান বলল : শুনেছ নিশ্চয়ই যে, গৌড়ে নহবৎখানায় বিশ্রী একটা রোগ দেখা দিয়েছে?

—কি রোগ?

—কেউ বলতে পারছে না। যার হচ্ছে সেই মরছে। প্রায় গোটা বিশেক লোক এ পর্যন্ত গেল। রোগ ছড়াচ্ছেই। ভয়ে সমস্ত সুখশান্তি চলে গিয়েছে।

ভূষণ হেসে বলল : 'ভয়কি বন্ধু। এইতো সুযোগ। সেবার অধিকার পাবার এইতো সুযোগ। কোথায় রোগ হয়েছে, চল, চল, আমি যাব।' যেন একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল ভূষণ।

বুরহান বলল : সেকি দোস্ত্! সে যে মারাত্মক রোগ। কাছে গেলে তোমারও হতে পারে।

ভূষণ বলল : তাই ভয় করে দূরে থেকে সেবার যে আনন্দ তা থেকে বঞ্চিত হবে?

বুরহান ভূষণের দিকে তাকিয়ে দেখল, মৃত্যুভয় আর তার মধ্যে নেই। সে বলল :

চল। কেন যেন ভূষণের পাশে এসে অলৌকিক এক আনন্দের স্পর্শ লাগল তার অন্তরে। মুহূর্তে সে নিজের ভয়ের দীনতা কাটিয়ে উঠল।

বুরহান একটি এক্কা করল।

ভূষণ বলল: সেবার কাজে এক্কা কেন?

বুরহান বলল: অনেক দূর তো, চল গাড়ীতেই যাই।

ভূষণ বলল: না, চল হেঁটে যাই।

বুরহান বলল: কিন্তু ওরাও তো সেবার জন্যেই বসে আছে, ওদের বঞ্চিত করে লাভ?

তাই তো! কথাটা যেন কেমন লাগল ভূষণের। সে বলল: চল তবে এক্কা নিয়েই যাই।

ওরা দুজন এক্কায় চাপল।

বেশ কিছুক্ষণ চলবার পর এক্কা এসে পৌঁছুল নহবৎখানার কাছে।

কিন্তু হঠাৎ হাবসী খোজা বর্শা উঁচিয়ে ওদের গাড়ী থামিয়ে দিল: হুকুমদার।

গাড়ী থামল।

খোজা বলল: কোথায় যাবেন?

—নহবৎখানায়।

—ওধারে যাওয়া মানা।

—কেন?

—কোতোয়াল সাহেব হুকুম দিয়েছেন। বিশ্রী রোগ এসেছে, তাই কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না।

বুরহান তাকাল ভূষণের দিকে।

ভূষণ বলল: চল ফিরে যাই, প্রভুর ইচ্ছে নয় এখনি আমাদের সেবার অধিকার দান করেন। একদিন আবার হয়তো তিনি নিজেই আমাদের ডাকবেন।

বুরহান খোজাকে জিজ্ঞেস করল: রোগটা কিরকম চলছে?

—বহুৎ লোক মারা যাচ্ছে জনাব। হেকিমেরা ভয় পেয়েছেন।

বুরহানের চোখে একটা ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল।

ভূষণ বলল: ভয় নয়, দুঃখ নয়, সবই তাঁর দান হিসেবে মনে করতে হবে; যেখানে বৃক্ষের একটি পত্রও তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত নড়তে পারে না, এত বড় যে একটা মৃত্যু তা কি তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছে? তা নয়। সবই তাঁর ইচ্ছা। তাঁর কোন কাজের বিরুদ্ধেই আমাদের কোন প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। যদি তাঁর সব দান অম্লান চিত্তে গ্রহণ করতে পার, দেখবে সর্বত্র সমান প্রশান্তি। মৃত্যুর কালো আবরণের আড়ালে শয়তান ঘোরে, মৃত্যুর মূল অর্থটাকে সেই ভুল বুঝিয়ে দেয়। মৃত্যুকে ভয় করলে আমরা শয়তানের হাতে গিয়ে পড়ি—অর্থাৎ আমরা ভগবানকে বিশ্বাস করতে পারি না।

গাড়ী ফিরে চলল।

বুরহান বলল: আল্লাহ্‌তালার কি উদ্দেশ্য তিনিই জানেন। মানুষ তাকে ভুলে ছিল, তাই কি তিনি শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছেন?

ভূষণ বলল ঃ ওকথা বোলনা, ওকথা বোলনা। পিতা কি কাউকে শাস্তি দেন? সন্তানের কাছে যেটা শাস্তি বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য অন্য। আমরা সন্তানেরা বুঝিনা বলেই পিতার প্রতি দোষারোপ করি।

বুরহান বলল ঃ কি জানি, আল্লার কি ইচ্ছা পূর্ণ হবে তিনিই জানেন।

ভূষণ বলল ঃ হ্যাঁ, এই বিশ্বাসই শুধু রাখতে হবে তাঁর উপর। আর শুধু মনে মনে বলতে হবে, প্রভু, আমি দীন, আমাকে তুমি সেবার অধিকার দান কর!

ভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই দীনতার স্নিগ্ধ স্বাদ গ্রহণ করবার চেষ্টা করল বুরহান। সত্যি যেন শরতের একটা স্নেহসিক্ত ভাব ফুটে উঠেছে ভূষণের সর্বাঙ্গে। অম্লান একটি মধুর হাসির দীপ্তিতে সে উদ্ভাসিত। যেন শেফালী ফুল। শিশিরের অশ্রু পাপড়িতে নিয়ে পড়ে আছে। একটি ম্লান স্পর্শ তার হলুদ বৃন্তে, কিন্তু হাসির অভাব নেই। কোথায় দেখতে পেল ভূষণ সেই দুই ফোঁটা অশ্রুবিন্দু, যা তার জীবনে পরম শ্রেয়কে নিয়ে এল? রিহান নিজের বুকে নিজে ক্ষত সৃষ্টি করে যন্ত্রণায় ভুগছে, চমনলালও। কিন্তু কখনো যদি ভূষণের মত আপন অন্তরের গহন গভীরে ডুব দিয়ে একবারও নিজের সন্ধান করতো, তবে বেদনাহীন মধুর স্নিগ্ধ একটি শ্বেত শেফালী ওরাও কি ফোটাতে পারত না?

গাড়ী এসে দক্ষল দরওয়াজাতে থামল।

ওবা দুজন গাড়ী থেকে নেমে পড়ল।

বুরহান বলল ঃ দোস্ত্ আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

—যেদিন তাঁর ইচ্ছে হবে সেই দিনই দেখা হবে। আমি তুমি কথা দেবার কে বুরহান?

বুরহান বলল ঃ ভাই আমি তোমার মত সেই নিবিড় আনন্দের সন্ধান পাইনি। তাই এখনো নিজেকে ভুলতে পারিনি, প্রতি কাজেই তাঁকে মনে করতে পারিনা। ভুলে যাই।

ভূষণ বলল ঃ সেও তাঁরই ইচ্ছা।

ওরা তখন হেঁটে যে যার গৃহের দিকে যাবার চেষ্টা করল।

হঠাৎ এমন সময় পেছনে কিসের শব্দ শুনে চমকে উঠল দু'জনে। ওরা দেখল, একটা এক্কা গাড়ী এসে থামল রিহানের ঘরের সামনে। বুরহান তাকিয়ে দেখল, সেই গাড়ী থেকে নামল রিহান নিজে। সে টলছে। টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে কো'ন রকমে দরওয়াজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। গাডী চলে গেল।

বুরহান ভূষণকে বলল ঃ নেশা করেছে রিহান। একদিন চমনলালও এমন করেছিল।

ভূষণ রিহানের দিকে তাকিয়ে দেখল। একটু ব্যথা পেল। বলল ঃ নিজের যন্ত্রণা ভুলবার জন্য নেশা করেছে। কিন্তু হায় এ নেশা যে যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে দেয়! যে নেশা করলে এ যন্ত্রণা মুহূর্তে দূরে চলে যেত সেই ঈশ্বরের প্রেমসুধার সন্ধান ওরা পেল না। কেন যে পেল না, কে জানে! ভুলটা কি ওদের? তাইবা বলি কি করে। একদিন মনে হোত, মানুষ ভুল করে। আজ মনে হয়, মানুষের কিছু করবার নেই। সবই যখন তাঁরই ইচ্ছায়, এও নিশ্চয়ই তাঁরই খেয়ালে হয়েছে। এ খেলাতে যে তাঁর কি আনন্দ তিনিই জানেন। যন্ত্রণার মধ্যেও বুঝি আনন্দ আছে। তাইতো মানুষ যে চিন্তার মধ্যে যন্ত্রণা আছে, তাকে ভুলতে পারে না; আঘাত পেয়েও তাকেই আঁকড়ে ধরে। কৃষ্ণ

হয়ে যিনি বাঁশী বাজিয়ে রাধাকে কাঁদান, তিনিই আবার ছিন্নমস্তা হয়ে নিজের রুধির নিজে পান করেন। এ সবেই তাঁর আনন্দ, সবই তাঁর লীলা, আমরা বুঝতে পারি না। হঠাৎ ভূষণ কেঁদে ফেলল : প্রভু, আমি বুঝতে চাইও না। আমায় তুমি শুধু কাঁদাও, কাঁদাও!

সেই আবেগবিহ্বল এক অলৌকিক মূর্তির দিকে বুরহান তাকিয়ে থাকল। তার মনে হল সেও কাঁদে!

ওরা দু'জনেই এইভাবে কিছুকাল দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বুরহান বলল : চল ওকে ঘরে তুলে দিয়ে আসি।

—চল।

ওরা কাছে এগুল। কিন্তু ওদের দেখতে পেয়েই রিহান ধমকে উঠল : হট্ যাও, তফাৎ যাও। মেহেরবানী চাই না কারো। আমি কেড়ে নেব, আমি কেড়ে নেব। আমি খুন করব, আমি খুন করব।

ভূষণ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল : কাকে খুন করবে বন্ধু?

হঠাৎ এই কণ্ঠস্বরটি উন্মত্ত অবস্থায়ও যেন রিহানের হৃদ্‌পিণ্ডে গিয়ে আঘাত করল। একটুখানি সে তাকাল ভূষণের দিকে। তারপর মুখখানা বিকৃত করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভূষণের বুক লক্ষ্য করে ঘুষি তুলল। কিন্তু শক্তি তখন তার নেই, সেই ঘুষি অলস একটি ফুলের মত আপনিই ঝরে পড়ে গেল। রিহান সক্রোধে কেঁদে উঠল : তুই দুষ্‌মন, দুষ্‌মন। আসমানকে তুই কোথায় নিয়েছিস্ বল্, বল্। আমি তোকে খুন করব।

বুরহান বলল : হায়, একি পরিণতি!

দুদিন পূর্বে রিহানের উপর তার যে ঘৃণা জন্মেছিল, তা যেন মুহূর্তেই উবে গেল। শুধু একটা নিবিড় সমবেদনায় তার বুক ভারাক্রান্ত হয়ে থাকল।

ভূষণ বলল : দোস্ত্, ওকে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

—হ্যাঁ।

বুরহান দরওয়াজাতে আঘাত হেনে বান্দাকে ডাকল : এই কে আছ?

সাড়া পেয়ে বান্দারা বাইরে এল।

বুরহান বলল : মালিককে ঘরে নিয়ে যাও।

বান্দারা রিহানকে ধরাধরি করে বৈঠকখানায় নিয়ে চলল।

চিৎকার করতে লাগল রিহান : ছাড় আমাকে, দুষ্‌মনের মেহেরবাণী চাইনা।

বুরহান তাকালো ভূষণের দিকে : হায়, অন্ধ, অন্ধ রিহান। তার করুণা না হলে, কি কিছু মেলে? খুদার মেহেরবানী চাই। আপন শক্তির উপর বিশ্বাস হারাতে না পারলে কিছুই হবে না। কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকেই পাওয়া যাবে না।

ভূষণ বলল : আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না ভাই। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমি কিছু জানি না বন্ধু। আমি কিছু জানি না। আমার শুধু কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ঈশ্বর কে, আমি কে, তুমি কে, কেন এই খেলা?

বুরহান কিছুকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বলল : যাও বন্ধু, রাত্রি সুখের হোক।

ভূষণ এগিয়ে চলল নিজের গৃহের দিকে।

বুরহান এগুল তার নিজের ঘর লক্ষ্য করে।

ভূষণ কিছুদূর এগিয়ে গেল। একবার তার দিকে ফিরে তাকালো বুরহান। কোথায় যাচ্ছে ও? কে অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য? কেউ নেই, এমনকি একজন বান্দা পর্যন্ত্য নয়। অন্ধকার ঘর। কিন্তু তক্ষুণি হঠাৎ তার রিহানের কথা মনে পড়ল। বান্দাবাঁদীর অভাব আছে কি তার? তার বেগম পর্য্যন্ত ঘরে অপেক্ষা করে আছে। আলোর অভাব নেই। সেই ঘরে ঢুকে আলোর রোশ্‌নাই কি তার চোখে পড়বে? কিন্তু অন্ধকার ঘরেও ভূষণের জন্য যে আলো অপেক্ষা করে আছে তা অম্লান।

ভূষণ ঘরে ঢুকল। কেউ নেই। চতুর্দিকে অন্ধকার। কিন্তু তবু যেন কেন তাকে একা মনে হল না। মনে হল, সেই অন্ধকারের বেষ্টনীতে কিসের যেন স্পর্শ আছে। অন্ধকার মধুর। যেন সেই অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে কার চক্ষু। সে হাসছে, হাসছে। বলছে, দেখতে পাচ্ছ না আমায়? ভূষণ তাকেই যেন দেখতে চেষ্টা করল। বলল: ওগো, কোথায় তুমি? তুমি কোথায়?

অসহায় রিহানের মুখখানা তার মনে পড়ল। কারাগারে চমনলালের বেদনাতুর চোখ দুটি যেন তার কাছে ভেসে এল। কী অসীম যন্ত্রণাতে কাতর ওরা! ওদের কী যন্ত্রণা! ভূষণ বলল: ওগো প্রভু ওই যন্ত্রণা আমায় দাও, আমায় কাঁদাও, ওদের মুক্তি দাও তুমি। তুমি শুধু আমার অশ্রুর উৎসটি কখনো শুকিয়ে দিও না! আসমানতারার মুখখানি মনে পড়ল। কী সুন্দর! কী অপূর্ব সুন্দর! অথচ কী বেদনার! চোখের মণি দুটি কী গভীর কালো। সে চায়। কাকে চায? সে চোখে চিরন্তন কামনা কার জন্য? ওগো প্রভু, ওকে আর ব্যাথাতুরা করে রোখো না, মুক্তি দাও। শুধু আমায তুমি মুক্তি দিও না, আমায তুমি কাঁদিও, কাঁদতে যে আমার বড় ভালো লাগে। আমি যখন তোমার কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াবো, আমায় তুমি দিও না। বিশ্বের সকালে তোমার সন্তান। তোমার পরম স্নেহে তাদের মুখমণ্ডলে অপূর্ব হাসির ছটা ফুটেছে এই যেন দেখতে পাই। আমি যেন লুকিয়ে দেখি। তোমার কাছে যাবার যেন সাহস না হয়। আমার যেন ভাল লাগে, ওরা সুখী খুব সুখী একথা ভাবতে যেন আমার ভাল লাগে। ওগো আমার চোখের অশ্রুবন্যায় যেন অপরের জন্য মঙ্গল ভেসে আসে!

বিরাট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেই অন্ধকারের মধ্যে ভূষণ তাকালো উর্দ্ধ দিকে। কি দেখবার চেষ্টা করল। তারপর আর একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে প্রদীপ ধরাতে গেল। প্রদীপ জ্বলল। নিরাভরণ গৃহের চতুর্দিকে এক নিবিড় শূন্যতা। কেউ সেখানে ভূষণের জন্য আপক্ষা করে নেই। আজ বহুদিন ধরে কেউ সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে না।

অপর গৃহে যখন সন্তানের প্রত্যাগমনে মায়ের মুখে হাসি ফুটে, যখন প্রেমের ডালি সাজিয়ে স্ত্রীরা বসে থাকে, আত্মীয় স্বজনের কলহাস্যে গৃহে উৎবের মুখরতা সৃষ্টি হয়, ভূষণের গৃহে তখন কেউ থাকে না। শুধু এক বিষন্ন শূন্যতা। সেই শূন্যতা এক অজ্ঞাত অভিমানে ভূষণের চোখের জল নিংড়ে বের করে। একটু কাঁদে ভূষণ। আজো সে একটুখানি কাঁদল। তবু এই ভালো, ওগো আমার অন্তরময় দেবতা এই ভালো! কাঁদতে আমার

ভালো লাগে। কাঁদলে পরে সেই অসীম অনন্তলোকের সন্ধান পাই। না কাঁদলে যে তা পাওয়া যায় না! কিছুক্ষণ কাঁদল ভূষণ, তারপর কি খেয়াল হল প্রদীপের ম্লান আলোতে কাগজ নিয়ে বসল, কলম নিল। লিখতে লাগল ঃ

"মুঝে নয়ন ভরি দেহ বারি!
ধরা না দিও বনয়ারী॥
শাখে ফুল দিও, পন্থে তৃণ।
সুখবদন ভরি ফুল্ল বীণ॥
মুঝে রহব তুয়া পন্থ নেহারি।
ধরা না দিও বনয়ারী॥

স্বপ্নমাখা চোখ দুটিতে ভূষণ আবার যেন কা'র দিকে তাকাল। কাঁদল। মনে মনে বলল ঃ শ্রম আমাকে দাও, আমি পথ তৈরী করব। পথের উপর আমাকে বুক পেতে পথিকের পদাঘাত নিতে দাও, যেন পথের কষ্ট না হয়। চরণক্ষত আমার বুকের উপর অঙ্কিত হোক। ওরা যেন সুখী হাতে পারে।

ওরা কারা? সেই সম্মিলিত মানব তীর্থযাত্রীদের রূপ কেমন কে জানে! পথের শেষে সেই পুণ্যতীর্থে তাদের বিশ্রামের মুহূর্তে মুখমণ্ডলে যে আনন্দের ছটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা কে জানে? সেই আনন্দের মধ্যে কি অপূর্ব পুলক আছে? হযতো আছে। ভূষণ সেই ইঙ্গিতের অলৌকিক স্বাদে মুগ্ধ। সে ধীরে ধীরে মৃত্তিকার উপরেই দেহখানা এলিয়ে দিল। আধো জাগরণ, আধো ঘুমের মধ্যে সে কোন্ এক অসীম বেদনভরা জগতের সীমান্তপ্রদেশে যেন বিচরণ করতে লাগল। কি যে তার মনের মধ্যে ভাব জাগতে লাগল ভূষণ নিজেই বুঝতে পারল না। সেই অবস্থাতে সে যে কখন কি অসীম নীরবতার রাজ্যে নিদ্রার সঙ্গে জড়িয়ে গেল তা নিজেই জানল না।

যখন তার ঘুম ভাঙল দেখল শিশিরের আবেগে জড়িয়ে প্রভাত এসেছে। সমস্ত প্রভাতের ছায়ার মধ্যে এক পরম রমণীয়ের স্পর্শ। বড় শান্ত, বড় স্নিগ্ধ। সে উঠে পড়ল। তারপর হাঁটতে লাগল।

তখনো নিদ্রালস্য কাটিয়ে জীবনের কল্লোল ফোটেনি গৌড় নগরীতে। দেওয়ালে দেওয়ালে, পথে পথে,.এক অবর্ণনীয় স্পর্শ। যেন সে এসেছিল, সে এ পথের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে। সেই পথের গন্ধ নিতে নিতে, সেই পথের স্পর্শ নিতে নিতে ভূষণ এগিয়ে চলল। আপন অজ্ঞাতসারেই এগিয়ে চলল। চলতে চলতে সে এগিয়ে গেল পশ্চিমগড়ের দিকে।

তখন কেবলমাত্র সোনার প্রভাত প্রস্ফুটিত হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমগড়ে পাখীর কণ্ঠও থেমে আছে। একটি নির্জন কক্ষ থেকে মধুর করুণ সুর ভেসে আসছে ঃ"বড় বিশোয়াসে তুয়া পন্থা নেহারি—" ভূষণ শুনল। দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। তার সমস্ত দেহের মধ্যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অব্যক্ত ভাবের স্রোত বয়ে গেল। আপন অজ্ঞাতসারেই বোধহয় সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ভাবে বিভোর আসমানতারা গান গাইছে। তার দুই চোখে অশ্রুর প্রবাহ। সেই প্রবাহ যে প্রবাহ একদিন সমস্ত বন্ধনের বাঁধ খুলে ভূষণকে পথে নামিয়েছে, যে-প্রবাহ আজো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, যে প্রবাহ তার অংহবোধকে বিলুপ্ত

করে দিয়ে তাকে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে, অচেতনের মধ্যে চেতনের স্পন্দন অনুভব করতে দিয়েছে। ভূষণ নির্বাক তাকিয়ে তাকল।

গান শেষ হলে আসমানও তাকালো তার দিকে। কথা বলতে পারল না, শুধু তাকিয়ে থাকল। দুজনে দুজনের দুটি নিবিড় চোখের মধ্য দিয়ে কোন্ অনন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল যেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটল। তারপর আসমান জিজ্ঞাসা করল : আর কতদূর বন্ধু?

ভূষণ বলল : আর তো দূর নেই আসমান! তোমার চোখের মধ্যে তুমি তাকে পাওনি? তোমার চোখের জল আমাকে ভাসিয়েছে, তোমাকে ভাসায় নি?

আসমান বলল : আমি যে আর আমার নিজেকে চিনতে পারছি না বন্ধু?

ভূষণ বলল : নিজেকে হারাতে পারলেই যে তাঁকে মেলে আসমান ।

—তোমাকে মেলে?

—আমাকে মেলে, তোমাকে মেলে, আমার মধ্যে তাঁকে মেলে।

আসমান ভূষণের বুকের মধ্যে নিজের মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

কান্নাই যে ভূষণ ভালবাসে। তার বুকের মধ্যে আসমানের চোখের জল ঝরতে লাগল। ভূষণের মনে হল সে যেন এই বিস্তির্ণ বিশ্বের উদার আকাশের নীচে আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। আকাশের বুক থেকে সেই মাঠের উপর স্বর্গের করুণা নিয়ে শিশির বিন্দু ঝরে ঝরে পড়ছে। আর সমস্ত উত্তাপ সেই ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে তুলে দিয়ে নিগ্ধতর হচ্ছে পৃথিবী। সে চোখ বুজে সেই অপার্থিব শিশিরের পরম প্রেমময় স্পর্শ অনুভব করতে লাগল।

আসমান একটু পরে মুখ তুলে তাকাল : ক্লান্ত তীর্থযাত্রীরা বড় কষ্ট পাচ্ছে ভূষণ, তোমার মন্দির কতদূর?

ভূষণ বলল : তোমার মন্দির উঠছে। ছায়া পড়বে তার। ক্লান্ত পথিকেরা এসে দগ্ধ দেহ জুড়াবে।

আসমান বলল : ভূষণ, তার দেয়ালে দেয়ালে আমার এই অশ্রু এঁকে দিও তুমি। পথে পথে আমর নাম লিখে দিও। যেন অমার বুকের উপর দিয়ে তারা আসে। যেন তাদের পায়ে কাঁটা না ফুটে। আমার অশ্রু লেপে দিও সেই ধর্মশালার চূড়াতে। যেন শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মত সেই অশ্রু ঝরে পড়ে তাদের উপর। ভূষণ, আমার যে প্রাণ ভরছে না। আমার বুকের মধ্যে ক্ষত চিহ্ন ফুটে উঠেছেনা তো? আমি যে পরম আনন্দে সেই যন্ত্রণা বহন করতে পারছি না? কবে আসবে সেই দিন?

ভূষণ বলল : সে দিন আসবে। নিখিলের সত্তাতে তুমি বিলুপ্ত হবে, আমি লুপ্ত হব।

আসমান বলল : প্রভু আমাকে সেবার অধিকার দিলেন না তো এখনো?

ভূষণ বলল : জগতের কল্যাণে তোমার এই যে সেবার আকাঙ্ক্ষা তা যে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বনিখিলের হৃদয়তন্ত্রীকে ব্যাকুল করে তুলেছে আসমান। কোথায় আজ তোমার সেবা'নেই? গৌড়ের পথে দেখেলুম আজ পরম স্নিগ্ধতা, যেন দেওয়ালে

দেওয়ালে প্রেমিকার অশ্রু। পথের উপর দিয়ে পেলুম শ্যামল মৃত্তিকার কচি স্বাদ। তোমার বুকই যে ছড়িয়ে রয়েছে এই পথের উপর আসমান।

আসমান বলল ঃ "ওগো তুমি এসেছ? এই পথের উপর আমার বুকের স্পর্শ তুমি পেয়েছ? তোমার চরণে বাজেনি? ওগো দাও, দাও, তোমার সেই চরণদুখানি আমায় দাও আমি বুকে ধরি।" আসমান ভূষণের পা দুখানি নিজের উন্নত বক্ষের উপর রাখল। চোখ বুজল। নিবিড় প্রশান্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। বলল ঃ ওগো বিশ্বজন কবে, কবে আমি এমনি করে তোমাদের অসংখ্য চরণ আমার এই বুকের উপর নিতে পারব? তোমার চরণ ধূলির স্পর্শ নিতে পারব আমার বুকে?

ভূষণ আসমানের মুখের দিকে তাকালো, আবার তার চোখের কোন্ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। যেন অলস দুটি দুয়ার খুলে গেল। সেই পথে প্রবাহ নামল।

শুধু এক অকারণ পুলক। শুধু এক স্বতস্ফূর্ত কারণহীন অশ্রুর উচ্ছ্বসিত উদ্বেগ। কেন কে জানে? ভূষণ জানে না, আসমান জানে না। জগতের অলক্ষ্যে, কার করুণার পরম রাগিনী শুধুই বেজে চলেছে। হঠাৎ কার শ্রবণে কখন সেই অশ্রুতরাগিনী ঝঙ্কার তোলে কে জানে! কেন তোলে কে জানে! আবার অসংখ্য শ্রবণ কেন সেই আহ্বানের পথে রুদ্ধ হয়ে থাকে কে বলবে।

কেন কলহাস্যে, কলকণ্ঠে, নতনেত্রে, স্তব্ধ আবেগে, সিক্ত অশ্রুতে অলক্ষ্যের দিকে জগতের এক ব্যাখ্যাতীত বিচিত্র ছন্দের গতি কে বলতে পারে! সেই অসীম রহস্যের কাছে শুধুমাত্র গতির এক নিবিড় অব্যক্ত এগিয়ে চলবার আহ্বান ব্যতীত আর কিছুই শোনা যায় না। সেই আহ্বানে হঠাৎ ভূষণের বুকখানাও উদ্বেলিত হয়ে উঠল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে কণ্ঠে এক অপূর্ব সুরের ঝঙ্কার তুলল ঃ

"চল মন বৃন্দাবন।
রহুঁ রহুঁ আঁখে, ছলকি যমুনা ডাকে,
চমকি চমকি উঠ মন॥"

একটি মুগ্ধ হরিণশিশুর মত আসমান সেই আহ্বানব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার চোখের যমুনাতে জোয়ার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

তেইশ

"তোমার আমার মাঝখানে বঁধু অশ্রুর পারাবার
কেমনে হইব পার।"

—'শবনম' থেকে

সন্ধ্যা বেলায় বুরহান আবার একা গিয়ে বসল সেই দরজার দরওয়াজার কাছে। ভূষণের মত তার অত ভাবনা নেই। নেই বললে ভুল হবে, তেমন স্নিগ্ধ ভাবনা নেই। তার

ভাবনার প্রত্যেকটির মধ্যে যেন বোলতা লুকিয়ে আছে। ভাবনার চাকে নাড়া দিলেই যেন উড়ে এসে হুল ফুটিয়ে দেয়। যে ভাবনা ভূষণের চোখে অনন্দের অশ্রু আনে, সেই ভাবনা শুধুমাত্র বুরহানের বুকের মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। চমনলালের মুখ যদি তার মানস চক্ষে ভেসে উঠে, জীবনের ব্যর্থ পরিণামের কথা ভাবতে তার ভয়ের শিহরণ জাগে। রোজ আসছে পদ্মাবতী। সে তাকে ভাই বলে গ্রহণ করেছে। অথচ বহিনের জন্য তার কিছুমাত্র করবার নেই। সেই অসহায় নারীর করুণ ক্রন্দন একটা নদীর স্রোতের মত তার বুকের কূলে এসে আছড়ে পড়ে বুক ভেঙে দিতে চায়।

রিহানের কথা ভাবলে, মানুষের নীচুবৃত্তির জঘণ্য উদাহরণ ব্যাধের নিক্ষিপ্ত তীরের ফলকেব মত তার বুকের উপরে এসে পড়ে। যন্ত্রণায় সে ছটফট্ করতে থাকে। গৌড়ের আকাশে যে অজ্ঞাতনামা ব্যাধি মৃত্যুর ছায়া ফেলেছে তার কথা ভাবলে অন্ধকার রাতের এক নিস্তব্ধ ভীতি বুকের মধ্যে থম থম করতে থাকে। কোন ভাবনাতেই শান্তির এতটুকু মাত্র প্রলেপ নেই। অথচ আশ্চর্য্য স্বভাব এই মনের, সেই বেদনার কথা চিন্তা না করে যেন উপাযই নেই। ভাবনাগুলো কাকের মত চতুর। স্থির মনের উপবে বসে খুঁটে দেবার অভিনয়ে রক্ত বের করে খাচ্ছে। যন্ত্রণা হচ্ছে অথচ ভাল লাগছে। কিন্তু কাককে উড়িযে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গোবৎসের সঙ্গে কাকের মিতালীর মত ভাবনাগুলোব সঙ্গে একটা কেমন যেন সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। একটা অসহায় বুদ্ধিহীন বলদেব মত সেই ভাবনাগুলোকে গ্রহণ না করে উপায নেই।

• তাই বুবহান আজো বসে ভাবছিল। ভাবছিল সব কিছুই, বিশেষ কবে সেই নবাগত ব্যাধির কথা। সে জানে সংবাদ আসবে আরো খারাপ। তবু সেই সংবাদেব জন্য তাব অপেক্ষার অন্ত নেই। সে অপেক্ষা কবছিল আলাউদ্দিনেব জন্য। আলাউদ্দিন তাব সংবাদ বাহক। নতুন যুগের মানুষ আলাউদ্দিন। পুরানো স্মৃতিমুগ্ধ যেকোন মানুষের কাছে কোন সংবাদ বেদনার ছাড়া আব কিসেব হতে পাবে? তবু অতীতের অপরিহার্য্য স্মৃতির সঞ্চারে যারা নতুনের মধ্যে এসে পড়েছে তাদের পক্ষে নতুনকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয। সেখানে থাকতে হলে দুয়েকে মিলিযে নিতে হয। কিন্তু মেলানো বড় কঠিন। একজন মরে গেছে আর একজন অতীতের বিশ্বাসেব মাথায় ধ্বংসের ভাঙন নিয়ে উদ্যত। দুই-ই বেদনার, বিয়োগের আব আঘাতের। তাই যুগ সন্ধিক্ষণের মানুষের বড় বেদনা। তাই তাব কল্পনায বিয়োগ, শিল্পে ব্যথা, বচনায় বিযোগ। সেই সন্ধিক্ষণেব রেখার উপর দাঁড়িয়ে বুরহান। দুঃখকে সে অতিক্রম করবে কি করে? যদি অশ্রু বন্যার আবেগে সে ভূষণেব মত ভেসে যেতে পারতো তাহলে মুক্তি ছিল। যদি চমনলাল আর রিহানের মত মরে যেতে পারত, আঘাতকে এড়াতে পারতো, কিন্তু সে যে একখণ্ড ভারি শিলার মত। স্রোতের বেগে কিছুটা এগিয়ে এসে থেমে পড়েছে। দুর সাগর তার চোখে পড়ল না। অতীতের চক্ষেও সে হারিয়ে গেল। নতুন পলিমাটি তার চতুর্দিকে জমে উঠল। সে মাটি তাকে গ্রাস করতে চাচ্ছে। বুরহান অসহায়।

বুরহান অপেক্ষা করছিল আলাউদ্দিনের জন্য। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখতে পেল

ভূষণ আসছে। পরিচিত স্রোত তার বুকের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সাগরের দিকে। বুকপেতে সে তাকে ধরতে চাইল।

আপন মনে ভূষণ আসছিল, তন্ময়তায় কিংবা মন্মমতায় কে জানে?

বুরহান ডাকল তাকেঃ এই যে, এই যে দোস্ত্।

হঠাৎ অন্তরের মধ্যে অপসৃয়মান সেই দক্ষল দরওয়াজার কাছ থেকে ডাক শুনে ভূষণ চমকে উঠল! ফিরে তাকাল।

বুরহান কাছে এসে দাঁড়ালঃ এই যে দোস্ত্ সন্ধ্যার আঁধারে কোথায় চলেছ? এমন সময় কখনো তো তুমি গৌড়ের বাইরে যাও না?

ভূষণ বললঃ সন্ধ্যায়ই তো যাবার সময় বন্ধু। সন্ধ্যায় সূর্য পৃথিবীর একপৃষ্ঠ থেকে অপর পৃষ্ঠে যায়। জীবনসায়াহ্নে মানুষ এ জগৎ ছেড়ে চলে যেতে থাকে, দেখনি? সন্ধ্যায়ই তো যাবার সময়। সন্ধ্যায়ই তো চলবার সময়।

বুরহান বললঃ কিন্তু তোমার সূর্য তো এখনো পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েনি। এখনো তো সন্ধ্যা আসেনি, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

ভূষণ বললঃ তাহলে আমি পাখী, আমার চলবার সময় এসেছে, আমি চলছি।

বুরহান বললঃ সন্ধ্যার পাখীরা তো ঘরে ফেরে। চলে না তো?

ভূষণ বললঃ আমিও তো সেই ঘরের সন্ধানে চলেছি ভাই।

বুরহান বললঃ তুমি যে ঘর ছেড়ে চলেছ?

—ঘর! কোথায় ঘর? এই সবই আমার ঘর ভাই। দেখলুম এই মহাকালের বুকে পথই পরম আশ্রয়। পথের চেয়ে বড় ঘরে কেউ আর আশ্রয় দিতে পারে না। ঘরতো পিঞ্জর।

বুরহান বললঃ ভাই তুমি কি তবে আমাদের ছেড়ে চললে?

ভূষণ বললঃ কোথায় যাব তোমাদের ছেড়ে বন্ধু। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় তুমি নেই বল দেখি?

বুরহান বললঃ দোস্ত্ আমাদের দৃষ্টি সীমিত। আমরা যে অতদূর দেখতে পাই না। চোখের কাছ থেকে হারিয়ে গেলেই মনে করি হারিয়ে গেল। তুমি যাচ্ছ, এই দক্ষল দরওয়াজায় আমি একা থাকব কি শুধু অতীতের স্মৃতি চারণ করতে?

ভূষণ বললঃ দরওয়াজা! হ্যাঁ দরওয়াজায় তুমি থেকো বন্ধু। এই দরওয়াজা দিয়েই যে তিনি আসবেন। হারাবে কি, সব পাবে। সব পাবে।

ভূষণ দরওয়াজার পথে তাকিয়ে কি যেন দেখল। তারপর আবার বললঃ এইতো পথ, এই পথ দিয়েই তো তিনি আসবেন। তুমি তার সব দেখা পাবে বন্ধু। তারপর আবার হঠাৎ সেই পথ দিয়ে সে আর কোন কথা না বলে চলতে আরম্ভ করে দিল।

বুরহান অবাক হয়ে তার পথের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভূষণ ধীরে ধীরে দূর হতে দূরে চলে যেতে লাগল।

বুরহান আবার ফিরে গিয়ে সেই সিঁড়িটার উপর বসল। ভাবল, বিচিত্র দুনিয়া। এই পথ কাউকে গৌড়ে নিয়ে এল, কাউকে বাইরে নিয়ে গেল।

শুধু প্রবেশপথে বসে থাকল বুরহান। না পারল ভেতরের মোহে মুগ্ধ হতে, না পারল বাইরে যেতে। আল্লা কার জন্যে কি রেখেছেন কে জানে!

ভূষণ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

বুরহান আবার বসে ভাবতে লাগল।

আবার বোধহয় তার স্মৃতির মধ্যে অতীতের মধুর দিনগুলি ভেসে উঠবার চেষ্টা করল।

কিন্তু অনেকক্ষণ সে ভাবতে পারল না। তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। বুরহান দেখল ঃ আলাউদ্দিন আসছে। সে উৎকণ্ঠ আবেগে তার দিকে তাকাল। আলাউদ্দিন বড় ধীরে ধীরে আসছিল। যেন একটা আঘাতের ভারে সে ভেঙে গেছে। সে কাছে আসতেই ভূষণ জিজ্ঞেস করল ঃ কি গো, আজ তোমার দেরী?

বোবা দৃষ্টি মেলে আলাউদ্দিন তাকালো তার দিকে।

বুরহান জিজ্ঞেস করল ঃ কি খবর? রোগটা একটু কমল কি?

—না জনাব, আরো বেশ কয়েক জন মারা গেল।

—এ্যাঁ! আরো?

—হ্যাঁ জনাব।

বুরহান গম্ভীরভাবে ভাবল, এই ব্যাধি কি উদ্দেশ্যে যে গৌড়ে এসেছে কে জানে!

সে ম্লানমুখে আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার সেই হিন্দু বন্ধুটি কোথায়?

আলাউদ্দিন মাথা নীচু করে বলল ঃ জনাব সে নেই। এই ব্যাধি তকেও গ্রাস করেছে।

—হরিহর!

—জী জনাব।

পরিচিতের দিকেও তাহলে এই ব্যাধি হাত বাড়িয়েছে! তবে সে শুধুমাত্র নহবৎখানার দরওয়াজাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না—সমগ্র গৌড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সেই কথা ভাবতে একটা অসহায় ভীতি যেন বুরহানকেও জড়িয়ে ধরল। কিছুকাল সে নীরব থাকল, তারপর আলাউদ্দিনের দিকে ফিরে তাকালো। দেখল আলাউদ্দিন তেমনি মাথা নীচু করে আছে। যেন সে মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয়েছে বলে লজ্জিত। তার বন্ধুকে সে রক্ষা করতে পারেনি বলে লজ্জিত। শোকে সে মুহ্যমান। আলাউদ্দিনকে সে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। বলল ঃ খুব দুঃখ পেয়েছ না?

—লেগেছে জনাব।

—কিন্তু ব্যথা পেয়ে লাভ নেই। এই জীবনের রীতি। ঐক্য নয়, ভাঙনই যেন দুনিয়ার স্রোত। মৃত্যু অনিবার্য্য। সে তোমার বন্ধুকে নিয়ে গেছে। কিন্তু জীবনেই আমরা বন্ধুবিচ্ছেদের যাতনা ভোগ করছি। তুমি তো জান, এই দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়িতে একদিন তোমাদের মত আমরাও কয়বন্ধু ছিলাম। কিন্তু...”কথাটা আর শেষ করতে পারল না বুরহান। কোন্ এক বেদনার স্মৃতি এসে যেন তাকে স্তব্ধ করে দিল।

আলাউদ্দিনও মুহূর্তকাল নীরব থাকল। তারপর হঠাৎ একবার সে ঝড়ের বেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঃ জনাব মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে।

বুরহান আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল : হ্যাঁ, ঠিক্ বলেছ। যুদ্ধ করতে হবে। মৃত্যু আসবে হিংসা নিয়ে, আমরা এগুব প্রেম নিয়ে।

কথাটার অর্থ না বুঝতে পেরে আলাউদ্দিন তাকালো বুরহানের মুখের দিকে।

বুরহান বলল : হ্যাঁ, প্রেম দিয়ে। সেবাই সেই প্রেম। মৃত্যু নয়, কঠোর আহ্বান আমাদের কাছে এসেছে। আমাদের এগুতে হবে।

সে বলল : চল আমরা মৌলভি সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে নিয়েই এগুতে হবে।

বুরহান সিঁড়ি থেকে নামল, তারপর আলাউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ের মধ্যে প্রবেশ করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভূষণ এসে পৌঁছাল গুপ্ত বৃন্দাবনে। কালো ছায়া বৃন্দাবনকে ঘিরে ধরেছে। যেন সেই কালাচাঁদ কৃষ্ণ নিজে নেমে এসেছেন বৃন্দাবনের উপর। পরম তীর্থের মাটী স্পর্শ করতেই সে অঙ্গে এক অপূর্ব পুলক অনুভব করল। মাটীতে পড়ে সে প্রণাম করল। সেই মুহর্তে কানে ভেসে এল কার গানের সুর :

কালা তুয়ার লাগি আইলাম বৃন্দাবন।
কী রূপ দেখাইলা কালা, ভুলল আমার মন।।
পহেল দেখায় জীবন দিলাম সইপা গো
বঁধু জানল কি ?
নয়ন কটাক্ষ দিলাম তারে গো
বঁধুর প্রাণে হানল কি ?
আমার বুকে তুফান উঠল গো, প্রেম রহে না গোপন।।

গানটা কানে যেতেই ভূষণের প্রাণের মধ্যে সাড়া তুলল। এই নীরব অন্ধকারের বুকে একটা আকুল ক্রন্দনের মত মনে হল সেই গান। তাইতো! কালার রূপে মনতো এমনি করেই ভোলে! প্রথম দেখাতেই যে তাকে মন প্রাণ সঁপে দিতে হয়। আসমানের দুই ফোঁটা অশ্রুজলের মধ্যেই কি একদা হঠাৎ তার সন্ধান পায়নি ভূষণ? আর তার দেখা পেলে কি মনের প্রেম গোপন রাখা যায়? যায় না। স্বতই সে আপন বেগে হয় ক্রন্দনে, নয় অশ্রুর বিন্দুতে বাইরে বেরিয়ে আসে। সন্ধ্যার নির্জন মুহূর্তে সেই আকুল ক্রন্দন ভূষণের বুকে সাড়া তুলল। তাহলে বৈষ্ণবী কি কৃষ্ণপ্রেমে সত্যি পাগল? ভূষণ কি তাকে ভুল বুঝেছিল প্রথম দেখাতে?

ধীরে ধীরে এগিয়ে বৈষ্ণবীর ঘরের প্রান্তে দাঁড়ালো সে। সেই মুহূর্তে বৈষ্ণবীর গান শেষ হল।

ভূষণ বলল : বাঃ অপূর্ব গাইতে পার তো তুমি!

বৈষ্ণবীর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তাকালো ভূষণের দিকে :

—এই যে কালাচাঁদ এসেছ?

ভূষণ বলল ঃ সে কি বলছ, আমি যে তাঁর দাস ?

বৈষ্ণবী বলল ঃ সবই তিনি।

ভূষণ বলল ঃ সত্যি যদি সে দিব্যদৃষ্টি হয় তবে সবই সেই তিনি। শ্রীরাধিকারও সেই ভাব হয়েছিল। তা অপূর্ব তোমার কণ্ঠ গো বৈষ্ণবী, আমায মুগ্ধ করে দিয়েছ।

বৈষ্ণবী বলল ঃ তা হলে রাধার কটাক্ষপাত প্রাণে হেনেছে ?

ভূষণ বলল ঃ এমন আকুল কণ্ঠে ডাকলে, এমন আকুল আগ্রহে তাকালে তিনি কি আর দূরে থাকতে পারবেন ? তুমি পাবে গো, পাবে তাঁকে বৈষ্ণবী।

বৈষ্ণবী তার চোখের কোণে একটা ঠমকের ভঙ্গী টেনে বলল ঃ তাই কি সাঁঝের বেলা একেলা গৃহে কালাচাঁদের আবির্ভাব ? ঠাকুরের গৌড়ে থাকা হয় জানি। তা আজকে কি আকুল গোপিনীর করুণ নিবেদন শুনে ?

হঠাৎ ভূষণের মনেও সেই মুহূর্তে বাস্তব পৃথিবীর ছায়া পড়ল। বৈষ্ণবীর কথার ইঙ্গিতটা সে বুঝতে পারল। বৈষ্ণবী যুবতী। সুন্দরী। ভূষণ পুরুষ। যুবক। সেই পরম পুরুষের পাশে সে নিজেকে যতই প্রকৃতি বলে কল্পনা করুক না কেন এই প্রকৃতির সন্তানেরা তাকে পুরুষ বলেই ভাববে। তাই সে হঠাৎ লজ্জিত হল। তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালো ঃ ক্ষমা কোর গো বৈষ্ণবী আমি ভুলে গিয়েছিলুম। হঠাৎ গানের সুরটা কেমন আমায়..." সে ঘুরে দাঁড়ালো।

বৈষ্ণবী ডাকল, যেন একটা আকুলতাই ফুটে উঠেছে সে ডাকে ঃ সে কি গো ঠাকুর, সত্যি সত্যি চললে নাকি ? তা রাধিকা একটু অভিমান করবে না ? সেটাই সত্য হবে ? তুমি কেমনতর প্রেমিক গো ?

ভূষণ বলল ঃ "প্রেমিক তো আমি নই, প্রেমিক তিনি। আমি তাঁর প্রেমের কাঙাল মাত্র। আমি যাই।" ভূষণ চলবার জন্য পা বাড়াল।

হঠাৎ বৈষ্ণবী উঠে গিয়ে হাত ধরল তার ঃ ঠাকুর শোন, কোথায যাচ্ছ ? বোস।

—না, যাই।

—এ তবে তুমি কেমন প্রেমের কাঙাল গো, প্রেমের ঠাকুরের গান শুনবে না ?

—তুমি গাও আমি বাইরে থেকে শুনব।

—ঘরে বসে শুনলে ক্ষতিটা কি ?

—না।

ফিস্ ফিস্ করে বৈষ্ণবী বলল ঃ দিব্যানন্দ ঠাকুর ঘুর ঘুর করল কতবার শুধু আমার ঘরে বসে কয়টি গান শোনার জন্য। আর তোমায় আমি শোনাতে চাই...

ভূষণ বলল ঃ আমায় কেন ? তাঁরই জন্য গান, তাঁকে শোনাও।

বৈষ্ণবী ভূষণের কানের কাছে মুখ এনে বলল ঃ না গো না। আমার গান তোমার জন্যে। আমার ভুল ভেঙেছে। তোমাকে দেখে অবধি আমার ভুল ভেঙেছে। তুমি আমা: নাও, তুমি আমার শ্রীকৃষ্ণ।

যেন শিউরে উঠল ভূষণ ঃ একি বলছ তুমি!

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঠিক বলছি।

—না তুমি ভুল করছো। ভুল করছ।

—না, আমি ভুল করিনি। জীবনে প্রেম না হলে কি সেই জীবনের ঊর্ধ্বে প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায়? আমি ভ্রান্ত মোহে ভালবাসিনি কাউকে এতদিন। আজ আমার সে মোহ ভেঙে গেছে। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, মানুষকে ভাল না বাসলে মানুষের দেবতার ভালবাসা পাওয় যায় না। তুমি আমার ভালবাসাকে ফিরিয়ে দিও না।

ভূষণ বলল ঃ তুমি ঠিকই বলেছ বৈষ্ণবী মানুষকে ভাল না বাসলে দেবতাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই মানুষটাকে চিনতে তুমি ভুল করেছ।

বৈষ্ণবী বলল ঃ না গো না, আমি ভুল করিনি, আমি ঠিক মানুষই চিনেছি।

ভূষণ বলল ঃ না, তুমি ঠিক চেননি। সেই মানুষ কোন বিশেষ একটি ব্যক্তি নয়। সে সকল মানুষ। সেই মানুষের প্রতি যে প্রেম, তারই নাম সেবা। সেবাপ্রেমের মধ্য দিয়েই সেই দেবপ্রেমের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি যাই।

হাতাশা ফুটে উঠল বৈষ্ণবীর কণ্ঠে ঃ চলে যাবে! গান শুনবেনা?

ভূষণ বলল ঃ তুমি গান কর, যাঁর জন্য গান তিনি নিশ্চযই শুনবেন।

বৈষ্ণবী বলল ঃ কিন্তু ভক্তের মধ্য দিয়েই যে তিনি শুনবেম।

কথাটা ভূষণের মনে লাগল। তাই সে বলল ঃ তুমি গাও, আমি বাইবে বসে শুনব।

বৈষ্ণবী বলল ঃ বাইরে কেন? নিজেকে যদি সেই পরম পুরুষেব কাছে নাবী বলেই কল্পনা করে থাক, তবে আমাকে ভয় কিসের? নইলে বুঝব তোমার এই ভাব মিথ্যে।

ভূষণ বলল ঃ বেশ, তবে গাও তুমি। শুনছি।

বৈষ্ণবী গান ধরল ঃ

কৃষ্ণ প্রেমের কি বুইঝাছ সার।
ঘরের কাছে কালা বয় আমার॥
প্রেমের সোপান পার হইতে হয়
পাইতে হইলে তারে,
আগে মনের মানুষ যোগাড় কর,
পরে পাইবা তারে,
বঁধুর আঁখির মধ্যে আছে বইস্যা শ্রীকৃষ্ণ আমার॥

গান শুনে ভূষণ উঠে দাঁড়ালো। বলল ঃ ওগো বৈষ্ণবী তোমার মন শুদ্ধ কর। অসীমের ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে সীমার মধ্যে বাঁধা পড়বে? মন শুদ্ধ কর। অমৃত ছেড়ে মৃত্যুর দিকে অসেতে চাইছ কেন গো?"

ভূষণ বেরিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে বৈষ্ণবীর দুয়ারের কাছ থেকে একটি মূর্তি সরে গেল। ভূষণের চোখ পড়ল না, কিন্তু বৈষ্ণবী চিনল,সে দিব্যানন্দ।

গুপ্ত বৃন্দাবনে যখন অসীমের রাজত্বে বন্ধনের জন্য ব্যাকুল কামনা চলছে ঠিক সেই মুহূর্তে গৌড়ে বন্ধনের মধ্যে একটি সদ্যধৃত পাখীর মত আসমানের মনে জাগছিল মুক্তির জন্য আকুল আবেগ।

রিহান কিনে নিয়েছে তার আসর। সে নর্তকীকে চায়। সে তাঁর জন্য উন্মাদ। কিন্তু নর্তকীর প্রাণপাখী তখন অসীম নীলিমার সন্ধান পেয়েছে। সেকি আর ধরা দিতে চায়? বীণার তারে হাত তার এমনিই থাকল, বাদ্যকারেরা বৃথাই অপেক্ষা করল চঞ্চল চাপল্যের। আসমানের কণ্ঠে বেরুল একটি বেদনামধুর সঙ্গীতের ধ্বনি ঃ

"চল মন বৃন্দাবন।
রহুঁ রহুঁ আঁখে ছলকি যমুনা ডাকে
চমকি চমকি উঠ মন॥"

জীবনকে ছাড়িয়ে সে গানের স্পন্দনে যে জীবনাতীতের আহ্বান! সীমিত মানুষের অন্তরে কি তার জন্য ঠাঁই আছে? যে সুর অসীমের জন্য, সীমার মধ্যে তা বেসুরো। একটি রসালো মাংসস্তূপের উপর যার দৃষ্টি, তার কানে এ গান তিক্ত রসের মতন মনে হল। রিহান অনুযোগ করল আসমান একি গান তোমার?

—কেন জনাব?

—আমি তোমার কাছ থেকে জীবনের গান শুনতে চাই।

আসমান বলল ঃ যেখানে জীবনেব উৎস সেখানে জীবনের ঈশ্বর বাস করেন—সেখানে যাবার উদ্দেশ্যে গান করবার চেয়ে বড জীবনের গান কী আছে জনাব?

রিহান বলল ঃ আসমান জীবনকে তুমি ভুল বুঝেছ। নিজেকে চিনতে পারনি তাই অলৌকিক এক জগতের দিকে তাকিয়ে আছ। জগতের মানুষ কে সেই দেশ দেখেছে? কেউ নয়। জীবনপলাতকদের গান এটা। ওমরের মত বড় কবি আর কেউ জন্মায নি, বড় দার্শনিকও নয। সেই ওমর পর্যন্ত বলেছেন, তিনি এই জীবনের বাইরে অন্য কোন জীবনের সন্ধান পাননি। তাই তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ মুর্খ, যে জীবন নেই তার জন্য সময় ক্ষেপন করে এজীবন থেকেও বঞ্চিত হচ্ছ সেখানেও কিছু পাবে না। ঘূর্ণীপাকে তোমাদের একূল ওকূল দুকূলই ডুবল। তাই তিনি বলেছেন, 'উপভোগ কর, জীবনকে উপভোগ কর।' আসমান তুমি সেই জীবনকে উপভোগ কর। সেই উপভোগের গান গাও।

আসমান বলল ঃ সত্যি কথাটা বলতে পারলেন না জনাব। উপভোগ আপনি আরো করেছেন। কিন্তু তৃপ্তি হয়নি। ভোগ্যবস্তু পুরানো হলেই আর আপনার ভাল লাগবে না। শুধুমাত্র নিজেকে জানবার ভুলে এরকম হয়। প্রকৃতপক্ষে যা আপনাদের টানে তা এক লুকানো ইঙ্গিত। নারীদেহের মধ্য দিয়ে, ঐশ্বর্য্যের মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে সর্বত্র সেই ইঙ্গিত বিদ্যমান। যার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতের প্রকাশ ঘটে, আমরা ভাবি তাকে পেলেই চরিতার্থ হব। কিন্তু পাওয়ার পর দেখা যায় তা নেই। আবার অন্যত্র যে ইঙ্গিত ফুটে আছে আমরা সেই দিকে ছুটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবার মধ্যে যে রহস্যময় শক্তি নিজে রযেছেন, বহুর মধ্য দিয়ে যাঁর ইঙ্গিত প্রতিনিয়ত ফুটে উঠছে তিনিই আমাদের উদ্দেশ্য। তিনি অসীম। আমরা ভুল বুঝে সীমার মধ্যে তার সন্ধান করি। সাগর যে নদীকে ডাকে নদী তা জানে না। কি চায, কি যেন চায়। সে তরঙ্গ তুলে, কুলু কুলু শব্দ তুলে কেঁদে শুধু প্রতিনিয়ত কূলে আছড়ে পড়ে। কখনো নিতান্ত বেগে সে যখন চাই-ই বলে কূলকে

আঁকড়ে ধরে, সেই কূল ভেঙে পড়ে যায়। কিছু পাওয়া যায় না। ক্রন্দনের আবেগ শুধুমাত্র চলতেই থাকে। আকাঙ্ক্ষার উদ্বেল ঢেউ তার বুকে উঠতেই থাকে। কিন্তু সমস্ত আবেগ তার শেষ হয়ে যায় যখন সাগরের সন্ধান মেলে। জনাব, সেই সাগরের খোঁজ করুন, জীবনের পরমার্থ সেই সাগর।

রিহান বলল : আসমান এর চেয়ে বড় বঞ্চনা আর কিছু নেই। সাগর যখন দূরে রয়েছে, কবে পাব তার নিশ্চয়তা আছে কি? কূলকে আমি তবে ছেড়ে দেব কেন?

আসমান বলল : কিন্তু পাবেন কি? পাবেন না। নিজেকে শুধু কর্দমাক্ত করবেন। জনাব, এ পথ পরিত্যাগ করুন।

রিহান বলল : না, না আসমান আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

আসমান বলল : কোন্ আমাকে?

—তোমাকে।

—আমার দেহকে?

—দেহ মন সবটাকে।

—কিন্তু আমার দেহটাতো সত্যিকারের আমি নই।

—কে বলল তুমি নও?

—তাহলে এ দেহ চিরকাল টিঁকে থাকে না কেন?

বিহান বলল : আমি অতশত বুঝি না আসমান, আমি তোমাকে চাই। আমি তোমাকে ভালবাসি।

দৃঢ়কণ্ঠে আসমান বলল : না জনাব, ভালবাসেন না!

—বাসি আসমান, বাসি।

আসামান বলল : ভাল যদি বেসেই থাকেন তবেতো আমায় পেয়েই গিয়েছেন।

যেন চিৎকার উঠল বিহান : আসমান, আসমান, পেয়েছি তোমায়? তাহলে তুমি আমার?

—যদি ভালবেসে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার।

রিহান এগিয়ে এসে আসমানের হাত ধরতে চাইল।

আসমান বলল : না জনাব, না, বসুন। সত্যিকারের যে 'আমি' সে তো আপার্থিব। তাকে ধরা যায় না শুধু মনে ছোঁয়া যায়। আপনি যদি শুধু আমাকে মনের মধ্যে স্থান দিয়ে থাকেন, তবে সে আমাকে কেড়ে নেবে কে? মৃত্যুও পারবে না। আর সেখানে কাতর মিনতির তো কিছু নেই। সেখানে তো প্রতিদানেরও কিছু নেই। মনের মধ্যে যে পাওয়া তা আপনিই পূর্ণ। উঠে এসে বাইরের এই হাত ধরবার চেষ্টা করতে হয় না। মনের হাত সেখানে চিরকাল আকাঙ্ক্ষিতকে পেয়ে আসছে। সেখানে আসমানকে উঠতে বললে সে উঠবে, বসতে বলবে সে বসবে।

রিহান আকুল কণ্ঠে বলে উঠল : না আসমান, না, আমায় এমন করে ভুল বোঝাবার চেষ্টা কেরনা!

আসমান বলল : জনাব, তাহলে আমার আর কিছু বলবার নেই! তাহলে সত্য কথাটাই

বলতে হয়। আমি নটী। বহুজনের মনস্তুষ্টি আমার কাজ। আমি কোন একের মধ্যে সীমিত থাকতে পারি না। একজনকে ভালবাসা আমার সম্ভব নয়।

রিহান বলল ঃ আসমান তুমি নিষ্ঠুর, তুমি ভালবাসার মর্যদা দিতে পারলে না।

আসমান বলল ঃ কি করব, আমি যে বহুজনকে না ভালবেসে থাকতে পারি না। বহুজনের সেবা না করতে পারলে আমার তৃপ্তি হবে না। আমার ভালবাসা রয়েছে সেই সেবার মধ্যে।

রিহান দুটি চকচকে চোখে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকল। কর্দমাক্ত নদীর স্রোতের মুখে বাঁধ উঠেছে। নদীর জল ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

সেই মুহূর্তে একজন বাঁদী এল আসরে।

আসমান তার মুখের দিকে তাকাল।

বাঁদী বলল ঃ মালিকান, ইরফান সাহেবের ঘর থেকে সংবাদ এসেছে।

সারেঙিওয়ালা ইরফান চমকে উঠল ঃ কি সংবাদ?

—আপনার বেগম অসুস্থ।

চমকে উঠল ইরফান। তাদের এলাকাতে সেই ব্যাখ্যাতীত এই রোগ প্রবেশ করেছে। গোটা কয়েক লোকেব একদিনেই মৃত্যু হয়েছে। ছিটকে উঠে দাঁড়ালো ইরফান। তারপর "মালিকান যাই" বলেই সে ছুটে বেরিযে গেল।

অবাক হয়ে আসমান তাকাল বাঁদীর দিকে ঃ কি ব্যাপার?

বাঁদী বলল ঃ ইবফান সাহেবের বেগম আর দুনিয়াতে নেই মালিকান।

"সে কি! সে কি!" উঠে দাঁড়াল আসমান।

রিহান ডাকল ঃ আসমান শোন।

কিন্তু সে ডাক আসমানের কানে গিয়ে পৌঁছুল না। আসমান বরাবর তাব নিজের কক্ষে ফিরে এসে খাসনবিসকে তলব করল। খাসনবিস এলে বলল ঃ আমার জন্য গাডীর ব্যবস্থা করুন। আমি যাব।

—কোথায়?

—ইরফানের ওখানে।

—কিন্তু যাওয়া হবে না মালিকান।

—কেন?

—সুলতানের ফৌজ ও এলাকা বন্ধ করে দিয়েছে।

—কারণ?

এক ভয়ানক রোগ দেখা দিয়েছে গৌড়ে। হেকিম, বৈদ্য কেউ ধরতে পারছেন না। যার হচ্ছে সেই মরছে। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে রোগ। এই রোগ যাতে লোক মারফৎ ছড়াতে না পারে, সেইজন্য সুলতান যে এলাকাতে রোগ হচ্ছে সেই এলাকা ফৌজ দিয়ে ঘিরে রাখছেন। হতাশ হয়ে আসমান বসে পড়ল! মনে মনে বলল ঃ প্রভু, আমাকে সেবার অধিকার থেকেও তুমি বঞ্চিত করবে? এইতো সময়, যদি রোগক্লিষ্ট মানুষকে সেবা না করতে পারি, সান্ত্বনা না দিতে পারি, অপরের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলতে না পারি তবে প্রেমের পরশ পাব কি করে?

চব্বিশ

"ওগো শ্যাম তুমি গোকুল ছাইড়্যা যাইওনা
রাধারে কাঁদাইও না।"

সকালবেলা আবার গুপ্ত বৃন্দাবনে দিনের আলো ফুটল। সর্বাগ্রে উঠল ভূষণ। সে মন্দিরের বারান্দাতে কখন নিজেরই অজ্ঞাতসারে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাখীর ডাকে জাগল। বৈষ্ণবীর ঘর থেকে সকালবেলা যে গানের সুর ওঠা উচিত তা উঠল না। কিন্তু সেদিকে কিছু খেয়াল করতে পারল না ভূষণ। তার চোখের মধ্যে এক নিবিড় স্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে তখনো। সে স্বপ্ন ধর্মশালার। উঠেই সে প্রথমে গেল সেইদিকে। বেছে বেছে ইটগুলো এনে সাজিয়ে রাখতে লাগল মিস্ত্রী যেখানে বসবে সেইখানে। যতটা সম্ভব শ্রম লাঘব করে দিতে হবে। আহা বেচারীরা! তাদের যে বড় কষ্ট, সে কষ্টের লাঘব করতে হবে। ভূষণ তাই কাজ করে। যতটা সম্ভব এগিয়ে দেওয়া যাক। ওদের শ্রম কমুক।

বৈষ্ণবী ভূষণের অলক্ষ্যে কুটীর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভূষণকে দেখছিল। আহা অপূর্ব মুখচ্ছবি, অপূর্ব কান্তি! তার বুকের মধ্যে আবার দোল্ খেয়ে উঠল। হঠাৎ সে গান গেয়ে উঠল ঃ

"রাধা কান্দে বুইঝলা না কি শ্যাম।
যদি ধরা না দিবা তবে দেখা দিলা ক্যান।।
আমি যাইবো শ্যাম দেশ দেশান্তরে
কইব গিয়া ঘরে ঘরে
শ্যাম নাগরের অন্তরে প্রেম না পাইলাম।।"

গান কানে গেল ভূষণের। বুঝতে পারল সে যে, এ গান স্থূল প্রেমের পরশ বঞ্চিত কামনার দংশনের বিলাপোক্তি মাত্র। প্রকৃত ভালবাসার সন্ধান পায়নি বৈষ্ণবী। প্রকৃত ভালবাসা মানুষকে এক অলৌকিক প্রেভানুভূতিতে নিয়ে যায়। মানুষের প্রতি যার প্রেম আছে, কৃষ্ণকে পাওয়া তার পক্ষে কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু সেই প্রেমকে কামের খাদ থেকে বের করে আনতে হবে। বৈষ্ণবীর সেই খাদ রয়েছে। বেদনার মধ্য দিয়ে না গেলে, অশ্রুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হলে সেই খাদ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। বৈষ্ণবী যদি কাঁদতে পারে আসমানের মত, তবে মুক্তির সন্ধান পাবে। কিন্তু হঠাৎ কখনো সেই স্বর্গীয় মুহূর্ত না এলে চোখে যে তেমন অশ্রু ঝরে না। কোনদিন কোন অবসরে, সেই স্বর্গীয় মুহূর্ত বৈষ্ণবীকেও মহাভাবে উদ্বেলিত করে তুলুক। মুক্তি আসুক অশ্রুবন্যার মধ্য দিয়ে।

বৈষ্ণবীর গানের শব্দ শুনতেই দিব্যানন্দ বেরিয়ে এলেন নিজের ঘর থেকে। বৈষ্ণবীর কুটীরের দিকে তাকালেন তিনি। দেখলেন ছোট্ট জানালার ফাঁক দিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে বৈষ্ণবী তাকিয়ে আছে। কোথায়, কি খুঁজছে সে? দিব্যানন্দ সেই দৃষ্টি লক্ষ্য করে বাইরে তাকালেন।

দেকলেন লক্ষ্যবস্তু ভূষণ। বুকটার মধ্যে তার একটু মোচড় খেল। তিনি এগিয়ে গেলেন বৈষ্ণবীর ঘরের দিকে ঃ কি গো বৈষ্ণবী, প্রাতঃকালেই এত কান্নার আবেগ কেন গো? কাল থেকেই লক্ষ্য করছি বড় কান্নার মন হয়েছে তোমার।

একটুখানি দিব্যানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল বৈষ্ণবী। কি যেন ভাবল, তারপর হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, যেন সখা তিনি। জোরে জোরে বলতে লাগল ঃ এই যে নাগর ঘুম ভাঙল! এস। তোমার জন্যই যে কাঁদছিলুম গো রসের নাগরটি আমার। পীরিতের কালাচাঁদ এস গো।

দিব্যানন্দ কামনার পার্থিব একটা দৃষ্টি বৈষ্ণবীর চোখের উপর ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। বড ঢল ঢল দেহটি। যেন ডাঁশা পেয়ারা।

বৈষ্ণবী বলল, বেশ একটু জোরেই বলল ঃ কই গো ঠাকুর্ বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, এস। বিরহে মরছি, গান গাই শোন।

এত জোরে বলবার কি প্রয়োজন আছে দিব্যানন্দ বুঝতে পারলেন না। একবার একটু সন্দেহে বাইরে ভূষণের দিকে তাকালেন। কিন্তু লোকটি আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে, কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বৈষ্ণবীর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কিন্তু দিব্যানন্দ বৈষ্ণবীর কাছ থেকে হঠাৎ এতটা বেশী আশা করতে পারেননি। বৈষ্ণবী তার দুটি রসালো বাহু দিব্যানন্দের কণ্ঠে জড়িয়ে দিল। তারপর ঠিক সেই জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে যাতে বাইরে থেকে দেখা যায় এমন ভাবে গান ধরল ঃ

"কি মনমোহন রূপ শ্যাম।
মুই নয়নে দেখিযা বঁধু মরমে মরল্যাম॥
বুকের মধ্যে ধইর‍্যা রাখলাম গো।
মনের মধ্যে ছবি আঁকলাম গো।
নিঃশ্বাসে জীবন করল্যাম গো, প্রাণেতে ধরলাম॥

দিব্যানন্দ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। চোখের গভীরে তাকাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে চোখে কোন প্রতিফলন নজরে পড়ল না। দিব্যানন্দ বুঝলেন বৈষ্ণবীর দৃষ্টি তাকে ছাড়িয়ে অন্য কোথাও যেন চলে গেছে।

হঠাৎ বৈষ্ণবী ঝাঁঝিয়ে উঠল। দুই হাতে দিব্যানন্দকে ঠেকে ফেলে দিল ঃ 'যাও, যাও, তোমাকে চাই না. যাও, যাও।' সে করতলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

সূর্য্য উঠল, আলো ফুটল। মজুরেরা আবার কাজে এল। ধর্মশালা তৈরী হচ্ছে। সেই কাজের মধ্যে নিজের সমস্ত চেতনাকে সমর্পণ করে দিল ভূষণ। কী আনন্দ! কী আনন্দ! সে শুনতে পাচ্ছে অসংখ্য পথিকের পদধ্বনি। তারা আসছে। তারা বড় শ্রান্ত। তাদের গায়ে ছায়া গড়ে উঠছে। ভূষণের ঘর্ম ঝরছে। ভূষণেব পৃষ্ঠে উন্মুক্ত সূর্য্যের কিরণ। ঘর্ম ঝরুক, পৃষ্ঠে যন্ত্রণা হোক্, সেই যন্ত্রণা দিয়ে তাদের জন্য শান্তির নীড় রচনা করবে ভূষণ। আঃ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!

ভূষণকে এমনভাবে পরিশ্রম করতে দেখে জয়নাল মিস্ত্রী বলল ঃ একি জনাব! আপনি কেন? রাখুন, রাখুন।

ভূষণ বলল ঃ না, না মিস্ত্রী, না বোল না, না বোল না। আমার ঘাম না ঝরলে ও পথ স্নিগ্ধ হবে কি ? আমি যদি নিজের পৃষ্ঠে যন্ত্রণা না ধরি, ওরা ছায়া পাবে কোত্থেকে ? আহাঃ ! ক্লান্ত লক্ষ লক্ষ বেচারী, আমাকে কাজ করতে দাও, কাজ করতে দাও।' ভূষণ কাজ করতে লাগল।

সারাটা দুপুর সে অক্লান্ত কাজ করল। এতটুকু বিশ্রাম নিল না। বৈষ্ণবী তাকিয়ে দেখল। ভোগের প্রসাদ পেল বৈষ্ণবী কিন্তু কিছুতেই যেন গ্রহণ করতে পারল না। এক সময় ভূষণ গিয়ে লতাকুঞ্জের ছায়াতে বসলে সে সেই ভোগের প্রসাদ হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। গিয়ে দাঁড়ালো ভূষণের সামনে।

ভূষণ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু ঘৃণা বা ক্রোধের কোন রকম লক্ষণ ফুটে উঠল না তার মুখে। পরম দীন এক প্রেমময় ভাব তার চোখের মধ্যে।

বৈষ্ণবী বলল ঃ ঠাকুর এই নাও, নাও। তুমি কি ক্ষুধা তৃষ্ণাও ভুলে গেলে ?

ভূষণ বৈষ্ণবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

বৈষ্ণবী বলল ঃ নাও ঠাকুর। এ আমার নয়। গোপীবল্লভের প্রসাদ। ঘৃণার কিছু নেই ঠাকুর।

ঘৃণা ! কাকে ঘৃণা ! দীন হতে যে দীন তার আবার ঘৃণা কি ?

ভূষণ হাত বাড়িয়ে দিল ঃ দাও, দাও।

বৈষ্ণবী বসল ভূষণের পাশে। ক্ষুধার্ত ভূষণ পরম তৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ খেতে লাগল। আকুল দৃষ্টিতে তার সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বৈষ্ণবী।

ভূষণের খাওয়া শেষ হল।

বৈষ্ণবী বলল ঃ ওগো ঠাকুর এমনি করে যে দেহ চলবে না! সেবা নাও, সেবা নাও। সেবা না পেলে নিজেকে চিনবে কি করে ?

ভূষণ বলল ঃ সেবা ! কার সেবা ? আমি যে দীন হতে দীন। সেবা করবার জন্যই যে আমার জন্ম।

বৈষ্ণবী বলল ঃ না ঠাকুর, সেবা করবার জন্য জন্ম যে গোপিনীর। সেবার জন্য যে জন্ম শ্রীরাধিকার। তুমি সেই সেবা নাও। নইলে তোমার প্রেম সার্থক হবে কি করে গো ?

ভূষণ বৈষ্ণবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কাতর নয়নে বৈষ্ণবী তাকাল ভূষণের দিকে ঃ ঠাকুর আমায় নাও, আমায় তোমার দাসী কর। আমায় নিয়ে তুমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াও। আমি তোমার পথের ক্লান্তি দূর করব।

ভূষণ একটু হাসল। বলল ঃ বৈষ্ণবী ভুল কোরো না। কৃষ্ণ তোমার লক্ষ্য। কৃষ্ণের দিকে তাকাও ! কাঁদ।

—আমি যে কাঁদছি গো। কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছি।

ভূষণ বলল ঃ কাঁদ, কাঁদ, কৃষ্ণের জন্য কাঁদ, সব পাবে।

—তুমিই আমার কৃষ্ণ।

—না, আমি কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণ এই বিশ্বের সর্বত্র। এই তরু, এই তৃণ, এই গুল্ম, সর্বত্র। কাঁদ, কেঁদে কেঁদে তাকাও। অশ্রুর সিক্ততার মধ্যে সেই পরম লাবণ্যময় অনন্ত সত্তার সাক্ষাৎ পাবে।

ভূষণ উঠে দাঁড়ালো। আবার কাজে যোগ দিল। কাজ নয় সেবা, সেবা, আঃ কী আনন্দ!

বৈষ্ণবী হতাশ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আবার নিজের কুটীরে ফিরে গেল।

কুটীরে ফিরে দেখল দিব্যানন্দ বসে আছেন।

বৈষ্ণবী তাকাল তাঁর দিকে। বুঝল, কিসের আকষণ তাঁর মধ্যে। হায় এ আকর্ষণে যে সে-ই ক্ষত বিক্ষত। ডুবে যাচ্ছে বৈষ্ণবী নিজেই, অথচ সেই ডুবন্ত দেহের অসহায় মূর্তির দিকে না তাকিয়ে তার বাইরের দেহটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। যেন একটা নেকড়ে, মৃত্যুপথযাত্রী জন্তুর মাংসস্তূপের প্রতি লোভ। মৃত্যুর বীভৎস যন্ত্রণা তাঁর চোখে পড়ছে না। এত বেদনার মধ্যেও হাসি পেল বৈষ্ণবীর। সে তাকালো দিব্যানন্দের দিকে ঃ কি গো কালাচাঁদ, অসময়ে?

দিব্যানন্দ বললেন ঃ বাঁশী বাজিয়েছ তুমি, সময়জ্ঞান আমার আর কি করে থাকে বল?

বৈষ্ণবী বুঝল সকাল বেলা তার কমনীয় হাতের জীবন্ত স্পর্শ পেয়ে দিব্যানন্দ নিজের পথকে ভুলেছেন। বলল ঃ কিন্তু জান তো, বাঁশীর ডাকে যখন তখন ঘর ছাড়লে সমাজে নিন্দে রটবে? জটিলা কুটীলা ননদিনী ছেড়ে দেবে কি?

দিব্যানন্দ বললেন ঃ পালিয়ে যাব, চল পালিয়ে যাব।

—কোথায় পালাবে?

—তীর্থে তীর্থে পালিয়ে বেড়াবো। বৈষ্ণবী তুমি হবে আমার হ্লাদিনী শক্তি, আমি তোমাব—

বৈষ্ণবী বলল ঃ বুঝেছি গো প্রেমেব নাগর, বুঝেছি। তিলক ফোঁটা উড়ে গেল। কিন্তু হ্লাদিনী শক্তি যে তুমি, আমি, সবাই। একমাত্র পরমপুরুষ আমাদের মত প্রকৃতিকে নিয়ে লীলা করছেন। তোমার আবার এই প্রবৃত্তি কেন গো তবে?

দিব্যানন্দ বললেন ঃ জীবনে প্রেম না হ'লে যে প্রেমময়ের সন্ধান মেলে না। তুমি আমায় সেই প্রেম দাও। তুমি আমাকে আকুল ব্যাকুল করেছ, বন্যায় ভাসিয়েছ। তুমি আমার নদী। ভাসিয়েছ যদি বুকে করে রাখ বৈষ্ণবী।

বৈষ্ণবী বলল ঃ হাল্কা হ'লে ভাসানো যায়, ভারি হ'লে ডুবে। ডুবে যাবেনা তো বোষ্টম?

দিব্যানন্দ বললেন ঃ যদি ডুবি, বুঝব যমুনার জলে ডুবেছি। সেখানে মরণও ভাল।

বৈষ্ণবী বলল ঃ তবে বোষ্টম এক কাজ কর, কাঠের মালা গলায় না বেঁধে শিলা বেঁধে ডুব দাও। তাড়াতাড়ি ডুববে। আকাশের নীচে বাস করে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি, তুমি বোষ্টম হলে কেন গো?

দিব্যানন্দ বললেন ঃ আমি বোষ্টমও নই গো, আমি অবোষ্টমও নই। আমি শুধু প্রেমকাতর, আমায় তুমি প্রেম দাও।

বৈষ্ণবীবলল ঃ প্রেমকাতর না মদনকাতর? দেহ কাঁপছে যে বড় বোষ্টমেব?

দিব্যানন্দ দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন বৈষ্ণবীকে ঃ করুণা কর।

বৈষ্ণবী বলল ঃ 'ঘরের বাইরে বোস তবে, নেক্ড়ের মত বসে থাক। দেহটার দিকে লোভ তো? মরলে পরে দেহটা নিও। যাও যাও এখন ওঠ দেখি।' বৈষ্ণবীর মুখে চোখে এমন একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল যে, দিব্যানন্দ পর্য্যন্ত আর বসে থাকতে সাহস করলেন না। তিনি বেরিয়ে গেলেন। বৈষ্ণবী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠল।

সন্ধ্যাবেলায় কাজ শেষ হল। ভূষণ চলল গৌড়ে ফিরে। মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ নিয়ে, কোন ভয় নিয়ে, কোন ঘৃণা নিয়ে সে ফিরল তা নয়। বৈষ্ণবীর ব্যবহার যে তাকে গুপ্ত বৃন্দাবন থেকে সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়ে দিচ্ছে তা নয়। রাগ নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই আর ভূষণের। মন বলল তাই সে ফিরে চলল। ফিরে চলল বললে ভুল হবে। তার শুধু চলা। পথে নেমে পড়ল সে। বৈষ্ণবী তাকে লক্ষ্য রাখছিল। সে ভাবল, তাহলে গত সন্ধ্যায় তার ব্যবহার, আজকে তার ব্যবহার আঘাত দিয়ে ভূষণকে কি গৌড়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে? তার দৃষ্টির আড়ালে সে গিয়ে ভূষণের সামনে দাঁড়ালো।

—ওগো ঠাকুর কোথায় চললে?

—পথ যেখানে নিয়ে যায়।

—আমার ভুলে কি তুমি গুপ্ত বৃন্দাবন ছেড়ে চললে?

—না গো, ভুল কারো নয়।

বৈষ্ণবী ভূষণের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমাকে আর কখনো বিব্রত করব না ঠাকুর।

ভূষণ বলল ঃ ওঠ বৈষ্ণবী। তুমি তো কোন অন্যায় করনি। তুমি আমি কে, সবাই তিনি। তিনিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই যাচ্ছি।

আবার এগুতে লাগল ভূষণ।

বৈষ্ণবী ঠায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখল। তারপর নিজের মনের আবেগেই গেয়ে উঠল ঃ

"ওগো শ্যাম তুমি গোকুল ছাইড়্যা যাইও না।
রাধারে কাঁদাইও না॥
ফেইল্যা তোমার বিনোদিনী রাই—
যাইবা বঁধু প্রাণে বাঝবে নাই?
চরণ ধরি শ্যাম বঁধুরে—মথুরার দিকে চাইও না॥"

সেই সুর ভেসে এল ভূষণের কানে। দুঃখ লাগল। ওগো প্রেমময় তুমি মানুষকে এত কাঁদাও কেন? আমি দীন হ'তে দীন, আমাকে কাঁদাও, আমাকে কাঁদাও। বৈষ্ণবীর বুকের যন্ত্রণা আমাকে দাও প্রভু! ওর শান্তি হোক্, শান্তি হোক্।

দুই চোখে দরবিগলিত ধারা নামল ভূষণের। সে চলতে লাগল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা নেমেছে। এই সন্ধ্যার মত প্রভুর করুণা সমস্ত বিশ্বচরাচরের উপর নেমে আসুক। শান্তি হোক্, শান্তি হোক্।

ভূষণ এসে দক্ষল দরওয়াজার কাছে উপস্থিত হ'ল। তেমনি গৌড়ের মানুষেরা বাইরে এসেছে আজো সেখানে একটু মুক্ত আকাশের আস্বাদ গ্রহণ করতে, একটু নির্মল বায়ুর স্পর্শলাভ করতে। মানুষ, মানুষের স্বার্থ, বাসনা, কামনা গৌড়ের বাতাসকে দূষিত করেছে। শুধুই সেখানে থাকা যায় না। মাঝে মাঝে মুক্তির জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দূরের মুক্তি সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না। কিন্তু কাছের মুক্তি তাদের টানে। তাই তারা গৌড়ের দরওয়াজাতে ভীড় করে। কিন্তু আজকের এই মুক্তির মধ্যে যেন সেই অসীমের একটু—খানি স্পর্শেরও অভাব। আকাশের নীচে দাঁড়িয়েও সবাই যেন চাপা ভয়ে নিস্তব্ধ। আকাশের বুকে ভাসবার সুযোগ পেয়েও কত গুলো মেঘ যেমন স্থির হয়েই থাকে, চলতে পারেনা, তেমনি স্থির আজকের মানুষেরা। কেন! কি হল! ভূষণ যেন একটু নিজেই আশ্চর্য্য হ'ল। কতকগুলো আধো আধো আলোচনাও যেন তার কানে এল।

—তবে তো ভয়ের কথা ?

—খান সাহেব রিসালাৎউদ্দিন শুনেছি সরে পড়েছেন।

—এ্যাঁ! ফৈজী বিবি নেই—!

—নহবৎ খানার বাজনা পর্য্যন্ত থেমে গেছে।

একটি উত্তেজিত কণ্ঠস্বরও তার কানে ভেসে এল ঃ এ অন্যায়। ওরা না পারেন, না পারবেন। অন্য মানুষকে চেষ্টা করতে দেবেন তো ? বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। ফৌজরা পাহারা দিচ্ছে। আজকে যে সেবার প্রয়োজন, শুশ্রূষার প্রয়োজন। সুলতান এটা বুঝতে পারছেন না ?

আর একজন বলল ঃ বোধহয় সুলতান ইচ্ছে করেই এমন করছেন। গৌড় থেকে লোক কমাতে চান। টাকার লোভ দেখিয়ে সরাতে চেয়েছিলেন, এখন সুযোগ পেয়েছেন এইভাবে একেবারে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চান।

এই কণ্ঠস্বরের প্রথমটিকে ভূষণ চেনে—বুরহানের। কি হ'ল! তাহলে কি রোগটা সংক্রামক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে? মানুষ কি তাহলে বিপন্ন ? ভূষণের বুকের মাঝখানটায় দোল্ খেয়ে উঠল। প্রভু আমি দীন হতে দীন! এই বিপন্ন মানুষকে যেন আমি সেবা করতে পারি, তাদের যন্ত্রণা আমার উপর আসুক! ওরা শান্তি পাক।

ভূষণ দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

তখন বুরহান কথা বলছিল ঃ আচ্ছা মৌলভি সাহেব, আপনার কি মত ? এমন করে ফৌজ দিয়ে ঘেরাও করে রাখা উচিত ?

মৌলভি সাহেব বললেন ঃ ঘেরাও করে রাখুন ক্ষতি নেই। কিন্তু শুশ্রূষা করবার অধিকার কেন দেবন না তিনি ? রোগে চিকিৎসার চেয়ে শুশ্রূষার প্রয়োজন বেশী। বিশেষত যে এলাকাতেই এ রোগ হাত বাড়িয়েছে মানুষ ভয়ে অবশ হয়ে পড়ছে। কেউ কাউকে সাহায্য পর্য্যন্ত করতে পারছে না। রুগীকে সাহস না দিতে পারলে হয় ? দাওয়াই যতটা কাজ করবে ততটাই করবে শুশ্রূষা। দাইয়ের হাত, দাইয়ের অভয় হাসি, অনেকটাই যে মনের সাহস আনে। আমার মনে হয় সুলতানের এই সময় নিজেরই একটি সেবাদল গঠন করা উচিত।

আলাউদ্দিন বলল ঃ সুলতান কি করবেন সুলতানই জানেন। তার জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না। মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে।

—তোমার মতে কি করা যেতে পারে?

আলাউদ্দিন বলল ঃ হেকিম নিয়ে, বৈদ্যকে নিযে, মৌলভি সাহেবকে নিযে, জনাব বুরহানুদ্দিন, রিহানুদ্দিনের মত লোককে নিয়ে দল গঠন করা উচিত।

বুরহান বলল ঃ রিহান আসবে না। সে না থাক্ আমি আছি।

ঠিক সেই সময ভূষণের দিকে তার নজর গেল। সে প্রায লাফিযে উঠল ঃ আরো আছে, ভূষণ। এইযে সে এসে গেছে।

সে ছুটে গিয়ে ভূষণকে জড়িযে ধরল। টানতে টানতে নিযে এল। বলল ঃ ভূষণ, ভাল সময় এসেছ। আমি জানতুম, তুমি আসবেই, তুমি থাকবেই। জান তো গৌড়ে সেই ব্যাধিটা মহামারী রূপে দেখা দিযেছে? দশ দিনের মধ্যে পাঁচশো লোকের মৃত্যু হয়েছে।

—পাঁচশো!

—হ্যাঁ।

ভূষণেব চোখ দিযে জল গডিযে পডল। বলল ঃ ওগো প্রভু মৃত্যু আমাকে দাও, যন্ত্রণা আমাকে দাও। মানুষকে তুমি শান্তি দাও।

মৌলভি নাসিরুদ্দিন এক অপার্থিব মুখের অলৌকিক দীপ্তির দিকে তাকিযে থাকলেন। বললেন ঃ বাচ্চা তুই পাববি।

ভূষণ বলল ঃ মৌলভিসাহেব আমায় বলুন কি কবতে হবে। সকল যন্ত্রণা শুধু আমার উপর আসুক, আমি যে বড আনন্দ পাব। মানুষেব চোখেব জল শুধু আমাব চোখেই থাকুক। সুখী হোক্, সুখী হোক্, মানুষ শুধু সুখী হোক্।

সেই আনন্দের আবেগ দেখে মৌলভি নাসিরুদ্দিনের চোখেও জল এল। তিনি বললেন ঃ বেটা, কিছু করতে হবে। কিন্তু করবার মালিক খুদা। আমরা তো যন্ত্র মাত্র। সেই আল্লাহ্‌তালার উপর বিশ্বাস রেখে আমাদের শুধু এগিযে যেতে হবে।

বুরহান বলল ঃ মৌলভিসাহেব, আমাব মনে হয় এই মুহূর্তে আমাদের হেকিম নিজামুদ্দিন সাহেব আর কবিরাজ অনন্ত ন্যায়তীর্থের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকাব।

মৌলভিসাহেব বললেন ঃ চল্ বেটা চল্।

ওরা সবাই দক্ষিণ দরওযাজা ছেড়ে নগরীর মধ্যে ঢুকল।

পঁচিশ

"তঙ্গ দস্তিমে কৌন্ কিস্‌কা সাথ দেতা হৈ?
কি তারিকী মে সায়াভী জুদা হোতা হৈ ইন্‌সাঁসে।"

কাল সারারাত ভাল ঘুম হয়নি ভূষণের। মানুষ যে বিপন্ন, মানুষ যে বেদনার্ত, তার কি কিছু করবার নেই? সে যে দীন হতে চায়, মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা বুকে গ্রহণ করতে চায়। প্রভু কি তাকে সেই বেদনার পরিবেশের মধ্যে শুধুমাত্র একটি নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে রেখে দেবেন? সেই প্রভুর লীলা কে জানে! যদি তাই হয়, তাই হবে। সেই অসীম বেদনার মধ্যে মানুষের বেদনার্ত মুখখানি কল্পনা কেরা সে শুধু কাঁদবে। সেই কান্নার ঢেউ কি যত দূরেই থাকনা কেন সাগরের জলে শিহরণ তুলবে না? যদি তোলে, সাগর কি সেই বেদনার অনুভূতিতে বাষ্পের সমবেদনা তুলবে না? সেই বাষ্প কি আকাশে মেঘের সঞ্চার করে বৃষ্টি নামাবে না? শ্রাবণের বাদলের মত বৃষ্টি নামবে না? সিক্ত হবে না পৃথিবী? শ্যামস্নিগ্ধতা দেখা দেবে না তরুতে, লতায়? দিক্, না দিক্, সে কাঁদবে।

সারারাত ভূষণ শুধু সেই অসহায় মানুষের রূপ কল্পনা করেছে। এ মৃত্যু কেন, কেমন করে নামল? পরম প্রেমময় ভগবান কি সন্তানকে দুঃখ দেবেন? না, না, না, সেকি কথা! সেকি কথা! এ কখনো হতে পারে? এই চলাফেরাটাই কি জীবন? যা চোখে দেখতে পাই তাই কি জীবন? চোখের দেখার বাইরে কি আর জীবন নেই? মৃত্যু যে জীবনের অন্যক্ষেত্র নয়, তাই বা কে জানে? হয়তো আমরা ভুল বুঝি। অমরা জানিনা বলে ভয় পাই। হয়তো সে মায়ের অন্য স্তনের মত। অবুঝ শিশুকে এক স্তন থেকে আর এক স্তন দেবার সময় যেমন সে চিৎকার করে ওঠে, তেমনি চিৎকার করে উঠি আমরা। এই প্রথাটা তার সোহাগ। সোহাগের আবেগে কি চোখে জল আসে না? আসে। ভগবানকে যে চোখের জলের বাইরে কিছুতেই বুঝবার উপায় নেই। তক্ষুণি মনে হল, মানুষের যন্ত্রণাটা নিজের উপারে আসুক একথা বলে হয়তো ভূষণ স্বার্থপরের মতই প্রার্থনা করছে। শুধুমাত্র নিজে চাইবে সেই সোহাগের ভাগ? শুধু যন্ত্রণাকে না বোঝার ভ্রান্তিতে যে দুঃখ ভূষণের উপর তাই নেমে আসুক।

সেই দুঃখের কল্পনাতেই এক সময় কখন শয্যা ত্যাগ করে সে বেরিয়ে পড়ে।

তখন রাত্রি শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু আলো ফুটে ওঠেনি। পাতলা অন্ধকারের আবরণ পৃথিবীর উপর দিয়ে। ভূষণ সেই শীর্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল। তখনো সব নীরব। মানুষ বের হয়নি পথে। নিশ্চুপ গৃহশীর্ষগুলি দাঁড়িয়ে আছে। ধ্যানমৌন ভাব। সেই গৃহগুলির দিকে তাকিয়ে ভূষণের মনে হল, রাত্রি যেন বিরাট এক স্নিগ্ধ অবসর। সেই অবসরে উর্ধ্বলোকে কোন পরম প্রাপ্তির অপেক্ষায় ধ্যান করতে থাকে ওরা সব। গত সন্ধ্যাতেই দক্কল দরওয়াজার সিঁড়িতে যে ভীতি সে লক্ষ্য করেছিল—সেই ভীতি এই নগরীর মধ্যে নেই। প্রকৃতি বোধহয় কোন কিছুরই মধ্যে ভয়ের কিছু দেখতে পায়

না। এমন কি ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে উল্লসিত বৃক্ষগুলি বাহু আন্দোলিত করে নৃত্য করতে থাকে। দুঃখ যে সেই পরম স্নেহময়েরই স্নেহের আর এক রূপ, শুধু প্রকৃতিই বুঝি তা বুঝতে পেরেছে। ভূষণ মনে মনে বলল : হে প্রকৃতি, তোমার সুখানুভূতি তুমি মানুষকে দাও, দাও!

এগুতে লাগল ভূষণ। কিন্তু কিছুদূর এগুবার পর হঠাৎ তার সেই আনন্দানুভূতিতে ছেদ পড়ল। নগরীর কোন্ প্রান্ত থেকে যেন করুণ ক্রন্দন ভেসে আসছে। বেদনার মধ্য দিয়ে ভগবানের স্নেহ, কিন্তু ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে মানুষের যন্ত্রণাবোধ। ভূষণ মনে মনে বলল : ঐ ভ্রান্তির বেদনা আমার হোক্। তার চোখে জল এল।

সে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এসে পশ্চিম গড়ে পৌঁছুল। আসমানের ঘর তখনো ঘুমিয়ে আছে কি? নীরব। আসমান বুঝি এতক্ষণ ঘুমাচ্ছে। আহা, ঘুমাক ঘুমাক। আসমান সেই অনন্তের স্বাদ পেয়েছে। আসমানের চোখের জলের মধ্যে শান্তি, আসমানের বেদনার মধ্যে সেই অনন্ত পুরুষের স্নেহের পরশ। ভূষণের কি মনে হল, আসমানের সেই ঘরের বারান্দাটায় লুটিয়ে প্রণাম করল। আসমানের কাছে আজ এসেছে সেবার অনন্ত অবসর। নিজেকে বিলিয়ে দেবার অবসর।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ভগবান ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাধক যে সে সেই চরণের শব্দ শুনতে পায়! প্রেমিক সাধক সে, শুনতে পাবে না সেই পরম করুণাময় পুরুষের পদপ্রান্ত থেকে কখন এক বিন্দু জল ঝরে পড়ল? আসমান কানে শুনল কিনা কে জানে, কিন্তু হৃদয়ে শুনল। সে উঠল। দরওয়াজা খুলল। দেখল ভূষণ বসে।

—একি! তুমি? আমায় ডাকলে না?

ভূষণ বলল : না ডাকতে যাকে পাওয়া যায় তাকে ডাকবো কখন? তাকে ডাকতে নেই, তাকে শুধু বুঝতে হয়। আমি তোমাকে বুঝছিলুম। আমি যে পথে চলতে চলতে তোমাকেই দেখছিলুম আসমান। এখানে বসেও তোমাকেই দেখছিলুম।

আসমান বলল : আমিও যে তোমার কথাই ভাবছিলুম ভূষণ। তুমি আমার দূরবীন। তোমার মধ্য দিয়ে দূর্ দূর্ নক্ষত্রলোক দেখছিলুম। মনে হচ্ছিল সেই নক্ষত্রলোকের অঙ্গে অঙ্গে তোমার অশ্রু লেগে রয়েছে। সেই অশ্রু স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তার মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে এক বিরাট প্রেমময়ের। তাকে দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলুম। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল একবিন্দু নক্ষত্রের জল খসে পড়ল। আমি বাইরে এলুম দেখতে।

ভূষণ বলল : আসমান পৃথিবীকে দেখছ?

—দেখছি প্রিয়তম।

—যন্ত্রণা ফুটে রয়েছে কি পৃথিবীর অঙ্গে?

—না তো

—কি দেখছ?

—স্নিগ্ধ অশ্রুর প্রলেপ।

—প্রকৃতিকে তাকিয়ে দেখছ?

—দেখছি।

—মনে হয় না বিশ্বরহস্যের মূলকে ওরা ধরে ফেলেছে? দুঃখ যে তার স্নেহ ব্যতীত আর কিছুই নয় এটা ওরা বুঝতে পেরেছে? এতদিন দীনভাবে কেঁদে বলেছি—হে ভগবান, বিশ্বের সমস্ত যন্ত্রণা আমাকে দাও! হঠাৎ আজ আমার তাই মনে হল, যন্ত্রণা যে স্নেহ; স্বার্থপরের মত তাঁর সমস্ত স্নেহটুকুকেই আমি চাইছি। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম—না, না, যে ভ্রান্তি মানুষকে যন্ত্রণার মধ্যে এই স্নেহের রসটুকু বুঝতে দেয় না, আমাকে সেই ভ্রান্তিটুকু দাও প্রভু। মুক্তি পাক্, সমস্ত মানুষ মুক্তি পাক্। সেই ভ্রান্তি আমাকে অজ্ঞনতার অন্ধকারে চিরকাল আড়াল করে রাখুক।

আসমান বলল ঃ ভূষণ তুমি কে? কোন্ প্রেমময়ের হৃদপিণ্ডের সমস্ত প্রেমরস নিংড়ে তুমি তাঁকে বঞ্চনা করে এখানে নেমে এসেছ? এমন করে তুমি আমায় কেন উদ্বেলিত করলে? আমার সীমাকে হারিয়ে দিলে? আমাকে অধীর করলে নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য। যদি আমার মধ্যে অশ্রু আনলে, তবে সেই অশ্রু পথিকের পথের উপর পড়ে পথকে স্নিগ্ধ করতে পারছে না কেন?

ভূষণ বলল ঃ কেন, ঐ যে তোমার গুপ্ত বৃন্দাবনে....

আসমান বলল ঃ কিন্তু আর যে, আর যে সেকথাও ভাবতে পারছি না বন্ধু। ঘরের পাশে আর্ত মানুষের ক্রন্দন, কিন্তু সেবার অধিকার তো পাচ্ছি না? মানুষের যন্ত্রণা, অথচ সেবা করতে পারছি না।

ভূষণ বাধা দিল। বলল ঃ যন্ত্রণা নয়, বল ভ্রান্তি, বল ভ্রান্তি। দূর করবে কি, গ্রহণ করতে হবে। নীলকণ্ঠ কি গরলকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন? না নিজে গ্রহণ করে বিশ্বকে গরলমুক্ত করেছিলেন? তেমনি সেই নীলকণ্ঠের মত ভ্রান্তিটাকে গ্রহণ করতে হবে। বলতে হবে, প্রভু ওই ভ্রান্তিটুকু আমাকে দাও। অজ্ঞনতার আড়ালে আমাকে রাখ। ওরা মুক্তি পাক্, মুক্তি পাক্।

আসমানের চোখ দিয়ে জল পড়ল। বলল ঃ ওরা মুক্তি পাক্। প্রভু, আমাকে তুমি বাঁধো, ওরা মুক্তি পাক্।

সেই মুহূর্তে সোনার আলো ফুটে উঠল পূব আকাশে। ভূষণ বলল ঃ আসমান আসমান, ঐ দেখ আলো।

আসমান বলল ঃ আলো ফুটুক। হে অন্ধকার শুধু তুমি আমার উপর এস। হে অন্ধকার তোমার মধ্যে যদি স্নেহের এতটুকু স্পর্শ থাকে তবে এস না। তবে আমাকে আলোর মধ্যেও অন্ধকারে রাখ। স্নেহটুকু থাক, আর ভ্রান্তির সমস্ত অন্ধকারটুকু নামুক। আমি যে দুই হাতে তাই ধরব বলে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি!

কথাটা শুনবামাত্র হঠাৎ ভূষণের হৃদয়ের মধ্যে কি এক অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার হল। যেন একটা বীজমন্ত্রের মত তা এসে তার বুকের উপর পড়ল। ভূষণ বলে উঠল ঃ একি! আসমান তুমি যে আমার নতুন দৃষ্টি খুলে দিলে। আর আমি কাঁদতেও পাব না। অশ্রুর মধ্যে যে নিবিড় স্নিগ্ধতা। ঐ স্নিগ্ধতা থাক বিশ্বজনের জন্য। আসমান আসমান, আমার যে কথা হারিয়ে যাচ্ছে। কি নেব, কি নেব আমি? জগতের সবটুকুর মধ্যেই যে মঙ্গল। আসমান, আসমান, তুমি আমার অহংকার ভেঙে দিলে। আমি কে? আমি কী নিতে

পারি? সব তিনি, তিনি, তিনি। সব, সব, সব। কথা নেই, ভাষা নেই, চিন্তা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, কিছু নেই। নেই, নেই, আছে, আছে, আছে। ভূষণ আর কোন কথা বলল না। কাঁদল না পর্য্যন্ত।

আসমান তাকালো ভূষণের দিকে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে কোন কিছুর অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না। ভূষণ হঠাৎ উঠে চলতে আরম্ভ করে দিল। আসমান তাকে ডাকতে পারল না। ডাকবার ইচ্ছে হল না। মন যেন এক অসীম নিস্তব্ধতার মধ্যে হারিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দক্ষল দরওয়াজাতে কোলাহল ফুটে উঠল। বুরহান ঘুম থেকে উঠে দক্ষল দরওয়াজার সিঁড়ির দিকে চলল। বড় ব্যাকুল তার মন। সেই প্রচণ্ড ব্যাধিটা আরো কতদূর এগুলো কে জানে? সেই ভয়ে ঘুম পর্য্যন্ত হয়নি তার। কিন্তু দরওয়াজাতে গিয়ে দেখল দরওয়াজা বন্ধ। একি! হঠাৎ এই ব্যতিক্রম! বুরহানের জীবনে কখনো এই দক্ষল দরওয়াজা সে বন্ধ দেখেনি। রাত্রিতে এই দরওয়াজা বন্ধ হয়। কিন্তু তখন তারা কেউ দরওয়াজার কাছে থাকে না। দিনের বেলা কেউ কখনো দেখেছে কি? বুরহান সেখানে দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে আরো দু একজন নাগরিক এল। সবাই আশ্চর্য্য হল, একি! দরওয়াজা বন্ধ কেন?

বুরহান মাটীর প্রাকারের উপর দাঁড়ানো হাব্‌সি খোজাকে প্রশ্ন করল ঃ দরওযাজা বন্ধ কেন?

—সুলতান কা হুকুম।

—কেন?

—নেহি জান্‌তা।

সেই সময় বুরহানের দৃষ্টি পড়ল বহুদূর ব্যাপী প্রসারিত মাটীর দেয়ালেব উপর। পাশা পাশি হাজার ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে। একি! একি! সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়ল ঃ একি!

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

প্রত্যেকেরই চোখে প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর নেই।

বুরহান বলল ঃ যুদ্ধ লাগল কি কোন? দিল্লীর ফৌজ এসে কি দুর্গ অবরোধ করল?

ভয়ার্ত মানুষেরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। এ কথার উত্তর কেউ জানে না।

একজন বলল ঃ তবে সর্বনাশ হবে। ভিতরে মহামারী, বাইরে অবরোধ, আর রক্ষে নেই।

সকলেরই মুখ শুকিয়ে উঠল।

সুলতানের ঘোষণার কথা অনেকেরই মনে পড়ল। কেউ কেউ বলতে লাগল ঃ হায় আমি যদি গৌড় ছেড়ে যেতুম!

কেউ কেউ বলল ঃ বাঁচতুম। সঙ্গে সঙ্গে একশত স্বর্ণ মোহরও পেতুম।

—স্বর্ণ মোহর তো দূরস্থান এখন জীবন যায়।

—হায় সুযোগ জীবনে বহুবার আসে না! এসেছিল, হারিয়ে ফেলেছি।

বুরহান সকলকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল। বলল: আপনারা ভয় পাবেন না। কারণটা আগে জানা যাক।

একজন বলে উঠল: আর কি হবে, আপনাদের কথা শুনে তখন গৌড় ত্যাগ করিনি।

একজন কেঁদেই ফেলল: হায় আল্লা! এখন কি করব?

বুরহান বলল: আপনারা ভয় পাবেন না। বিপদে নির্ভিক ভাবে দাঁড়ানোতেই তো মানুষের পরিচয়।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল একজন: জাহান্নামে যাও তুমি! তুমি শয়তান।

গোলমালটা ক্রমশই জমে উঠতে লাগল।

বুরহান কোন কথা বলতে গেলেই জনতা ক্রুদ্ধ হতে লাগল। কেউবা কাঁদতে লাগল। অনুপায়ে সে চুপ্ করে থাকল।

অসহায় ভাবে মানুষেরা শুধু মাটীর প্রাকারের উপর কাতারে কাতারে দাঁড়ানো সুলতানী ফৌজ দেখতে লাগল।

এমন সময় আলাউদ্দিনকে সেইদিকে ছুটে আসতে দেখা গেল। বুবহানের কাছে সে ছুটে এসে বলল: জনাব আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।

বুরহান উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল: কি হয়েছে আলাউদ্দিন? দুর্গ অবরোধ করেছে কেউ? কারা?

আলাউদ্দিন বলল: বাইরের লোক কেউ নয। আমাদের নিজেদের লোক। আমাদের নিজেদেরই সুলতান।

সুলতান! আশ্চর্য্য হয়ে বুরহান তাকাল আলাউদ্দিনের দিকে।

আলাউদ্দিন বলল: হ্যাঁ, সুলতান। কাল রাতে তিনি আমীরদের নিযে গৌড় ত্যাগ করে আদিনাতে চলে গিয়েছেন। মহামারী ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। পাছে গৌড়ের মাটীর প্রাচীরের বাইরে এই রোগ ছড়িযে পড়ে তাই তিনি দরওয়াজা বন্ধ করো দিয়েছেন। সর্বত্র ফৌজ বসিয়েছেন কেউ যাতে বাইরে যেতে না পারে।

বুরহান চিৎকার করো উঠল: বেইমান্, দুষ্মন্। সুলতান জাহান্নামে যাক্। সুলতান মুর্দাবাদ।

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল: সুলতান মুর্দাবাদ।

আলাউদ্দিন চিৎকার করে বলল: আমরা মানবো না, মানবো না এই অবরোধ। ভাঙ্ ভাঙ্!

একদল লোক মাটীর প্রাকারের উপরে উঠে ফৌজদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুতীক্ষ্ণ বর্শার মুখে আহত হয়ে কেউ বা নিহত হয়ে মাটীতে গড়িয়ে পড়ল। রক্ত ছুটল। চিৎকার করে অভিশাপ দিতে লাগল জনতা: সুলতান জাহান্নামে যাক্! সুলতান মুর্দাবাদ!

কেউ কাঁদতে লাগল। কেউ নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়তে লাগল।

বুরহান চিৎকার করে উঠল ঃ ভয় পাবেন না। মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আমরা মৃত্যুকে জয় করব।

কিন্তু আশার আলো এতটুকু ফুটে উঠল না মানুষের মুখে। বরং একটা হতাশা, একটা পাগলামী দেখা দিল। কেউ অকারণে ছুটল ; কোন্ দিকে, না জেনেই।

শুধু দক্ষল দরওয়াজা নয়, দেখতে দেখতে গৌড়ের সর্বত্রই এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্রই চিৎকার উঠল, অভিশাপ ফুটল, উন্মাদনা দেখা দিল। গৌড়ের মাটীর কেল্লার চতুর্দিক থেকে সেই বিশৃঙ্খলার সংবাদ আসতে লাগল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বুরহান, মৌলভি সাহেব, আলাউদ্দিন, হেকিম নিজামুদ্দিন সবাই।

বুরহান তাকাল শুভ্রকেশ মৌলভি সাহেবের দিকে ঃ কি হবে মৌলানা সাব্?

মৌলভি সাহেব বললেন ঃ আল্লাহ্তালার উপরে বিশ্বাস রেখে এগুতে হবে। সুলতানের উপর তিনিই তো সুলতান।

হেকিম নিজামুদ্দিনের দিকে তাকাল বুরহান ঃ হেকিম সাহেব্, মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে কি ?

হেকিম বললেন ঃ সম্ভব ছিল, কিন্তু আজ আর সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না।

—কেন ?

—রোগের হাত থেকে বাঁচলেও অনাহারে মরতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ এই কথা শুনবার পর উন্মত্ত হযে গেছে, তাদের আর শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব হবে না। উচ্ছৃঙ্খল আর এই মরিয়া মানুষই সব চাইতে নিজেদের ক্ষতি করবে বেশী।

আলাউদ্দিন বলল ঃ তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

—হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে বৈকি ?

বুরহান বলল ঃ চলুন, সুলতানের প্রাসাদের দিকে এগুনো যাক। ওই প্রসাদটাকে প্রথমে দখল করতে হবে। যে মানুষকে সুলতান অবহেলা করেছেন, সেই দুস্থ মানুষের সেবাকেন্দ্র খুলব আমরা তাঁরই প্রাসাদে।

আলাউদ্দিন বলল ঃ সুন্দর প্রস্তাব। চলুন জনাব এক্ষুণি আমরা সুলতানের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাই।

—'চল, চল।' বুরহান এগুল।

বুরহানের পেছনে চল্ল মৌলভি সাহেব, নিজামমুদ্দিন, আলাউদ্দিন এবং আর সবাই।

রাস্তায় একখানা গাড়ী পর্য্যন্ত নেই। যাদুমন্ত্রে যেন একটা বিরাট ব্যাপ্ত ভয় দেখতে দেখতে গৌড়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সরাই সরে পড়ছে, কোথায় কে জানে ! অগত্যা ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলল সুলতানের প্রাসাদের দিকে।

বেশ কিছুটা সময় লাগল সুলতানের প্রাসাদে যেতে। তখন সূর্য্য মাথার উপর অনেকটা উঠে গেছে। পথে যেতে যেতে কোথাও বা উন্মত্ত চিৎকার কানে ভেসে এল, কোথাও বা করুণ কান্না।

করুণ কান্না শুনে মৌলভি বললেন ঃ আল্লা রহ্মান্। বিপর্য্যস্ত মানুষকে রক্ষা কর খুদাতালা !

নহবৎখানার পাশ দিয়ে এগুলো ওরা। শূন্য। একটিও মানুষ নেই সেখানে। একটা বীভৎস নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মুক্তদরওয়াজা গৃহগুলো যেন হাহাকার করছে। একটি কুকুর পথের উপর পড়ে ছট ফট্ করছে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ফেটে বেরুতে চাইছে। কোন্ অদৃশ্য এক নির্মম হাত যেন বুকের ভেতর থেকে তার প্রাণখানা টেনে বের করবার চেষ্টা করছে। একবারে নিতে পাচ্ছেনা, তাই কাতরাচ্ছে কুকুরটা।

মৌলভি সাহেব তা দেখে বললেন ঃ হায় একি বীভৎসতা! একি করাল মৃত্যু! এত কাছে এমন মৃত্যু, এমন প্রচণ্ড ভাবে তাণ্ডব লীলা খেলে গেল অথচ সুলতান আড়াল দিয়ে রেখে আমাদের জানতে পর্য্যন্ত দিলেন না!

সেই বীভৎস নির্জন নিস্তব্ধতার দিকে তাকাতে বুরহানের বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। সে বলল ঃ চলুন তাড়াতাড়ি চলুন।

হেকিম নিজামুদ্দিন বললেন ঃ তাড়াতাড়ি চললেও এর হাত থেকে মুক্তি নেই জনাব। আমাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি এই মহামারী অগ্রসর হচ্ছে।

মহামারীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে না পারা গেলেও সবাই তাড়াতাড়ি হাঁটল। দূরে সুলতানের প্রাসাদের চূড়া নজরে পড়ল। একটা অস্পষ্ট কোলাহল সেই দিক থেকে ভেসে আসছে।

বুরহান কান পেতে শুনে বলল ঃ ও কিসের শব্দ?

হেকিম বললেন ঃ বোধ হয় উন্মত্ত জনতা ঘিরে ধরেছে প্রাসাদ।

আলাউদ্দিন একটু ম্লান হেসে বলল ঃ হায় বেকুবেরা, এখন কি আর তাঁকে পাওয়া যাবে?

হেকিম বললেন ঃ লুণ্ঠনের আশায়ও অনেকে এসেছে, সবাইকে বোকা ভেবো না।

আর একটু এগিয়ে যেতে দৃশ্যটাও সকলের চোখে ভেসে উঠল। দক্ষল দরওয়াজায় আর কি জনসমাবেশ হয়েছিল খানে তারচেয়ে শতগুণ বেশী। তেমনি চিৎকার, তেমনি অভিশাপ। কিসের যেন ভাঙনের শব্দ।

হেকিম বললেন ঃ রাজপ্রসাদ ভাঙছে লুঠেরারা।

বুরহাম আশ্চর্য্য হল ঃ এখানে ফৌজ পর্য্যন্ত রাখেননি সুলতান?

হেকিম বললেন ঃ মৃত্যুটা সুলতানের চোখের উপর দিয়েই ঘটেছে! তিনি বুঝতে পেরেছেন গৌড় আর থাকবেন না। এখানে আর বাস করা যাবেনা কোন দিন। পরিত্যক্ত প্রাসাদের প্রতি আর তাঁর মায়া নেই।

বুরহান বলে উঠল ঃ উঃ! কি নিষ্ঠুর, কী ভয়ানক!

হেকিম বললেন ঃ এখনি কি ভয়ানক দেখলেন? মৃত্যুর স্তূপ তৈরী হবে। পচা দুর্গন্ধ ছড়াবে। শেয়াল কুকুর পর্য্যন্ত সেই দুর্গন্ধে মড়া স্পর্শ করবে না।

বুরহান বলল ঃ আমরা কি কিছুই করতে পারব না?

—কি আর করবেন। সুলতানের প্রাসাদের অবস্থা দেখলেন তো? আপনি কি মনে করেন এখানে কোন চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা যাবে?

—তাহলে কোথাও কি কোন ব্যবস্থা হবে না?

—কিছু হবার উপায় নেই। একধারে মৃত্যু আর একধারে উচ্ছৃঙ্খলতা। একেই তো

মৃত্যু নিজের বেগে ছুটে আসছিল, উচ্ছৃঙ্খলতা এখন তাকে আরও পথ কেটে ডেকে আনবে। আমি বলতে পারি না আগামী সপ্তাহে গৌড়ের অবস্থা কি দাঁড়াবে।

আলাউদ্দিন ভয় পেল! বলল ঃ ফিরে চলুন জনাব।

বিমর্ষ বুরহান বলল ঃ চল।

আবার সেই নিস্তব্ধ মৃত্যুর রাজত্ব নহবৎখানার দিকে ওরা ফিরে চলল। ঘাতক সুলতান তুমি একি করলে? তোমার উপর বিশ্বাস করে ছিলুম আমরা, মৃত্যুকে লুকিয়ে রেখে হঠাৎ এমনি করে তা আমাদেরই উপর ছেড়ে দিয়ে গেলে?

নহবৎখানা পার হয়ে আবার ওরা দক্ষল দরওয়াজার কাছে এল।

মৌলভি সাহেব আশ্চর্য্য হয়ে মাটীর দিকে তাকালেন । দেখেছ, দেখেছ?

—কি? কি?" সকলেই সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকাল।

মৌলভী সাহেব বললেন ঃ ঐ দেখ!

সকলে দেখল ঃ বিড়াল, কুকুর, ইঁদুর, সব নানা দিকে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে কারা যেন ওদের পেছনে তাড়া কুরে ছুটছে।

আলাউদ্দিন জিজ্ঞেস করল ঃ এরা এমন করে ছুটছে কেন?

হেকিম বললেন ঃ মৃত্যু তাডা করেছে। মনে রাখবে, ওরা যেদিকে চলেছে সেই দিকেই মৃত্যু ছুটে চলেছে। সুলতানেরও হেকিম ছিল। সমস্ত বিচার করে নিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আর দেরী নেই। অল্প করেক দিনের মধ্যে সমস্ত গৌড় ধ্বংস হবে। তাই তিনি আর কালবিলম্ব না করে গৌড় ছেড়ে পালিয়েছেন। দেখছ না, প্রহরীদের পর্য্যন্ত তিনি মাটিতে রাখেননি, দুর্গ প্রাকারের উপর বসিয়ে গেছেন। গৌড়ের একটি ইষ্টক স্পর্শও এখন মৃত্যুর কারণ হবে।

বুরহান ভয় পেযে বলল ঃ ওরা যে সব দক্ষল দরওয়াজায় আমাদের আস্তানার দিকেই চলেছে?

নির্বিকার ভাবে হেকিম বললেন ঃ হ্যাঁ, মৃত্যুর গতি এবার ঐ দিকেই।

বুরহানের মুখে কোন কথা ফুটল না।

এমন সময় মৌলভি সাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ঃ সোভান আল্লা।

—কি হল মৌলভি সাহেব?

—গৃধিণী উড়ছে, শকুনী উড়ছে আকাশে, বড় দুর্লক্ষণ।

বুরহানের মুখখানা শুকিয়ে গেল। সে বলল ঃ মৌলভিসাহেব, এখন আমাদের কি করা উচিত?

মৌলভি বললেন ঃ আল্লাহ্‌তালার স্মরণ ছাড়া আর কি পথ বাকী আছে ভাই? আর সন্তু মানুষের কাছে থাকা উচিত। শাস্ত্র বলেছে রোজ কেয়ামতের দিনে একমাত্র সন্তু ব্যক্তিই আল্লাহর করুণা লাভ করেন। কিন্তু এমন সন্তু কে আছেন? থাকলেও তিনি কি এই ভীড়ের মধ্য আছেন?

বুরহান জিজ্ঞাসা করল ঃ সন্তু কে মৌলভি সাহেব?

—(আল্লা কে যিনি বুকের মধ্যে অনুভব করেছেন তিনিই সন্ত্। বিশ্বের সর্বত্র যিনি তাঁর অপার করুণার সন্ধান পেয়েছেন তিনিই সন্ত্। যিনি লোভের মধ্যে থেকেও আকর্ষণ অনুভব করেননি তিনিই সন্ত্। যিনি রূপের মধ্যে থেকেও শুধু অরূপের দিকে তাকিয়েছেন তিনিই সন্ত্। যিনি তাঁর মহান বিরাটত্ব দেখে বাক্ হারিয়ে পরম আনন্দময় নির্বাকত্ব লাভ করেছেন তিনিই সন্ত্।)

হঠাৎ বুরহান তা শুনে বলে উঠল ঃ আছে, আছে, তাহলে সে আছে!

—কোথায়?

কিন্তু সে কথার উত্তর না দিয়ে বুরহান দ্রুত ছুটে গেল।

সে গিয়ে দাঁড়াল ভূষণের ভাঙা গৃহের কাছে। চিৎকার করে তাকে ডাকল ঃ 'ভূষণ! ভূষণ!' কিন্তু কোন উত্তর এল না। ভেতরে ঢুকে গেল সে।

ভূষণ নেই। তার কাগজ পড়ে রয়েছে, কলম পড়ে রয়েছে, সে নেই।

কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে সর্বত্র বুরহান খুঁজল ভূষণকে, কিন্তু কোথাও পেল না। ভগ্ন চিত্তে সে ফিরে এল। ফিরে এল সে নিজের ঘরের কাছে।

মৌলভি সাহেব বললেন ঃ পেলে বাছা?

—না।

—আল্লার নাম করি এস।

আশ্চর্য্য দ্রুত পদক্ষেপে মৃত্যু এগিয়ে আসতে লাগল। দুপুরেই খবর পাওযা গেল যে দক্ষল দরওয়াজা আক্রান্ত হয়েছে।

বুরহান যেন চিৎকার করে উঠল ঃ কোথায়?

—দরওয়াজার কাছে। মীর হাসিব খান এইমাত্র মারা গেলেন। জনাব নাজিমুদ্দিনের গৃহের সবাই আক্রান্ত।

অসহায় ভাবে বুরহান তাকালো মৌলভি সাহেবের দিকে।

মৌলভি সাহেব বললেন ঃ বাচ্চা, সে যখন এসে গেছে তখন ভয় করলে চলবে না। বীরের মতই মৃত্যু বরণ করতে হবে। শুধু খুদাকে স্মরণ কর।

সংবাদ এল ঠিক সেই সময়—উত্তেজিত জনতা কারাগারগুলো সব খুলে দিয়েছে। দুষ্মনেরা বেরিয়ে পড়েছে। দিকে দিকে তারা লুণ্ঠন করে চলেছে। দক্ষল দরওয়াজার দিকেও আসছে একদল।

হেকিম হেসে বললেন আসতে দাও। দুষ্মনের চেয়েও বড় দুষমন এইমাত্র দক্ষল দরওয়াজা আক্রমণ করেছে। আর ভয় নেই।

শুধু বুরহান জিজ্ঞেস করল ঃ সমস্ত কারাগার খুলে দিয়েছে?

—হ্যাঁ জনাব।

মৌলভি বুরহানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ কেন?

বুরহান বলল ঃ চমনলাল যে কারাগারে বন্দী হয়েছিল। তবে সেও মুক্তি পেয়ে থাকবে। মৌলভিসাহেব, তবে মৃত্যুর চেয়ে সত্য বুঝি কিছু নেই। সে ঠিক বিচার করেছে; চমনলাল দোষী নয়। আজ এই ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে একটা সান্ত্বনা যে, সে মুক্তি পাবে।

মৌলভি সাহেব বললেন ঃ কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়াই মুক্তি নয়। বাসনার কারাগার সব চাইতে বড়, তার মধ্য থেকে মুক্তি না পেলে মানুষের মুক্তি নেই।

বুরহান বলল ঃ এই মৃত্যুও কি মোহের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না?

মৌলভি সাহেব বললেন ঃ এই যে মৃত্যু দেখছ, এটাতো বাইরের মাত্র। মনে মনে সাদি হয়ে যাবার পর বর কনে যেমন সামাজিক সাদিতে বসে, তেমনি। সব চেয়ে বড় মৃত্যু অন্ধতার মধ্যে ডুবে যাওয়া। যারা মোহের অন্ধকারে ডুবে আছে তারা আগেই মরে আছে। এই মৃত্যু আর তাদের কি মুক্তি দেবে? এতো নকল মৃত্যু।

একটা দীর্ঘ্যশ্বাস ফেলল মাত্র বুরহান!

এমন সময় রিহান ছুটে এল বুরহানের বৈঠকখানায়। সে যেন বিপর্য্যস্ত, এলোমেলো একটা দুষ্ট কীটের দংশনে একান্ত অশান্ত। ধেনুবৎসকে ডাঁই পোকা কামড়ালে যেমন অবস্থা হয়, তেমনি।

বুরহান তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল মাত্র। এই হল মৃত ব্যক্তি। অজ্ঞতার অন্ধকারে, কামনাব তাড়নাতে নিজেকে ভুলে বসে আছে। মৃত্যু যে মাথার উপর উদ্যত সে ভয় ওর আছে কি? না, থাকতে পারে না—কারণ মৃতের আবার মৃত্যু ভয় কি?

রিহান বুরহানের দিকে তাকিয় বলল ঃ বুরহান, সমস্ত কারাগার নাকি খুলে দিয়েছে দুষ্‌মনেরা?

—হ্যাঁ।

—চতুর্দিকে লুঠ হচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—হচ্ছে?

—শুধু লুঠ কি, ধ্বংস হচ্ছে। আমি তুমি সবাই ধ্বংস হব, ভাববার নেই আর কিছু।

রিহান আর দাঁড়ালো না, যেমনি এসেছিল তেমনি ছুটে গেল।

আলাউদ্দিন বলল ঃ আহা! মালিক রিহানুদ্দিনের আজ কি অবস্থা। দেখে চেনাই যায় না।

বুরহান বলল ঃ জীবনেই ও মরে আছে। আজকে যে মৃত্যু আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আসছে তার চেয়েও কি ভয়ানক এই মরণ!

আলাউদ্দিন বলল ঃ ঠিক বলেছেন জনাব, এর চেয়ে যে কোন মৃত্যুই ভাল।

রিহান বুরহানের ওখান থেকে বেরিয়েই রাস্তায় ছুটল। এক্কা খুঁজল। কিন্তু না, কোন এক্কা নেই। পরিচিত একজন এক্কাওয়ালা রাস্তা দিয়ে হেঁটে ব্যস্তভাবে কোথায় যাচ্ছিল। রিহান হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে ডেকে থামাল ঃ এই শুনছ?

নিতান্ত গ্রাহ্য না করেই যেন জবাব দিল এক্কাওয়ালা ঃ বলুন জনাব।

—তোমার এক্কা কোথায়? আমার সঙ্গে একবার পশ্চিম-গড় চল না। আমার বড় দরকার।

একাওয়ালা বলল ঃ একা ! একা কোথায় জনাব ? সারা গৌড়ে আর একখানাও একা মিলবে না।

—কেন ?

—মানুষ বাঁচবে না মরবে তার ঠিক নেই, একা চড়বে কে ? আর চালাবেই বা কে ?

রিহান কাতর অনুনয় করে বলল ঃ চল ভাই। আমার বড় দরকার। তোমাকে প্রচুর বকশীস্ দেব।

—বকশীস্ নিয়ে তো আর কবরে যেতে পারব না, তাহলে নিতুম।"

একাওয়ালা আর দেরী না করে চলে গেল।

কিন্তু রিহানের যে আর থাকবার উপায় নেই। সে ছুটল পশ্চিম গড়ের দিকে। আসমান, আসমানকে না দেখে সে থাকতে পারবে না। সে প্রায় দৌড়তে লাগল।

পশ্চিম গড়ে সে যখন এসে পৌঁছল তখন ক্লান্তিতে সে মৃতপ্রায়। প্রবল বৃষ্টির মত তার দেহ দিযে ঘাম ছুটছে। সে এসে আসমানের গৃহের সম্মুখে দাঁড়ালো। প্রবেশ পথেই দাঁড়িয়েছিল খাসনবিস। সে তাকে অগ্রাহ্য করেই ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইল।

খাসনবিস জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাচ্ছেন জনাব ?

রিহান তাকে দুহাতে ঠেলে বলল ঃ ছাড়, পথ ছাড়, আসমানের কাছে যাব।

—সে নেই।

—কোথায় সে ?

—জানি না

রিহান খাসনবিসের কাঁধ ধরে নাড়িযে দিল ঃ কোথায, কোথায সে ?

—জানি না।

পাগলের মত রিহান খাসনবিসকে চেপে ধরল ঃ বল কোথায় ? কোথায লুকিয়ে রেখেছ তাকে ?

—জানি না।

গলাটা টিপে ধরতে গেল রিহান খাসনবিসের ঃ জান, বল।

—জানি না।

গলাটা আরো টিপে ধরল রিহান।

দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল খাসনবিসের। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল—ছাড়ুন, ছাড়ুন, আঃ......।

ঠিক সেই সময় দেখা গেল আর একজন কে সেই দিকে এগিয়ে আসছে।

পিশাচের বীভৎস দৃষ্টি তার চোখেমুখে।

খাসনবিস চীৎকার করে উঠল ঃ বাঁচান, আমাকে বাঁচান।

দৌড়ে সেই ব্যক্তি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। রিহানকে ছাড়িয়ে দিল সে। খাসনবিস নিজের গলাটায় হাত বুলিয়ে শ্বাস নেবার চেষ্টা করল।

ক্রুদ্ধ রিহান ফিরে তাকাতেই চমকে উঠল ঃ কে !

—চিনতে পারনি দোস্ত্? ভেবেছ এইভাবে আসমানকে তুমি নেবে? একদিনের জন্যও আমি আসমানকে ভুলিনি। তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কথাও ভুলিনি।

রিহান চোখ দুটি বড় বড় করে পিছিয়ে গেল : চমনলাল।

একটা উদ্যত ছুরি চমনলালের হাতে ঝল্‌সে উঠল : হ্যাঁ দোস্ত্ আমি।

রিহান ভয়ে ভয়ে বলল : তুমি একি করছ!

চমনলাল বলল : এক আসমানে দুই সূর্য্যের স্থান হয় না।

রিহান আরো পিছিয়ে গেল : চমন শোন।

কিন্তু কোন কথা শুনল না চমনলাল। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত সে রিহানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল।

সেই রক্তের উচ্ছল প্রবাহ দেখে ভয়ে চোখ বুজল খাসনবিস।

চমনলাল উঠে দাঁড়াল : আসমান কোথায়?

ভয়ে ভয়ে খাসনবিস বলল : ভেতরে।

চমনলাল ভেতরে প্রবেশ করল।

খাসনবিস এই অবসরে ছুটল। কোথায় ছুটল সে জানে না।

আসমানতারা সত্যি তখন ঘরে ছিল না। গৌড়ের সেই দুদ্ধর্ষ রোগ তাকেও ব্যাকুল করেছিল, তার চোখেরও নিদ্রা কেড়ে নিয়েছিল। অভিমান নেই আসমানতারার ভগবানের উপর। হয় তো গৌড়ের মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত পাপের ফল স্বরূপই এই মৃত্যু তাদের উপর নেমে এসেছে। আসমানতারার দুঃখ, আসমানতারার যন্ত্রণা ছিল অন্য কারণে। মানুষের অসীম যন্ত্রণার দিনে সে নিষ্ক্রিয় রয়েছে, থাকতে বাধ্য হচ্ছে, এই তার দুঃখ। ভগবান কি সেবার অধিকার তাকে দেবেন না। মানুষের অসীম কষ্টে এতটুকু সেবা না করতে পারলে আজ যে তার বড় দুঃখ। তাই মুহূর্তের জন্য এতটুকু স্বস্তি ছিল না তার। দিনের অবসর রাতের নিদ্রা সব যেন তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। ভূষণ চলে যাবার পর তার মনে এতটুকু শান্তি এল না। ভূষণ হয়তো সেই পরম মুক্তির আহ্বানে সমস্ত বন্ধন, মায়ামোহ, শোক, দুঃখ সব অতিক্রম করে গেল, কিন্তু আসমান পারল না। তার শুধুই মনে হল মুক্তি নয়, সেবা, শুধু সেবাতেই তার একমাত্র চরিতার্থতা। হঠাৎ এমন সময় গৌড় নগরীর সর্বত্র কোলাহল শুনতে পেল আসমান। ব্যাকুল হয়ে চতুর্দিকে তাকালো সে। দেখল : লোকজন ছুটছে, ব্যস্ত সবাই। কি একটা বিরাট শঙ্কা, তাদের চোখে মুখে। কি একটা বিরাট বিভীষিকা যেন সবাইকে তাড়া করেছে।

আসমান বলল : কি গো, কি হয়েছে তোমাদের?

উত্তর দেবার সময় পর্য্যন্ত পেলনা কেউ। যে হাজারো লোক শুধুমাত্র আসমানের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার মাত্র তাকে চোখে দেখবার জন্য তর ঘরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছে, তারাই আসমানকে মুক্ত অঙ্গনে দেখেও সে দিকে তাকাবার সময় পেলনা কেউ।

এমন সময় খাসনবিস এলে আসমান শুনল সুলতানের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী।

গৌড় অবরুদ্ধ। মাটীর প্রাকারের উপর ফৌজ। দরওয়াজা বন্ধ। সুলতান পালিয়েছেন আদিনাতে। মৃত্যু উন্মত্ত স্রোতে নগরকে প্লাবিত করে দেবার জন্য ছুটে আসছে সমস্ত গৌড়ের উপর দিয়ে। অসহায় মানুষ, ভীত, ত্রাস্ত।

আসমান শুনে মুহূর্তমাত্র আর বিলম্ব করেনি, বেরিয়ে পড়েছিল পথে।

খাসনবিস আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিল ঃ একি কোথায় যাচ্ছেন?

আসমান শুধু বলেছিল ঃ আহ্বান এসেছে, সেব্বর আহ্বান। ভগবান মঙ্গলময়।

আসমান মুহূর্তে ছুটে গিয়েছিল—কোন লক্ষ্যস্থল উদ্দেশ্য করে নয়, বিপন্ন মানুষের মাঝে যাবার জন্য। চতুর্দিকে আজ বিপন্ন মানুষ, যে দিকে হোক এগুলেই হোল। সে এগিয়েছিল নহবৎখানার দিকে। এতদিন সেখানেই যে মৃত্যু বাসাবেঁধে ছিল।

লোকজন নেই। ঐ অঞ্চলটাই যেন নিঃস্তব্দ। লোকেরা পালিয়েছে। ঘরগুলি মুক্তদরওয়াজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আসমান প্রথম যে শূন্য ঘর দেখেছিল ঢুকে পড়েছিল। দেখেছিল ঃ লোক আছে, সবাই মৃত। জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। পুরুষ পড়ে রয়েছে, স্ত্রী পড়ে রয়েছে, পাশে ছেলে মেয়ে। মুখের উপর মৃত্যুর করাল বিভীষিকা ছড়ানো।

এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে দেখেছিল আসমান। তারপর যুক্ত করে উর্ধ্বে তাকিয়ে বলেছিল ঃ ভগবান তুমি এদের শান্তি দিও। ইহলোকের পাপ যেন এখানেই শেষ হয়, পরলোকে তোমার অসীম করুণার স্পর্শে তাদের ধন্য কোরো।

তারপর সে আর একটি গৃহে গিয়েছিল—সেখানেও অমনি।

একের পর এক গৃহ খুঁজে দেখেছিল সে, কিন্তু সর্বত্রই জীবন পালিয়েছে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে।

আসমান কেঁদে ফেলেছিল ঃ হায় ভগবান! এতটুকু কেন সেবার অধিকার দিলে না আমাকে? না জানি কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণার স্পর্শে এরা সবাই কষ্ট পেয়েছে। হয়তো মুখে জলটুকু তুলে দেবার কেউ ছিল না। আহা! বেচারী হতভাগ্য মানুষেরা!

আসমান ছুটেছিল, শুধু ছুটেছিল। অবশেষে একটি গৃহের কাছে এসে সে জীবনের ক্ষুদ্র একটি ইঙ্গিত পেয়ে কম্পিত বক্ষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সুসজ্জিত একটি গৃহ, কিন্তু সব মৃত। মূল্যবান মেহগনি কাঠের পালঙ্কের উপর সুদৃশ্য বিছানাতে শুয়ে আছে একজন নারী। এখন আর তাকে চেনবার উপায়মাত্র নেই। মৃত্যু-বিভীষিকার আড়ালে বয়সের সীমারেখা তার যেন হারিয়ে গেছে। শুধু অঙ্গাভরণের নমুনা দেখে মনে হয়, বুঝিবা তার যৌবন ছিল। তাই নিজেকে অলঙ্কৃত করবার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না মেয়েটার। তার পাশে অত্যন্ত কচি বয়েসের একটি বালক। তখনো তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন রয়েছে। মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচবার জন্য শয্যার এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছে তার যন্ত্রণাকাতর দেহটি। জননীর উদ্বেগাকুল হৃদয় নিয়ে আসমান গিয়ে সেই পালঙ্কের প্রান্ত ধরে দাঁড়ালো। সেই ক্ষুদ্র রোগলাঞ্ছিত দেহটির দিকে সে তাকালো। দুই হাত দিয়ে তাকে ধরতে গেল আসমান, কিন্তু থমকে দাঁড়ালো। যেন হঠাৎ ছেলেটি শক্ত হয়ে গেল। ওর কোমরের ক্লাছটা একটু নড়ে উঠল। ধীরে ধীরে

অস্থির হাত দুটি এবং পা দুটি যেন আড়াআড়ি ভাবে সোজা হয়ে গলে। একটি শাল তখনো তার দেহের উপর ছিল। তার আড়ালে সেই ক্ষুদ্র উলঙ্গ দেহটি থেকে যেন একটা ভ্যাপসা পশমের আর বাসি ঘামের গন্ধ বেরুল। ছেলেটির দুপাটি দাঁত পরস্পর ঘর্ষণ খেয়ে কড়মড় করে উঠল। একটু পরেই আবার যেন সে বিশ্রামের ভঙ্গী করল। তার ছড়ানো হাত পা-গুলিকে সে শয্যার মধ্যভাগে গুটিয়ে আন্‌ল। তখনো তার চোখ দুটি বন্ধ। তখনো মুখে কোন শব্দ নেই। কিন্তু তার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন দ্রুততর হচ্ছিল।

আসমান ব্যাকুল হয়ে তাকে ধরতে গেল।

তার সেই সেবাব্যাকুল হাত দুটি স্পর্শ করল সেই কোমল তনুটি।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সেই ক্ষুদ্র দেহটি যেন বিরাট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। যেন কিছু তাকে কামড়ে দিয়েছে।

চমকে আসমান নিজের হাত দুটি গুটিয়ে নিল—হায়, ওকে কি সে ব্যথা দিয়ে ফেলল!

ছেলেটি দীর্ঘ্য করুণ চীৎকার করে উঠল।

আসমানের বুকটা যেন ফেটে গেল। সে ডাকল ঃ আমার যাদুমণি কি হয়েছে তোমার, এই তো আমি তোমার পাশে রয়েছি!

কিন্তু কোন শব্দ সেই ক্ষুদ্র মানব শিশুটির কানে প্রবেশ করল বলে মনে হল না।

সে একটা বিশ্রী সঙ্কুচিত ভঙ্গীতে পড়ে রইল। একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় মাঝে মাঝেই তার দেহটি নড়ে উঠছিল। যেন সেই দুর্বল দেহের বাঁধনটি মহামারীর ধারালো আক্রমণের কাছে ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়ছিল। জ্বর-বিকারের নিষ্ঠুর উত্তাপে যেন ফেটে যাবে সে।

কিন্তু ঝড়ের বেগের মত সেই মহামৃত্যুর আক্রমণ ক্ষণকালের জন্য আবার তার দেহকে একটু বিশ্রাম দিল। যেন একটা ক্লান্ত নিদ্রা এল তার। সেই ভাবে সেই ক্ষুদ্র কোমল অঙ্গটি কিছুক্ষণ থাকল।

আসমান পরম করুণার দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। মনে হল সে চাইছে তার চোখের দৃষ্টি ভেদ করে স্নিগ্ধ সিঞ্চনের মত করুণার বৃষ্টি ঝরুক। শান্তি পাক এই ক্ষুদ্র শিশুটি।

আসমান ঊর্ধ্বে তাকিয়ে যুক্ত করে বলল ঃ হে ভগবান, হে পরম প্রেমময় গোপীনন্দন—তুমি স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দাও এই ক্ষুদ্র শিশুটির দেহের উপর! শান্তি দাও, ওর সকল যন্ত্রণা আমাকে দাও।

আসমানের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ছেলেটি নীরবে পড়ে থাকল। এত অনুত্তাল মনে হল সে ভঙ্গী, যেন সে মৃত।

কিন্তু আবার তার উপর তৃতীয় আক্রমণ ঘটল। আবার সেই মহামারীর উন্মাদ তরঙ্গ তার দেহের উপর ফুলে উঠল। ক্ষুদ্র দেহটা একটু যেন ছিটকে ঊর্ধ্বে উঠে আবার নেমে গেল। ছেলেটি কুঁকড়ে বিছানার এক প্রান্তে গুটিয়ে গেল—দেখে মনে হল আগুনের ভয়াবহ বীভিষিকা প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে তাকে স্পর্শ করতে আসছে, তাই সে পালাবার চেষ্টা করছে।

একটুখানি—হঠাৎ পাগলের মত এদিক ওদিক মাথাটা নাড়িয়ে দিল সে, তারপর শালটা ঠেলে গা থেকে ফেলে দিল।

তার উত্তপ্ত চোখের পাতা দুটির ফাঁকে কয়েক বিন্দু অশ্রু ফুটে উঠে সীসার মত নির্জীব পাণ্ডুর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

আসমান চীৎকার করে কেঁদে উঠল: ভগবান, ভগবান, হে যদুনন্দন গোপীবল্লভ, হে বিরাট পুরুষ, তুমি ওকে শান্তি দাও প্রভু।

বিকারটা আবার একটু কমল। সে ক্ষীণ হাত পা-গুলি একটু আরাম করবার ভঙ্গীতে ছড়িয়ে দিল। ক্ষুধার্ত রোগ যেন কয়েক মুহূর্তেই তার হাত পায়ের নবীন মাংসগুলিকে লোভী শকুনীর মত নিঃশেষিত করে দিয়েছে। শুধু হাড় কখানা দেখা যাচ্ছে। শিশুটি সেই অবস্থাতে অসাড় হয়ে কিছু সময় বিছানার উপর পড়ে রইল।

যেন উত্তাল সমুদ্র ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে। ছেলেটিকে ধীরে ধীরে নিথর মনে হতে লাগল। তার পাখীর নখের মত ক্ষীণ অঙ্গুলিগুলি শয্যার প্রান্তদেশ আকঁড়ে ধরবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সেই হাত দুটি আবার উঠে এল। হাঁটুর উপর সেই শালটা যেন সে ধরতে চাইল। হাঁটু দুটো হঠাৎ মুড়ে নিয়ে পেটের উপর গুটিয়ে রাখল। আবার একটু বিশ্রাম পাবার চেষ্টা করল।

আসমান ডাকল: যাদু, যাদু আমার।

সে আহ্বান কি সে শুনতে পেল?

আসমানের বুকখানা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। সে দেখল: ছেলেটি চোখ খুলল এবং তার দিকে তাকাল। ভয়ার্ত বিমর্ষ সে দৃষ্টি।

তারপর তার ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গেল। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সেই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা একটানা ঘর্ ঘর্ শব্দ বেরুতে লাগল। যেন সেই শব্দের মধ্য দিয়ে গৌড়ের সকল রোগাক্রান্ত মানুষের প্রতিবাদ বেরুতে থাকল মৃত্যুর বিরুদ্ধে।

আসমান তার উপর ঝুঁকে পড়ল। তার অন্তরের বেদনা চোখের অশ্রু হয়ে গলে পড়তে লাগল।

ধীরে ধীরে সেই প্রতিবাদ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। যেন যুগ যুগান্তরের মধ্য দিয়ে সেই প্রতিবাদ প্রবাহিত করে দিয়ে গেল সে। এক সময় সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

আসমান সেই স্তব্ধ নিষ্পাপ দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠল: যাদু, যাদু আমার।

হে ভগবান। এমন নিষ্ঠুর তুমি কেন হলে?

ছাব্বিশ

"সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক
মহামরণ পারে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নগরী নিস্তব্ধ! জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই। একটি প্রাণী পর্য্যন্ত নেই। আকাশে পাখীরা পর্য্যন্ত উড়ছে না। এমন কি শকুনীরা পর্য্যন্ত ভয়ে মাটীতে নামছেনা। হাওয়া দূষিত। চতুর্দিকে দুর্গন্ধ। একা একজন পথিক এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর রাজত্বের মধ্য দিয়ে, একটি চিরন্তন প্রাণস্রোতের মত এগিয়ে চলেছে। শোকের চিহ্ন নেই তার মধ্যে—দুঃখের চিহ্ন নেই, আবেগের চিহ্ন নেই। চলেছে—চলাটাই জীবনের ধর্ম বলে চলেছে। চলতে চলতে হঠাৎ একবার মৃতস্তূপের কাছে এসে ক্ষণকালের জন্য থেমে দাঁড়াল। নিস্পন্দ দেহের স্তূপের মধ্যে যেন একটুখানি স্পন্দন। যন্ত্রণা নয়, আকুলতা নয়, একটুখানি স্পন্দন। সেই পথিক সেইখানে একটু থামল। দেখল, বিরাট প্রশান্তি অথচ নিষ্প্রাণ নয়। শান্ত স্নিগ্ধ চোখ অথচ দৃষ্টিহীন নয়। সহস্র পূতিগন্ধ, মৃতের স্তূপ, বীভৎস কঙ্কালের মধ্যে নির্বিকার সে পড়ে আছে। মুখে শোক নেই, হাসিও নেই। অথচ কি মধুর! মধুর! নিস্তরঙ্গ বিরাট এক আনন্দ। সেই পথিক সেখানে দাঁড়াল। সেই শায়িতা পরম রমণী মূর্তি দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে ধরল তার দিকে। চারিটি চোখ শুধু তাকিয়েই থাকল, তাকিয়েই থাকল। তারপর সেই মৃত্তিকাশয্যায় শায়িতা রমণী মূর্তির চোখের দৃষ্টি থেকে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি বের হল। সেই উজ্জ্বল জ্যোতি বিরাট শ্বেত হংসের মত ডানা মেলে আকাশের দিকে উড়তে লাগল। ধীরে ধীরে দুটি গভীর গম্ভীর বিরাট ডানা ছন্দায়িত হয়ে ঊর্ধ্বে উড়তে লাগল। পথিক শুধু বাক্‌হীন অবস্থায় সেই উড্ডীয়মান শ্বেত বিহঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকল!

নির্মীয়মান এক ধর্মশালা, দূরে দূরে দূরে......বহু দূরে......চিরকাল তা নির্মিত হত, হবে, হচ্ছে, হতে থাকবে। সেই শ্বেতশুভ্র পাখী উড়ে চলল। পথিক শুধু দেখল, কাঁপল না, কাঁদল না। জানিনা অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অনুদ্গত অঙ্কুরের মত তারই লেখা সেই পদটি ধ্বনিত হল কিনা—"চল মন বৃন্দাবন......."